অরণ্য-বহ্নি

ভা. র. ১৮—২১

প্র স্তা ব না

আমার সঙ্গে একশো বারো বছর পিছনে চলুন।

১৮৫৪ সন। আজ ১৯২৬ সন—এখন থেকে একশো বারো বছর আগের কথা। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল।

তখন বাংলাদেশ বলতে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তিন প্রদেশ একসঙ্গে। যে অঞ্চলের কথা বলছি, সে অঞ্চল উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিমে তিনপাহাড় রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর এবং গোটা সাঁওতাল পরগনা এবং দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা। আসুন সে-আমলে এই অঞ্চলটায় একটু ঘুরে আসি।

রাজমহল থেকে সমস্ত দক্ষিণ এলাকা তখন জেলা মুরশিদাবাদের এলাকা। এবং দেওঘর সাঁওতাল পরগনা নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত। নবাবী আমলে এর সমস্তটাই ছিল বসতিবিহীন অরণ্যভূমি। ইংরেজের দেওয়ানীর পর পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় থেকে এসব অঞ্চলে বন কেটে চাষের ক্ষেত তৈরী হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে সাঁওতালরা সমতলে নেমে এসে গ্রামে বসতি তৈরী করে জমি ভাঙছে। হিন্দু ব্যবসাদার গৃহস্থ এরাও চাষের ক্ষেত তৈরী করে অঞ্চলটার চেহারা অনেকটা পালটে দিয়েছে। ওদিকে গঙ্গার স্রোতকে পূর্বদিকে রেখে তার সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল রেখায় রেল-লাইন বসাবার কাজ চলছে পুরোদমে। মধ্যে মধ্যে নীলকুঠি বসিয়েছে সাহেবানেরা, তার সঙ্গে রেশম-কুঠি। খ্রীশ্চান মিশনারীরা পার্বত্য এলাকায় মিশন গেড়ে বসেছে।

গ্রামগুলি সবই প্রায় মাটির দেওয়াল, খড়ো চাল এবং খাপরায় চালের বাড়ি-ঘরের গ্রাম। হাজারখানা ঘরের মধ্যে দশখানা বিশখানা পাকা বাড়ি। তাও সব ইদানীং তৈরী হচ্ছে। নবাবী আমলে রাজমহলে ছিল নবাবী মহল; বড় ব্যবসাদারদের পাকা বাড়ি। বীরভূমে রাজনগরে মুসলমান রাজা সাহেবের পাকা বাড়ি এবং তার অধীনে যে সব ছোট জায়গীরদার তালুকদার ছিল তাদের বাড়ি-ঘরের মধ্যে ছিল অর্ধেক পাকা অর্ধেক কাঁচা। দু-চারখানা গ্রাম অন্তর এক একখানা হিন্দুর গ্রামে দুটো চারটে কি একটা পাকা শিবমন্দির এবং মুসলমানদের গ্রামে ছিল পাকা মসজিদ—এ ছাড়া পাকা ঘর ছিল না। লোকেরা মৃত্তিকা দগ্ধ করে বাস করত না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের পথ কাঁচা মাটির পথ।

অঞ্চলটাই পাথর কাঁকর আর লালমাটির অঞ্চল। শক্ত কঠিন রুক্ষ মাটি। লাল ধুলোয় ভরা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে শালবনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মধ্যে মধ্যে পড়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সে প্রান্তর ধূসর রুক্ষ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই মাথা ঠেলে বেরিয়ে যেন থাবা গেড়ে বসে আছে। এরই মধ্যে আপনার চোখে পড়বে দু-চারটে পঁচিশ থেকে তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু পাথরের ঢিবি; তাকে ঘিরে জন্মেছে শালগাছ—কচিৎ কোথাও একটা বড় বটগাছও আপনার চোখে পড়বে।

তারপরই আবার পড়বে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ শালজঙ্গল। মধ্যে মধ্যে কাঁঠালগাছ দেখতে পাবেন। হঠাৎ চোখে পড়বে কাঁচা সোনার বর্ণের শিমুল ফুলের মত বড় বড় ফুলে

ছেয়ে রয়েছে খানিকটা বনভূমি। গাছের শাখাপ্রশাখায় পাতা নেই; আঁকাবাঁকা কাণ্ডশাখা। ওই ফুলে শাখাপ্রান্তগুলি ছেয়ে আছে। বসন্তকালে শীতের শেষে পলাশ গাছে পলাশ ফুলও পাবেন।

কিন্তু মুগ্ধ হয়ে স্থান কাল ভুলে যাবেন না।

কাল ১৮৫৪ সন। এবং স্থান বর্তমান সাঁওতাল পরগনার পার্বত্য অরণ্য অঞ্চল। হঠাৎ হয়তো পথের উপর বেরিয়ে আসবে হেঁড়োল, নেকড়ে, হায়েনা। মাথার দিকটা উঁচু, পিছন দিকটা খাটো, গায়ের কালচে মেটে রঙের উপর ডোরা দাগ। নয়তো পাবেন, চিতাবাঘ, গুলবাঘা; অবশ্য গরু বাছুর ছাগল ভেড়ার ওপরই এদের নজর বেশী; আপনি চঞ্চল না হলে আড়াল দিয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু 'ঝিঙেফুলি' চিতাও আছে। এরা মানুষকেও ছাড়ে না। নয়তো বেরিয়ে আসবে ভালুক। কখনও কখনও পথের ধারে গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে মুখ ঝুলিয়ে ঝোলে পাহাড়ে চিতি! পথের উপর পড়ে থাকতেও দেখতে পেতে পারেন। কখনও কখনও হরিণের পাল বনের এধার থেকে ওধারে চলে যাবে পথ পার হয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে; ছুটো চারটে জোয়ান হরিণ লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাবে রাস্তাটার এমাথা থেকে ওমাথা। আর শুনতে পাবেন ক্যাওক্যাও শব্দ। ময়ূর ডাকবে গাছের মাথায় বসে। তার সঙ্গে নানান জাতির পাখীর কলরব। কল-কল-কল-কল!

একলা মানুষের বা একখানা গাড়ির এ পথ পার হওয়া সম্ভবপর নয়; দল বেঁধে জুটে যেতে হবে। গাড়ি হলে একসঙ্গে আট-দশখানা গাড়ি। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে, বিপদ বুঝলেই সকলে মিলে চিৎকার দিতে হবে। চিৎকার শুনে জন্তুজানোয়ারও ঘাবড়াবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া মিলবে, পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে পাহাড়িয়া সাঁওতালদের এবং নীচে নতুন আবাদী 'ডামিন' বা 'জঙ্গি' এলাকার গ্রাম থেকে সাঁওতালদের সাড়া পাবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দল বেঁধে কাঁড় তীর আর তিন হাত লম্বা মোটা বাঁশের ধনুক এবং বল্লম হাতে ছুটে আসবে আপনাদের সাহায্যে। সঙ্গে করে আপনাদের পার করে এগিয়ে দেবে খানিকটা। আপনি খুশী হয়ে টাকাপয়সা দিলে তারা নেবে এবং খুশীও হবে, কিন্তু তার থেকেও তারা খুশী হবে আপনি যদি তাদের কিছু পুঁতির মালা দেন, রূপাদস্তার গয়না দেন কিংবা রঙিন সুতোর 'চাবকি' দেন। সব থেকে খুশী হবে ওদের যদি দু-চার সের নুন দেন। নুনের ওদের বড় অভাব। নুন ছাড়া খাওয়ার জন্ত ওদের কেনবার কিছু নেই। বিদায় নেবার সময় ওদের হাতে হাতে হাত মিলিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলবেন—জোহর, জোহর মাঝি হে!—অর্থাৎ নমস্কার, নমস্কার মাঝিমশায়। ওরা বিগলিত হয়ে যাবে। ওরা চলে যাবে। কাঁধে ধনুকটা ঝুলিয়ে কোমরে গোঁজা বাঁশের বাঁশীটা টেনে নিয়ে পাঁচ-সাতজন একসঙ্গে সুর তুলে ওদের গান ভাঁজতে ভাঁজতে চলে যাবে নিজেদের গাঁয়ে।

বলতে বলতে যাবে—দিকুগুলা (হিন্দুদের দিকু বলে) ভাল লোক। বুলুং [অর্থাৎ নুন] দিলে!—কি বলবে—পয়সা দিলে!

এদের ভয় করবেন না। এরা অরণ্য মানুষ, কালো রঙ, পরনে মাত্র একফালি কাপড়,

মাথায় বাবরি চুল ; তাতে ফুল গোঁজে, কানে ফুল গোঁজে, পুঁতির মালা গলায় পরে হীরে-মণিমাণিক্যের কণ্ঠহার পরার আনন্দ উপভোগ করে। এরা বাঘ মারে, ভালুক মারে, কিন্তু এরা চোর নয়, লুঠেরা নয় ; বাঘ ভালুক সাপ ছাড়া এ অঞ্চলের মানুষের কাছে কোন ভয় নেই।

মেয়েরা কষ্টিপাথরে খোদাই-করা সুঠামগঠন নারীমূর্তি। ডাগর চোখ, কপাল ছোট, মাথার চুল ঘন কিন্তু লম্বায় খুব দীর্ঘ নয়। সিঁথি কাটে না, সমান করে উঞ্ছিয়ে টেনে চুল পাকিয়ে খোঁপা বাঁধে। খোঁপায় থাকে জিজির গাঁথা কাঁটা ফুল। কিন্তু তাও দেখা যায় না। সেখানে থোকা থোকা হলুদ ফুল আর লাল ফুল গুঁজে রাখে। মেয়েদের যদি কিছু উপহার দিতে চান তবে রঙিন উজ্জ্বল ফুল দেবেন। এদের পরনে দুপ্রস্ত সাঁওতালী তাঁতে-বোনা মোটা সুতোর কাপড় ; রঙিন ; একপ্রস্ত কোমর থেকে নীচের দিকে, অপর প্রস্তটাকে কোমরে একপ্রান্ত গুঁজে বুক ঢেকে পিঠ বেড়ে কোমরে আঁটসাঁট করে জড়িয়ে গোঁজে। গলায় ওই ওদের হীরে মানিক রঙিন পুঁতির মালা। রঙিন ফুলের সঙ্গে পুঁতির মালা আর একফালি আড়াই হাত লম্বা উজ্জ্বল রঙের কাপড় যদি দিতে পারেন তবে তো কথাই নেই। তবে ভাববেন না সে আপনার প্রেমে পড়বে ; সে শুধু ফিক্ ফিক্ করে হাসবে এবং বলবে—দিকু তু বড় ভাল! তু বড় ভাল!—সেকালে ওরা হিন্দু ভদ্রলোকদের বাবু বলত না, বলত 'দিকু'। মুসলমানদের বলত, শেখ মোসল।

নব্বুই বছর বয়সের বৃদ্ধ প্রতিমা কারিগর নয়ন পাল ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ বাবু আমার কাছে পট আছে। এ কালের পট আছে। কিন্তু সে তো দেখাই নে কাউকে। বাড়িতে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। মধ্যে মধ্যে নিজে কখনও-সখনও উলটে-পালটে দেখি। অন্যকে দেখাতে মানা আছে। পিতিপুরুষে বারণ করে গিয়েছেন। তবে—

তবে ভটচাজ মশায়রা আমাদের গুরুবংশ। যাঁর নাম করে এসেছেন আমার কাছে, তেনার কাছে আমি মন্ত্র নিয়েছি। তিনি আমার গুরু। তিনি যখন বলেছেন তখন—

তখন তো না বলবার সাধ্যি আমার নাই।

১৮৫৪ সনে বাংলাদেশে সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়েছিল। সাঁওতাল হাঙ্গামার বিবরণ বাল্য-বয়সে আমি শুনেছি আমার পিসীমার কাছে। আমার বাবার মামার বাড়ি সিউড়ির উত্তরে ময়ূরাক্ষীর ওপারে কানা ময়ূরাক্ষীর একেবারে উপরে, মহলপুর গ্রামে। পিসীমা আমার আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হত পঁচানব্বুইয়ের কাছাকাছি। সাঁওতাল হাঙ্গামার বিশ বছর পর তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এবং বাল্যকালে থাকতেন তাঁর দিদিমার কাছে। সাঁওতাল হাঙ্গামার সময় তিনি যৌবন পার হয়ে পঞ্চাশের কাছে পৌঁছেছিলেন। তাঁর কাছে শোনা গল্প—বালক আমার কাছে ঘুম পাড়াবার জন্যে। বলতেন—"এই সিঁদুর দিয়ে রাঙিয়ে রক্তমাখা মুখ, হাতে এই রক্তমাখা টাঙি। কাঁধে তীর ধনুক। ধি-তাং-তাং, ধি-তাং-তাং শব্দে মাদল বাজাতে বাজাতে এসে পড়ল। যাকে দেখলে তাকে কাটলে টাঙির ঘায়ে। যে

পালাল তাকে মারলে কাঁড়। কাঁড় মানে লোহার ফলাওলা দু হাত লম্বা তীর। ভদ্রলোকে যে যেদিকে পারলে পালালে।"

মুখে তাদের বুলি—একবার বোল দুই হোনো।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

তারপর প্রথম যৌবনে বীরভূমের গৌরবের ভাণ্ডারী ঐতিহাসিক সিউড়ির শিবরতন মিত্র মশায়ের সংগ্রহশালায় সাঁওতাল বিদ্রোহের পাঁচালী বা ছড়া পড়েছিলাম। পাঁচালী রচনা করেছিলেন মামুদবাজার থানার কুলকুড়ি গ্রামের অধিবাসী কায়স্থ-সন্তান রাইকৃষ্ণ দাশ। ভণিতায় আছে—

"কথা মিথ্যা লয়, কথা মিথ্যা লয়,—
সত্য হয় এই যে বিবরণ।
হরি হরি বল, দিন গেল অকারণ।"

এই ছড়ার মধ্যে পিসীমা যা বলতেন তারই উচ্চ এবং বহুবারধ্বনিত প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম। সেকালের 'সংবাদ প্রভাকরে'র ৫৩০০ সংখ্যায় পড়েছিলাম—"বাসেন্দা লোকেরা আপন ২ গৃহ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট স্কুল বন্ধ হইয়াছে। কালেক্টর সাহেব সরকারী টাকার সিন্ধুক স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। সাঁওতাল জাতিরা যদ্যপি অত্যাচারী সাহেবদিগের অত্যাচারের প্রতিফলন দিয়া ক্ষান্ত হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কারণ যাহারা বলপূর্বক স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব নাশ করে তাহাদিগের প্রাণ বধ করিলেও ক্রোধানল শীতল হয় না। কিন্তু অসভ্যজাতিরা প্রজাপুঞ্জের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতেছে। তাহারা যে গ্রাম দিয়া আসিতেছে সেই গ্রাম লুট ও অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতেছে, শত শত মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করিতেছে।"

"নারায়ণপুর গ্রামে ১০০০০ হাজার প্রজা ছিল—তাহাদিগের অধিকাংশ ধনাঢ্য—তাহারা কেহ নাই, স্থানে স্থানে মৃতদেহ পড়িয়া আছে। গৃহাদি সকল ভস্মীভূত হইয়াছে।"

"দুরাচারীরা স্ত্রীলোকদিগের আভরণ ও পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত লইয়া গিয়াছে, জননীর ক্রোড় হইতে শিশুসন্তানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখেই বিনষ্ট করিয়াছে।"

"বারকুপ গ্রামের সাঁওতালরা গর্ভিণী স্ত্রীলোকের উদর চিরিয়া তন্মধ্যস্থিত শিশুসন্তান বাহির করিয়া হত্যা করে।"

এদের নেতা এই বিদ্রোহের মূল—সিধু আর কানু মাঝি। এরা রাজা হয়েছিল। এদের সেনাপতি ছিল ভৈরব মাঝি আর চাঁদ মাঝি।

শেষ পর্যন্ত এরা মরেছিল। বিদ্রোহ থেমেছিল। এর ফলে সাঁওতালদের জন্যে পৃথক জেলা তৈরী হয়েছিল—সাঁওতাল পরগনা।

ইতিহাস পড়ে একটি আদিম উন্নত জাতির বর্বর অভ্যুত্থান ছাড়া আর কিছু পাই নি। ভুলে যেতেই চেয়েছিলাম। এরা আজ নানান স্থানে এসে আমাদের সঙ্গে মিশেছে, গ্রাম-প্রান্তে ঘর গড়েছে। সভ্যতার সংস্পর্শে এসে পরিবর্তন অনেক হয়েছে। পুরুষ নারীর চরিত্র বদলেছে। এদের সঙ্গে মিশেছি। ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। এরা আজও সরল আছে। তবু

সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা মনে করলে সরে পিছিয়ে এসেছি খানিকটা!

না—থাক।

হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটল।

মোটরে যাচ্ছিলাম—দুমকা থেকে সোজা যে রাস্তাটা চলে গেছে উত্তরমুখে সাহেবগঞ্জের দিকে এবং সাহেবগঞ্জ থেকে চলে গেছে ভাগলপুর—সেই রাস্তা ধরে ভাগলপুর। দুপাশে বন এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চড়াই উতরাই। আধুনিক কালের মসৃণ পথ। প্রকৃতি বনফুলে সর্বাঙ্গ সাজিয়ে যেন ওই মনোরমা সাঁওতাল যুবতীর মতই পাহাড়ের পাথরের উপর ঘুমিয়ে আছেন। এই দেখবার জন্যেই মোটরে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ পথে বিপর্যয় ঘটল। মোটর বেগড়াল। একবার পথে নেমেছিলাম। গাড়িটার ইঞ্জিন বন্ধ করতেই দেখা গেল ওয়াটার পাম্প লিক করে জল পড়ছে। ড্রাইভার মল্লিক নিজে মেকানিক। সে সব রকম উপায় চিন্তা করে উপকরণ সঙ্গে রাখে. বের করলে খানিকটা সাবান। করে বললে—ওতে কিছু হবে না—সাবান গুলে নরম করে টিপে দিলেই লিক বন্ধ হবে।

মল্লিকের দাওয়াই কার্যকরী হল, গাড়ি চলল; পাকুড়ের রাস্তা ডাইনে রেখে হিরণপুরের হাটও ডাইনে ফেলে গাড়ি চলল। রাত্রি আটটা নাগাদ সাহেবগঞ্জ পৌঁছিবার কথা। কিন্তু আরও মাইল কতক এগিয়ে সন্ধ্যের মুখে এক জায়গায় পাশে একটা ঝরনা দেখে গাড়ি রুখলে, গাড়ির ভিতরে পায়ের কাছে উত্তাপ প্রবল হয়ে উঠেছে। রেডিয়েটার ক্যাপটা খুলতেই দেখা গেল খানিকটা গরম জল বার দুই টগবগ করে ফুটে উঠেই নীচে নেমে গেল। ওদিকে ওয়াটার পাম্প থেকে জল পড়ে গেল ছরছর করে। সম্মুখে প্রান্তর—অরণ্যময় প্রান্তর—দূরে গ্রামের চিহ্ন দেখা যায় না। চিন্তিত হয়ে বললাম—তাই তো মল্লিক—

—কিছু চিন্তা করবেন না—আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।

আবার সে সাবান গুলতে লাগল এবং সাবান গুলে ভাল করে লাগালে ওয়াটার পাম্পের চারিদিকে। চাকর রাম বালতি করে জল নিয়ে এসে ঢাললে। এবং গাড়ি আবার স্টার্ট দিয়ে মল্লিক চালাতে শুরু করলে। কিন্তু কিছুদূর এসে হঠাৎ একটা টং করে শব্দ হল। মল্লিক এবার বললে—সেরেছে!

অর্থাৎ ওয়াটার পাম্পের নিচের দিকটা খসে পড়ে গেছে। এবং সমস্ত জলটাই পড়ে গেছে মিনিটখানেকের মধ্যে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নিরুপায় হয়ে ভাবছি কি হবে? এরই মধ্যে একদল মাঝি অর্থাৎ সাঁওতালদের সঙ্গে দেখা হল। তারা বললে—সামনে একটা সরকারী বাংলো আছে, বেশী দূর নয়—রশি দুই দূরে।

বললে—সিখানে যা তুরা। গাড়ি রেখে থাকবি। কাল বাসে চেপে যাবি সাহেবগঞ্জ—মিস্ত্রী লিয়ে এসে মেরামত করিয়ে লিবি। লইলেই এখানেই থাক। আর আমাদের বাড়ী যাবি তো আয়। দাকা (অর্থাৎ ভাত) দিব, সিম (অর্থাৎ মুরগী) দিব, আর হাঁড়িয়া (অর্থাৎ পচুই মদ) খাস তো তা দিব।—বলে খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললাম—না—আমাদের গাড়িটা ঠেলে ওই বাংলোতে পৌঁছে দে। টাকা দেব আমি।

—টাকা? ক' টাকা দিবি?

—গেল টাকা। (অর্থাৎ দশ টাকা)

হাসলে মাঝিরা। বললে—উহু।

—কত টাকা নিবি বল?

—শায় টাকা! (অর্থাৎ একশো)

—শায় টাকা!

—হঁ। তুরা বাবু—অ্যানেক টাকা তুদের; দে শায় টাকা দে।—সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল মাঝিরা। একজন ওরই মধ্যে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বললে—না বাবু। তুকে ওরা মসকরা করছে। আমরা কুছু লিব না। চল—তুর গাড়ি ঠেলে উখানে দিয়ে আসি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কিছু নিবি না?

—না বাবু। আমাদের লিতে নাই। বারণ আছে।

—বারণ আছে? কে এমন বারণ করলে?

—বারণ করে গেইছে আমাদের শুভোবাবু। সিধু আর কানুহু আমাদের শুভোবাবু ছিল। সাঁওতালরা যখুন হুলু করলে, মানে হুল হাঙ্গামা করলে, সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করলে তখুন তারা বলে গেইছে কি—দেখ্ মানুষের যখুন বিপদ হবে তখুন তাকে বাঁচাবি, রাখবি, নিজের জানটা দিবি, কিছু লিবি না তার কাছে; রাতে মানুষ এসে ঠাঁই চাইলে তাকে ঘরে ঠাঁই দিবি, নিজে বাহার শুবি। আমাদিগে টাকা লিতে নাই বাবু।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। মনে পড়েছিল সাঁওতাল হাঙ্গামার কথা। মনে পড়েছিল আমার পড়া এবং শোনা সাঁওতাল অত্যাচারের কথা। তাদের বলবার মত কথা আমি খুঁজে পাই নি।

তারা আমার গাড়ি ঠেলে ডাকবাংলোর সামনে হাতাটার মধ্যে পৌঁছে দিয়ে চৌকিদারকে ডেকে এনে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল। যাবার বলে গিয়েছিল—কুছু ভয় নাই বাবু, তু থাক। উ চৌকিদারটো মাহাতো বেটে—উ রাতে থাকবেক নাই, পালাবে। বুলে—রাতে উই আমাদের পুজোর জাগায় কি সব হয়। ভয় লাগে। হাঁ বাবু, উইখানে আমাদের শুভোবাবু সিধু কানু তুদের দুগ্‌গাপুজো করেছিল সে হুলুর সময়। উইখানে সিধু কানু মাঠেক্‌রেনের দেখা পেলে। মাঠেক্‌রেন বুললে—তুরা শুভোবাবু হালি রাজা হলি—পুজো কর। খুব ধুম করে পুজো হল—বড় বড় কাঁড়া কাটলে। কিন্তুক কি দোষ হল—হেরে গেল। সিধু মল গুলিতে। কানুহুর ফাঁসি হল। তাদিকে পুড়ায়ে উইখানে ছাই গেড়ে দিলে। উরা বুলে—সিধু কানু রাতে ওই জহর সর্দার (দেরস্থানে) এসে ঘুরে বেড়ায়। তাই ডরে পালায় চৌকিদারটো। তা পালাক। কুনো ভয় নাই তুর—তু থাক। সি কুছু করবে না। না। করবে না।

সেদিন রাতে আমার ঘুম হয় নি। মল্লিক আর রাম ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি জেগে ছিলাম। স্যুটকেসে বীরভূম জেলার হ্যাণ্ডবুক ছিল, সেটা বের করে পড়তে বসেছিলাম। মনের মধ্যে আগের দিনের সংগ্রহ করা তথ্যগুলি ঘুরছিল।

বাইরে ছিল জ্যোৎস্না। আকাশ নীল; আকাশের চাঁদ শুক্লা দ্বাদশী কি চতুর্দশীর চাঁদের মত আকারের। বাংলোর পিছনে খানিকটা দূর থেকেই শালবনের সীমানা শুরু হয়েছে; শুধু শালবনই বা কেন, একটা পাহাড় যেন এখান থেকেই উঠেছে; জ্যোৎস্নালোকিত শালবনের ক্রমোচ্চ মাথাগুলি দেখে বুঝতে বাকী থাকে না যে যেমন যেমন পাহাড় ঢালু হয়ে উঠে গেছে তেমনি তেমনি গাছের মাথাগুলি উঁচু দেখাচ্ছে।

বসন্তকাল, শালবনে ফুল ধরতে শুরু করেছে, পাতা-ঝরা প্রায় শেষ হচ্ছে। পত্রহীন সরল দীর্ঘ শালকাণ্ডের ভিতরটায় আঁকাবাঁকা ফালি ফালি জ্যোৎস্না একটি অপরূপ চিত্রপট ফুটিয়ে তুলেছে। মধ্যে মধ্যে পাখী ডাকছে। কোকিল ডেকে চলেছে। পাপিয়া ডাকছে। মধ্যে মধ্যে কর্কশ স্বরে ডাকছে প্যাঁচা। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে মাদলের ধি-তাং ধি-তাং শব্দ।

আলি হাণ্টার সাহেবের বিবরণ পড়ছিলাম।

...Two brothers inhabitants of a village (Bagnadihi) that had been oppressed beyond bearing by Hindu usury, stood forth as the deliverers of their countrymen, claimed a divine mission, and produced heaven-sent tokens as their credentials. The god of the Santals, they said, had appeared to them on seven successive days; next as a flame of fire, with a knife glowing in the midst; then in form of the wheel of a bullock cart;...

আরও পেলাম—carried off Brahman priests to perform the great October festival (Durgapuja).

মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছিলাম সেই সেকালের সাঁওতাল বিদ্রোহের মধ্যে দুর্গাপূজার সমারোহ। আমি জানি, বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি বিজয়া দশমীর দিন সাঁওতালদের মহোৎসব। হাঁড়িয়া খেয়ে, আপন আপন সব থেকে উজ্জ্বল পোশাক পরে, মাথায় ময়ূরের পালক বেঁধে যুদ্ধনৃত্যের প্রমত্ততা। এ উৎসব তাদের আজও আছে। ভাবছিলাম আর তাকিয়েছিলাম জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমির দিকে।

হঠাৎ যেন মনে হল বনভূমের মধ্যে একজন কে দীর্ঘকায় কালো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছে ঠেস দিয়ে। স্থির—নিশ্চল। ধ্যানমগ্নের মত।

চমকে উঠেছিলাম।—কে? ও কি সিধু, না কানু?

সাওতালেরা বলে গেল লোকে বলে রাত্রে সিধু কানু এখানে ঘুরে বেড়ায়।

তাদের কেউ? একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম, ক্রমশঃ সমস্ত আকার অবয়ব যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। হাত দুখানি প্রশস্ত বুকের ওপর ভেঁজে রেখে পায়ের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের প্রফিল দেখা যাচ্ছে। মাথায় বাবরি চুল তাও দেখতে পেলাম।

প্রথমটা ভয় হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সাহস ফিরল। বিছানার উপর থেকে উঠে জানলাটার ধারে এসে আধখোলা জানলাটাকে পুরো খুলে দিয়ে দাঁড়ালাম।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই আছে। ও কে? সিধু? কারণ সিধুকেই ইংরেজরা আহত অবস্থায় ধরে এইখানেই গাছের ডালে ফাঁসি দিয়েছিল।

সাহস বাড়ছিল। মনে পড়ছিল মাঝিরা বলে গেছে সে কখনও অনিষ্ট করবে না।

সাহস করে ডাকলাম—শুভোবাবু! (অর্থাৎ রাজাবাবু) সিধু শুভোবাবু!

উত্তর পেলাম না। আবার ডাকলাম। এবার দেখলাম নড়ছে সে। সাঁওতাল পরগনার ফাল্গুন শেষের এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগল। গাছগুলো দুলে উঠল; একটা ঝরঝরে বাতাসের প্রবাহ বয়ে গেল অরণ্যলোকে অল্প খানিকটা আলোড়ন তুলে। একটা টানা শব্দের সঙ্গে শালগাছের পুরনো পাতা যা অবশিষ্ট ছিল ঝরে পড়তে লাগল। এবার দেখলাম গাছের দোলার সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ তরুণ জোয়ানটি আর মানুষ নয়, সেটা অন্য একটা গাছের ছায়া একটা মোটা শালগাছের কাণ্ডের উপর পড়ে এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল—তাই দেখাচ্ছিল মানুষের মত।

ফিরে এসে শুয়েছিলাম! শুয়ে ওই সেকালের কল্পনা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হাণ্টার লিখে গেছেন—Even in their moment of success, however, the Santals were not wanting in a sort of barbaric chivalry and gave fair warning of purpose to plunder a town before they actually came.

যে ছায়াটাকে ভ্রম করেছিলাম সিধু বলে, যার মূর্তিটি ওই স্থির ছায়ার মধ্যে মিশে সত্যই দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে সেই barbaric chivalry-র আভাস দেখেছি। সিধুকে এখানেই ফাঁসি দিয়েছিল। হ্যাঁ সেই মূর্তির মধ্যে নির্ভীক এক কঠিন মানুষকে দেখেছি। সে রাজা হতে চেয়েছিল।

—আর কিছু দেখলি না তু?—এবার কণ্ঠস্বর যেন ঘরের মধ্যে।

—কে? চমকে উঠেছিলাম।

চোখ ফিরিয়ে ঘরের দেওয়ালে সেই মূর্তিকে দেখেছিলাম একবার। সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা হিমপ্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। স্থির ভীতার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম তার দিকে।

মনে হল কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তির মত মানুষটার মুখে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা যেন বাটালিতে কাটা রেখার মত ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধ। মুখখানা তার যেন ভয়ঙ্করতর হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠেছিলাম।

চেতনা হয়েছিল মল্লিক এবং রামের ডাকে। তারা ডাকছিল—বাবু! বাবু! বাবু!

ঘুম ভেঙে উঠে লজ্জিত হয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম ওই গাছের ছায়াকে ছায়ামূর্তি মনে করে, সাঁওতাল হাঙ্গামার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ফলে স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে সিধু এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল।

বাকী রাতটা আর ঘুম হয় নি।

পরদিন সারা দিনটা থাকতে হয়েছিল ওখানে। মল্লিক বাসে সাহেবগঞ্জ গিয়ে নতুন

ওয়াটার পাম্প কিনে এনে ফিট্ করতে করতে রাত্রি প্রায় এক প্রহর হয়ে গিয়েছিল। গোটা দিনটা আমি ঘুরেছিলাম ওই বনের মধ্যে। ঘুরেছিলাম বললে ভুল হবে, বনে ঢুকে সেই দেবস্থানটি আবিষ্কার করে সেখানেই কাটিয়ে এসেছিলাম। মনোরম স্থান। একটি প্রশস্ত পাথরের চত্বরের মত স্থান—প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু, চারিপাশে বড় বড় শালগাছ; পাথরের চত্বরটির একপাশ দিয়ে বেয়ে যাচ্ছে একটি ঝরনা। বেয়ে যাচ্ছে না, ধাপে ধাপে জলপ্রপাতের মত ঝরে পড়ছে, ঝরঝর শব্দ উঠছে অবিরাম। চত্বরটির পিছনে আর একটা প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু খাড়া পাথর দেওয়ালের মত খাড়া হয়ে আছে। সেই দেওয়ালের গায়ে একটি গুহা।

মা বোঙ্গার ঠাঁই। অর্থাৎ মা দেবতার স্থান। বুঝেছিলাম দুর্গাপূজার স্থান। আজও বিজয়া দশমীতে এবং একাদশীতে সাঁওতালেরা দলে দলে এসে প্রণাম করে যায়।

সেদিন সন্ধ্যার পরও অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত ওখানে বসেছিলাম। যে মাঝারি একটি গাছের ছায়া বড় একটি শালগাছের গায়ে কালো মানুষের মত নিত্য ছায়া ফেলে, সেটিকেও আবিষ্কার করেছিলাম। তার গায়ে অর্থাৎ ছায়াপড়া শালগাছটার গায়ে হাত রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম চুপ করে। সিধু বলে আর ভ্রম হয়নি। সেদিন কিন্তু সাঁওতাল হাঙ্গামার কথাগুলি আবার যেন নতুন করে মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। এবং ছায়া জেনেও, স্বপ্ন জেনেও সেই কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তি—সে সিধু হোক বা না হোক—তাকে ভুলতে পারি নি।

তাই বা কেন? দ্বিতীয় দিন রাত্রে অনেকক্ষণ মা বোঙ্গার চত্বরে কাটিয়ে বাংলোয় ফিরে এসে ওই জানলায় দাঁড়িয়ে আবার দেখেছিলাম ওই ছায়ার মধ্যে এক কায়াকে। কালো কষ্টিপাথরে গড়া এক কায়াকে ঠিক তেমনি করে দুই হাত ভেঁজে জড়িয়ে চওড়া বুকখানার উপর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছিল। সেদিন বাতাস বয়-নি, পত্রবিরল শালকাণ্ডগুলি বাতাসে নড়ে নি। গাছের ছায়া গাছের গায়ে স্থির হয়েই দাঁড়িয়েছিল।

ফিরেছিলাম পরদিন। চোখ বুজে ওই কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম। সিধু কানুর কথা। সাঁওতাল হাঙ্গামার কথা।

'সংবাদ প্রভাকরে'র একটা কথা মনে পড়েছিল—"সাঁওতাল জাতিরা যদ্যপি অত্যাচারী সাহেবদিগের অত্যাচারের প্রতিফল দিয়া ক্ষান্ত হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কারণ যাহারা বলপূর্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করে তাহাদিগের প্রাণবধ করিলেও ক্রোধানল শীতল হয় না।"

সেই ক্রুদ্ধ যন্ত্রণাকাতর মুখ—সে সিধুর কি না তা জানি না—তবে তার স্মৃতি আবার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল।

'সংবাদ প্রভাকরে'র ওই ৫৩০০ সংখ্যাতে আর একটা সংবাদ আছে।

"জিলা ভাগলপুরের অন্তঃপাতি পর্বতসকলে সাঁওতাল নামে অগণ্য বন্য জাতি বাস করে। অতি অল্প দিবস হইল রাজাবলির সাহেবেরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্য জাতির তিনজন

স্ত্রীলোককে বলপূর্বক অপহরণ করাতে তাহারা কতকগুলি লোক একত্র হইয়া উক্ত সাহেবদিগের প্রতি আক্রমণ করতঃ তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীগণকে উদ্ধার করে। অন্যান্য সাহেবরা ভয়ে পালায়।"

"এমত জনশ্রুতি যে ঐ সাঁওতালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি···বুজরুক হইয়া (তিতুমীরের মত) আপন শিষ্যদিগের প্রতি আদেশ করে যে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে আমাদিগের রাজ্য হইবেক। অতএব তোমরা সাহসপূর্বক অস্ত্রধারণ করিয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

আবার আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল সিধু বা কানুর সেই নিষ্ঠুর ক্রোধরেখাঙ্কিত মুখ। চোখ দুটো রাঙা টকটকে—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সম্মুখের দিকে।

হঠাৎ মনে হল—তাহলে কি—?

তাহলে কি ওই তিনজন সাঁওতাল যুবতীদের মধ্যে কেউ সিধুর বা কানুর আপন জন ছিল? বোন? স্ত্রী? কন্যা? প্রিয়া? যার জন্য এই ভারতবর্ষ বিজয়ী শ্বেতদ্বীপের শ্বেতাঙ্গ—যাদের সেকালে সারা দেশের লোক দেবতা বলে ধরে নিয়েছিল, যাদের বন্দুক, কামান পলাশীর আমবাগান থেকে দিল্লী পর্যন্ত সমস্ত পাথরের কেল্লা উড়িয়ে দিয়ে "রুল ব্রিটেনিয়া রুল দি ওয়েভস" গান গেয়ে সেকালে নিরন্তর মার্চ করে চলেছে, হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত রেল লাইন পেতে স্টীম ইঞ্জিন চালিয়েছে, যেখান থেকে বনপাশ গুস্করা ভেদে পার হয়ে বোলপুর আমদপুর সাঁইতে হয়ে পাহাড় সমান মাটি কেটে জলা নীচু জমিতে বাঁধের পথ তৈরী করে এগিয়ে আসছে, অজয় কোপাই ময়ূরাক্ষী বাঁশলই ব্রাহ্মণী নদীগুলোকে সাঁকোয় বেঁধে এখন তিন-পাহাড়ের পাহাড় কেটে চলেছে—তাদের বিরুদ্ধে তীরধনুক, টাঙি, সড়কি নিয়ে এরা রুখে দাঁড়াল কেন? কিসের জোরে? কোন্ আগুনের জ্বালায়?

আমার ছেলেবয়সে শুনেছিলাম, বলতেন আমার পিসীমা—ওরে বাবা বুকের ভেতর হীরের খনি আছে যম সেই খনি খুড়ে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায় মানিক রতন। বুক হয়ে যায় 'খাঙার'(অর্থাৎ শূন্য গহ্বর)। তাতেই লাগে আগুন—সে আগুনের জ্বালা সয় না রে সয় না। যম নিজে নিয়ে গেলে উপায় থাকে না, নিরুপায়ে গলায় দড়ি দেয় বিষ খায় জলে ডুবে মরে। ছোটে যমের পিছনে। শোধ নিতে ছোটে। কিন্তু—। বিচিত্র হাসি হাসতেন তিনি। তাঁর বুকে মানিকের ভাণ্ডার খুঁড়ে গহ্বর করে, যম চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলেরা রোগে স্বামী এবং পুত্র দুজনকে কেড়ে নিয়েছিলেন। পিসীমা মরতে চেষ্টা করেও মরতে পারেন নি, পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীপুত্র হারিয়ে একমাত্র ভাই বড়দাদার বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন।—সে আমাদের কুলীনদের বোন, আমার বাবা বলতেন—বোন ব্রাহ্মণের উপবীতের চেয়ে বড়, উপবীত থাকে গলায়, বোনের স্থান মাথায়।—তেমনি করেই রেখেছিলেন তিনি তাঁকে। এবং আমার মায়ের কোলে আমি আসতেই আমার মা আমাকে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর কোলে। আমাকে পেয়ে অগ্নিগর্ভ গহ্বরের মত তাঁর বুকে আবার বেরিয়েছিল স্নেহের ঝরনা। তার জলে বুকের গহ্বরের আগুন নিভে এসেছিল। তবু কখনও কখনও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতেন, মাথা গরম হত; তখনই ওই কথা বলতেন। সারা জীবনটাই

তিনি যেন নিজের বুকের আগুনে নিজে জ্বলে দীর্ঘ জীবনের অবসান করে গেছেন।

কথাটা মনে থাকত না আমার, ভুলে যেতাম। কিন্তু তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়সে প্রথম সন্তানশোক যেদিন পেলাম, সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে ওই কথাটা বলেছিলেন—সেদিন থেকে কথাটা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আমার কাছে।

সিধু বা কানু যেই হোক—যাকে আমি ওদের ওই দেবস্থলে দেখেছি, দেখেছি, যার বুকের ওপর হাত, চোখ রাঙা, মুখের রেখায় রেখায় প্রচণ্ড ক্রোধের বহ্নিদাহের চিহ্ন, তারও যে বুকের গহ্বর শূন্য করে ওই সাহেবান ঠিকাদারেরা ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং শূন্য গহ্বরে আগুন জ্বলেছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই।

আমি তার ছবিটা ভুলতে পারলাম না।

সিধু কানুর কথা খুঁজতে আমি সংকল্প করে বের হয়েছিলাম। শুরু করেছিলাম ময়ূরাক্ষীর উত্তর দিক থেকে। ওদিকে দুমকা এদিকে পাকুড় সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত খুঁজলাম। পেলাম না বিশেষ কিছু। সর্বত্রই এক কথা। সাঁওতালেরা ঘর জ্বালিয়ে গ্রাম লুঠেছে—মানুষদের কেটেছে। বড় বড় গ্রাম, বড় বড় রাজবাড়ি লুঠেছে। হিন্দু মহাজনদের কেটেছে। কালীমূর্তি স্থাপন করে তার সম্মুখে নরবলি দিয়েছে—এইমাত্র। সিধু কানুর আর কোন পরিচয় পাই নি।

গ্রামের পর গ্রামে যাই, প্রবীণ লোকেদের খোঁজ করে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সর্বত্রই ওই এক কথা। এর বেশী কিছু না। তবে বলেন—কুলকুড়িতে যান; ওখানে কিছু খবর পাবেন।—কুলকুড়িতে গেলাম। সেখানে শুনলাম—সে শুনেছি, ব্যাটারা এসেছিল, কাটাকুটো করেছিল—তা সাহেবরা তখন পল্টন নিয়ে এসেছে মামুদবাজারে, সেখান থেকে কুক্ মেরে পালিয়েছিল। আপনি আবদারপুরে যান। প্রবীণ লোক আছে ধ্বজু মল্লিক—তিনি বলতে পারবেন।

পঁচাশী বছরের বৃদ্ধ ধ্বজু মল্লিক—একালে দুর্লভ সত্যবাদী ব্রাহ্মণ—তিনি বললেন—দেখুন বাবা অনেককালের কথা—আমরা জন্মাই নি। আমার পিতামহ তখন ছিলেন। বাবা বালক। ওরা আসবার আগেই আমরা পালিয়েছিলাম হরযোরা। এখানে ডাঙার ওপর তারা রান্না করে খেয়েছিল। এখানে ঘরদোরে আগুন লাগায় নি। মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার শুনি নি। তবে সব লুঠেপুটে নিয়েছিল। আপনি—আপনি হিরণপুরের হাটের ওদিকে রামচন্দ্রপুর যান। সেখানে বৃদ্ধ হরিশ ভটচাজ আছেন—তাঁর জ্যেষ্ঠ পিতামহকে সাঁওতালরা নিয়ে গিয়েছিল জোর করে দুর্গাপূজা করাবার জন্যে। তাঁর নাম ছিল ত্রিভুবন ভটচাজ। তাঁর বংশ নেই। তাঁর ভাইয়ের নাতি হরিশ ভটচাজ—তাঁর কাছে খবর পাবেন। ওঁদের এক শিষ্য আছে—জাতিতে কুম্ভকার—তাকেও নিয়ে গিয়েছিল প্রতিমা গড়বার জন্যে। তাদের বংশ আছে—তাদের কাছে গেলেও খবর পাবেন হয়তো।

রামচন্দ্রপুরে হরিশ ভটচাজকে পাই নি। তিনি দেহ রেখেছেন কিছুদিন আগে। তাঁর

ছেলে দুজন—তাঁরা বাপের মৃত্যুর আগেই গত হয়েছেন। আছেন নাতিরা। নাতিরা আধুনিক। তাঁদের বড় নাতি এখনও বংশগত পেশা বজায় রেখেছেন; শিল্পসেবক আছেন। নাম হরি ভটচাজ। তিনিই আমাকে সন্ধান দিলেন নয়ন পালের।

বললেন—যান চরণপুরে। সেখানে প্রতিমা কারিগর নয়ন পাল আছে; প্রায় নব্বুইয়ের কাছাকাছি বয়স। তার বাপ হাজামার সময় জোয়ান মানুষ ছিল, তার ঠাকুরদা ছিল নামী কারিগর। আমার বৃদ্ধ পিতামহের বড়ভাই ত্রিভুবন ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর গুরু। নয়ন পালের এই ঠাকুরবাবা গড়েছিল সাঁওতালদের প্রতিমে আর গুরু ত্রিভুবন ভটচাজ করেছিলেন পুজো। নয়ন পাল আপনাকে খবর বলতে পারবে। আমি জানি তাদের বাড়িতে পট আঁকা আছে সাঁওতাল হাঙ্গামার। আগে গান গেয়ে পট দেখাতো। বলবেন আমার নাম করে। সে বলবে।

সেই নয়ন পালের বাড়িতে এসে কথা হচ্ছিল।

পাল প্রায় নব্বুই বছর বয়সেও বেশ সক্ষম রয়েছে। শক্ত কাঠামোর সোজা মানুষ; দাঁত প্রায় সব কটিই আছে; মাথার চুল পাকলেও এখনও তেল পড়লে কালো রঙের একটি আভাস ফুটে ওঠে।

খাপরার চাল মাটির দেওয়াল বাড়ি। ঘরখানা আগে একতলা ছিল, এখন কোঠা অর্থাৎ দোতলা করা হয়েছে। দেওয়ালের জোড় দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমাকে টুলের উপর বসিয়ে পাল আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—সিধু কানুর কথা শুনবেন?

বললাম—হ্যাঁ।

—কি করবেন?

—আমি বই লিখি—তাদের কথা লিখব।

—ব্রাহ্মণ আপনি?

—হ্যাঁ, তা বটি।

পায়ের সন্ধানে হাত বাড়িয়ে পাল বললে—পেনাম বাবা। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে—কি নিকবেন—এই অসভ্য কালো অসুরের মত সাঁওতালেরা কত মানুষ কেটেছিল? কত ঘর পুড়িয়েছিল? হায় হায় বাবা, তাই লোকে বলে। সিধু কানুর কপাল! ভৈরবের কপাল!

—না। তা হলে আপনার কাছে আসব কেন? রামচন্দ্রপুরের হরি ভটচাজ বললেন তাঁরা আপনাদের গুরুবংশ; তাঁর প্রপিতামহকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুজো করতে আর আপনার ঠাকুরদাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রতিমা গড়তে। আপনার বাবা সাঁওতাল হাঙ্গামার পট এঁকে গিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাল বললে—হ্যাঁ, পট আঁকা আছে। আট-আটখানা পট বাবা। তা প্রায় বয়স হল পঁচানব্বুই একশো বছরের। আমার এক জেঠা ছিল—সে বাবা সিধু কানুর সঙ্গে এই রঙে মেতেছিল। বুঝেছেন। সিউড়ী আদালতে

বিচার হয়ে তার জেহেল হয়েছিল সাত বছর্। নফর পাল নাম ছিল।

—পটগুলি আমাকে দেখাবেন ?

—দেখাব বইকি বাবা। গুরুবাড়ির আজ্ঞে নিয়ে এসেছেন। ,নিশ্চয় দেখাব। বাবা, যতন করে তোলাই আছে। ও কাউকে দেখাই না। বাবা, সে তো সোজা দব্য লয়। মনে করুন—বংশের কলঙ্ক আছে, আমাদের হিন্দু মহাজন জোতদারদের পাপের কথা আছে, সাহেবলোকের অত্যাচারের কথা আছে। দেখাতে নিজের লজ্জা হত। আবার আমাদের হিঁদু ভাইরা রাগ করত। সাহেবদের কালে তো বার করবার জো ছিল না। শুনতাম পট কেড়ে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে, ঘরদোর তছনছ করবে, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে। তা সায়েবরা গিয়েছে, হিঁদু ভাইরা আছে, নিজেদের কলঙ্ককথা আছে—তুলে রেখেছি মাচানে। গুরু আজ্ঞে নিয়ে এসেছেন—আপুনি বই নেকেন। দেখাব বইকি। তা নিকেন —কবিকঙ্কণ ঠাকুর চণ্ডীতে কালকেতু ব্যাধের কথা যেমন করে নিকেচেন, মহিমে পেচার করেচেন, তেমনি করে নিকবেন। ভটচাজ মশায় বলেছিলেন আমার ঠাকুরবাবাকে—ওরে সোজন (সুজন) এরা দু ভাই আর কেউ লয় রে—এদের একজনা হল কালকেতু ব্যাধ, বুঝলি, আর একজনা হল দক্ষযজ্ঞের বিরূপাক্ষ। বুঝলি। এরা এসেছে এই সব পাপতাপ অধম্মের শোধ নিতে রে। মা পাঠিয়েছেন আর মায়ের সঙ্গিনী জয়া বিজয়ার একজনা কেউ বটে ওই পাগলী বাম্নী বেটী—সিধু কানুয় মাঠেক্‌রেন ক্ষ্যাপা মা।

বিরূপাক্ষ কালকেতু বুঝেছিলাম, কিন্তু মাঠেক্‌রেন, ক্ষ্যাপা মা বুঝলাম না। পাগলী বাম্নী বেটী। সে কে ?

প্রশ্ন করলাম—তিনি কে ? ওই মাঠেক্‌রেন ক্ষ্যাপা মা।

নয়ন পাল বললে—বাবা, তা হলে পট দেখুন আর গান শুনুন—সবই বুঝবেন। এমন করে আলতো আলতো করে বললে তো বুঝতে পারবেন না, রসও পাবেন না। লোকে বলে সায়েবরা নাকি নিকে গিয়েছে এসব কথা। তা আসল কথা তো তারা জানে না। আসল কথা হচ্ছে বাবা 'লীলা'। ভগমানের লীলা। ভগমান কখুনও কালা, কখুনও কৃষ্ণ। বুয়েচেন। যখন পাপ বাড়ে, পাপীর দাপ বাড়ে—ধম্ম যায়—মানুষের ঘরে জীবনে অধম্মের একাকার হয়, তখন মা কখুনও নিজে আসেন, কখুনও তাঁর ওই কালকেতু বিরূপাক্ষকে পাঠান।

কথারম্ভ

ভুবন পালিনী যিনি ভিখারী-ঘরণী তিনি
মহিষমর্দিনী জগমাতা—
অবধান অবধান—শোন তার কথা।
এ সংসারে হৈলে পাপ মাটিতে উঠিলে তাপ
তরবারি খাপ মধ্যে ফোঁসে—
আসন টলিয়া উঠে মুকুট নড়িয়া ওঠে
চোখে বুকে ফোটে রক্ত রোষে!
জয়া দেখে পেতে খড়ি কোথা কোন অত্যাচারী
পাপে ধরা ভারি করি নাচে—
মনে পড়ে চণ্ডিকার প্রতিজ্ঞা যে আপনার—
হরিতে ভূভার কথা আছে।

মোটা ভাঙা গলায় এই ক' লাইন গেয়ে নয়ন পাল পট খুলে ধরলে।

বললে—সে কাল বাবু মহাশয়—একশত দশ বছর আগে, তখনও সিপাহী হাঙ্গামা হয় নি। দেশ কাল তখন অন্য রকম ছিল। ছোট ছোট গেরাম; কোম্পানির আমল; তখন সদ্য দেশে পাহাড়তলির বন কেটে চাষ আবাদ করছে সাঁওতালেরা।—ছোট ছোট গাঁ গড়ছে। এ সব এলাকাকে বলত 'জঙ্গি', মানে জঙ্গ করা জমি, আর বলত ডামিন।

এ গ্রামটি দেখছেন—এর নাম 'পাঁচকাটিয়া'-'বায়াহেট'।

এটি হল গ্রামের বাজার। তখনকার আমলের বেশ বড় বাজার, আর এই যে দেখছেন লোকটা ঠেঁটি কাপড় আর ফতুয়া গায়ে খালি পায়ে একটা মোড়ায় বসে সুলফা খাচ্ছে এর নাম 'কেনারাম ভকত'। এর পাশে বসে কোট পাতলুন পরা টুপি মাথায় এখানকার দারোগা—মহেশ দারোগা। জবরদস্ত দারোগা। দু হাতে ঘুষ খেতো। সব চেয়ে বেশী ঘুষ দিতো কেনারাম ভকত। তার সঙ্গে দারোগার আর সুখের সীমা ছিল না।

এই যে আশেপাশে দেখছেন সাঁওতালরা কাজ করছে—জনকতক উপু হয়ে হাতজোড় করে বসে আছে, এরা সব হল কেনারামের দাদন দেনার মুনিষ।

বাবু, দাদন দেনার মুনিষ হল কেনা মুনিষ। দশ টাকা ধার নিলে একটা মুনিষ জনমকার মত বিকিয়ে যেত; টাকায় মাসে ছ' আনা সুদ, মাসান্তে দশ টাকায় তিন টাকা বারো আনা সুদ, সে সুদ আসলে ভুক্তান হয়ে তের টাকা বারো আনা। পরের মাসে কুড়ি টাকার কাছ বরাবর পৌঁছুত। ফেরা মাসে কুড়ি টাকা হত সাতাশ টাকা চার আনা। এই শোধ দিতে সাঁওতালরা মহাজনের বাড়ি খাটতো। পেটভাতা। মজুরি নগদা নাই। তার মানে আজীবন টাকা শোধ হত না; মরলেও না; তার ছেলেপিলেদের শোধ দিতে হত। পালাবার জো ছিল না; তখন জঙ্গিপুরে 'মুনসুবি' (মুনসেফী) আদালত, সেখানে নালিশ ডিগ্রি করে, পরওয়ানা এনে গ্রেপ্তার করে জেল খাটাতো। মহেশ দারোগা তার কনেস্টবল নিয়ে এসে

বেঁধে নিয়ে যেত। কেনারাম দশটা টাকা তাকে নজরানা দিয়ে সেলাম করত। ভকত নিজে মাংস মাছ খেতো না, মদ খেতো না—বলতো সীয়ারাম সীয়ারাম। কিন্তু দারোগার জন্যে খাসী কেটে ভুনি খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াতো, মদের বোতল নামিয়ে দিত আর বলত—আরাম করেন দারোগাবাবু।

আর তার সঙ্গে দিয়ে যেত সেবাদাসী ; দারোগাবাবুর গা-হাত পা টিপে দেবে।

তার বাগিচাবাড়িতে আরামখানা ছিল পুকুরের পাড়ে, সেখানে আগে থেকে এনে মজুত করে রাখত ; তাদের কেউ ডাকতেই ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়াত ; কেনারাম হুকুম দিয়ে চলে যেত—দারোগাবাবুর হাঁত পাঁও পিঠ দাবিয়ে দে—আচ্ছা করকে ডলাই মলাই কর। হাঁ!

কাউকে ঘাড়ে ধরে এনে ফেলে দিয়ে কড়া সুরে চড়া করে বলত—আরে শালী কানিস কেনো? পাঁও টেপ।

তারপর দারোগাবাবুর হাত।

এ সব মেয়ে মাহাতো থেকে হাড়ী বাগদী বাউড়ীদের ঘর থেকে আনত। টাকা পয়সা দিয়ে আনত ; কখনও জোর করে আনত। বলতে কেউ কিছু সাহস করত না। কেনারাম ভকতের বাড়িতে বরকন্দাজ আছে, লাঠিয়াল আছে ; তার গদি আছে—বড় ব্যবসা—সবার টিকি তার কাছে বাঁধা। কিন্তু সাঁওতালদের মেয়ের গায়ে হাত বাড়াত না। ওখানে ভয় করত।

কেনারাম এক নয়— প্রতি গাঁয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে রয়—
জুড়ে সারা দেশময় এই এক হাল—
বামুন কায়েত বদ্যি ধনে মানে যার বৃদ্ধি
সব এককাল।

গাঁয়ে গাঁয়ে তখন এক হাল। বামুন কায়েত বদ্যি প্রায় সবারই রক্ষিতা থাকে ; সবারই ঘরে দু-চারজন সাঁওতাল কেনা মুনিষ থাকে। জমিদার রাজা সবারই প্রায় এক হাল।

এতেই নাকি বাবু, মা চণ্ডীর টনক নড়ল, আসন টলল, মুকুট পড়ল, মা উঠে দাঁড়ালেন।

জয়া বিজয়া খড়ি পেতে দেখলে, বললে—পিথিমীতে বঙ্গদেশে পাতকের ঢেউ বইছে—দুখী জনের চোখের জলে বান এসেছে—

মা বললেন—আরও গুনে দেখ—

জয়া বিজয়া গুনে দেখল—খড়ির দাগে দাগে অঙ্ক বাড়ল ; তারপর বললে—মা, শ্বেতদ্বীপের সাদা মানুষেরা দত্যির মত দাপাদাপি করছে, পৃথিবীর বুক জুড়ে লোহার বাঁধন বাঁধছে। তাতে পাহাড় কেটে খাল কাটছে—খাল পুরিয়ে পাহাড় তুলছে। মানুষদিগে চাবুক মারছে। কুঠি করছে—সেখানে তারা গরীবের জাত মান গতর সব কিছু বরবাদ করছে—তাই তারা কাঁদছে।

মা হেসে বললেন—তার ব্যবস্থা করেছি, তোরা অভয় পাঠা। জানান দে—রামচন্দ্রপুরের ত্রিভুবন ভটচাজ ধার্মিক ভক্ত। তাকে জানান দে আমি ব্যবস্থা করেছি; আমার কালকেতু আর বিরূপাক্ষকে মর্ত্যে পাঠিয়েছি। আর পাঠিয়েছি আমার সঙ্গিনী ডাকিনীকে। ব্যবস্থা হবে হবে হবে।'

মা অট্টহাসি হাসলেন।

ঝড় উঠল সে হাসিতে। পৃথিবীর এই অঞ্চলে বনে বনে ঝড় উঠল। পশ্চিম আকাশে উঠল কালো মেঘ, বিদ্যুৎ চমকালো বাজ পড়ল—তিনপাহাড়ের রেলরাস্তা বন্দির সাহেবরা খানাপিনা করে তাঁবুর ভিতর মদ খেয়ে হুলাহুলি করছিল—তাদের তাঁবুর কাছে শালগাছের মাথা জলে গেল, সীতাপাহাড়ীর কুঠির পাশে সাহেবের আণ্টা ঘরের মাথার শিকটা বেঁকে গেল—বাড়ি ফাটল। কেনারামের বাগিচাবাড়ির পাশে তালগাছের মাথায় বাজ পড়ল। এরপর এল ঝড়। গোটা অঞ্চলটায় বনের মাথা আছড়ে পড়ল।

বাগনাডিহির সিধু কানু, বিরূপাক্ষ বা কালকেতু কি না সে কথা থাক। কিন্তু ঝড় একটা প্রচণ্ড প্রলয়ের মত হয়েছিল সে সময় ১৮৫৪ সালের বৈশাখ মাসে, এ খবর সত্য।

সেই ঝড়ের মধ্যে লুপলাইনের ঠিকাদার কোম্পানির একজন ছোকরা ইংরেজ কর্মচারী ঘোড়ায় চড়ে চলেছিল তিনপাহাড়ীতে তাদের ক্যাম্পের দিকে। দুপাশে শালবন, মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ—পাহাড়ে পথ। সেই পথ ধরে সে চলেছিল। গিয়েছিল সে শিকারে। পিঠে তার বন্দুক; কোমরে কিরিচ। বুকে চামড়ার বেল্টে লাগানো বারুদ এবং গুলির চামড়ার ব্যাগ, আর জিনের সঙ্গে ঝোলানো একটা থলিতে মদের বোতল এবং খাবার। দেশী রুটি কলা, ঝলসানো মুরগীর ঠ্যাং আর একটা বোতলে জল।

অল্প বয়স, দুরন্ত সাহস, দুর্দান্ত প্রকৃতি; লেখাপড়া জানে না ভাল, তবে মজুর খাটাতে পারে, বেপরোয়া চাবুক লাগাতে পারে, মদ খেতে পারে, আর পারে শিকার করতে; মাস আষ্টেকের মধ্যেই সে এই অঞ্চলে এসে তিনটে চিতাবাঘ মেরেছে, হরিণ মেরেছে দশ বারোটা, ভালুকও মেরেছে চারটে। ভয় করে শুধু সাপকে—আর কিছুকে নয়।

বনের ভিতর আজ সারা দুপুরটা ঘুরেও কিছু পায় নি। খুব বিরক্ত হয়ে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করে খানিকটা নির্জলা মদ খেয়ে সে ভাবছিল কি করবে।

হঠাৎ আকাশে যেন কেউ সীসে গলিয়ে ঢেলে দিলে। বনভূমি নিথর হয়ে উঠল। পাখীগুলো যেন ভয়চকিত স্তব্ধ হয়ে গেল। ডিউই সাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল প্রশ্নের সুরে—স্টর্ম ?

নিজেই তার উত্তর দিয়েছিল—হ্যাঁ—ঝড়। ঝড় আসবে।

তা হলে ? চারদিক তাকিয়ে দেখছিল ডিউই; কোথায় আশ্রয় নেবে। ঝড়ের সময় বনের ভিতর নিরাপদ নয়।

বন্দুকের গুলিতে ভেঙে পড়া গাছের ডালকে ঠেকানো যায় না। তা হলে ?

পাহাড়ের কোন গুহা গহ্বর পেলে তার মধ্যে ঢোকা যায়, কিন্তু গ্রাট ডেভিল—সাক্ষাৎ

শয়তান ওই ফণাওলা সাপগুলো।

দাঁতের গোড়ায় থলিতে আছে তরল বিষ, তার মধ্যে আছে মৃত্যুর ঠোঁটের তীব্র লালা। ওয়ান কিস্—।

একটি চুম্বনে সব শেষ। ডিউই দেখেছে সাপে কাটায় মৃত্যু। গুহার মধ্যে কোন পাথরের ফাটল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে হঠাৎ ফণা তুলে গর্জন করে দাঁড়াবে।

মাই গড! না, সে পারবে না।

চিতা কি ভালুক থাকলে ডিউই ভয় করে না। তার সঙ্গীরা তাকে বলে 'ডেভিল ডিউই'। তা সে বটে। কিন্তু ওই ডেভিল—সাপ!

তার চেয়ে বন থেকে বেরিয়ে পড়া ভাল। খোলা মাঠও অনেক নিরাপদ।

সীসের বর্ণ আকাশ যেন একটু কালচে হয়ে এসেছে। দিগন্ত সে দেখতে পাচ্ছে না। নিশ্চয় দিগন্তের আকাশ কয়লার ধোঁয়ার মত কালো হয়ে উঠছে; ফুলছে ফাঁপছে। ঘোড়ার মুখ সে ফিরিয়ে নিল লাগাম টেনে। পেটে পায়ের গুঁতো মেরে শিস দিয়ে ঘোড়াটাকে দ্রুত চলতে ইশারা জানালে।

একটা ব্যর্থ দিন! বিফল দিন! মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। কিছু মেলে নি। এখন একটা মানুষ পেলেও সে তাকে গুলি করে মেরে দিনটাকে সফল করতে পারে।

ঘোড়াটা এই বন্ধুর চড়াই-উতরাইয়ে ভরা বনের মধ্যে একফালি পায়ে চলা পথে যথাসম্ভব দ্রুতপদে চলেছিল। মধ্যে মধ্যে পাথর উঠে আছে—গাছের শিকড় বেরিয়ে আছে; ওদিকে আকাশে একটা কালো ছায়া যেন ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে; বনের ভিতর ঘনপল্লব শালগাছের তলায় অন্ধকারের মত কিছু জমে উঠেছে। ডিউই অধীর হয়ে উঠল। সে চাবুকটা সপাং করে বসিয়ে দিল তার পিঠে!

সঙ্গে সঙ্গে চকমক করে উঠে খেলে গেল একটা আলো। বিদ্যুৎ। চোখ বুজে এল আপনি।

বৈশাখের মেঘের ডাকের একটা কর্কশ কড়কড়ে ডাক আছে। সেই ডাক ডেকে উঠল।

ঘোড়াটা চমকালো কিন্তু ডিউই চমকালো না। ভারী ভাল লাগল তার। মনে হল দূরে কামান দেগেছে কোম্পানির আর্মি—তার গর্জনটা ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে গুমগুম করে দূর থেকে দূরান্তরে চলেছে।

ওয়াণ্ডারফুল!

ঘোড়াটা কিন্তু হুঁচোট খেলে।

ডিউই একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে উঠল ঘোড়াটাকে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সমস্ত বনভূমিকে ঝলসে দিয়ে অতি তীব্র আলো খেলে গেল। মনে হল কালো আকাশটার চামড়া কে যেন একটানে ছাড়িয়ে সাদা ভিতরটা বের করে দিলে। যা নাকি অতি বীভৎস নৃশংস—যাতে ডেভিল ডিউই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল—মাই গড! চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই এক বিপুল গর্জন, কানের পর্দা যেন ফেটে গেল। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা গুলি-

খাওয়া হরিণের মত লাফ দিয়ে উঠেই পড়ে গেল—মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

ডিউইর বুকে কি গুলি বিঁধেছে?

ঘোড়াটা লাফ দিয়ে উঠল। অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে ডিউই—ডেভিল ডিউই ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরলে।

যখন তার চেতনা ফিরল তখনও সে ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। ঘোড়াটা একটা ভেঙে পড়া গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড় বইছে প্রচণ্ডবেগে। প্রলয়ের ঝড়ের মত ঝড়। গাছের মাথায় মাথায় বিপুল গর্জন যেন বেয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দের মত।

ডিউই—ডেভিল ডিউই—সে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে প্রকাণ্ড গাছটা হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পার হয়ে লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টাললে, বললে—কাম অন, জাম্প, জাম্প—

কিন্তু ঘোড়াটা নড়ল না। সে পিছন দিকে টানছে। সে পারবে না। এই শাখা-প্রশাখা সমেত প্রকাণ্ড গাছটাকে লাফিয়ে পার হতে। ডিউই একমুহূর্তে অধীর অস্থির হয়ে উঠল।

—ইউ বডমাস—হারামজাড—!

এদেশের গালাগাল ডিউইর ভারি ভাল লাগে। অনেক গালাগাল সে মুখস্থ করেছে। তার মধ্যে অশ্লীল গালাগাল বেশী। আবার টানলে সে। কিন্তু ঘোড়া নড়ল না। ওদিকে ঝড়ের গর্জন বেড়ে উঠল—একটু দূরে কোথাও আর একটা গাছ ভেঙে পড়ল—শব্দ উঠল মড় মড় মড়। তারপর একটা প্রচণ্ড শব্দ।

ডিউই অস্থির অধীর হয়ে উঠেছিল—সে মুহূর্তে কোমর থেকে তার পিস্তলটা বের করে ঘোড়াটার কপাল লক্ষ্য করে গাছটার এপার থেকে ফায়ার করলে। ঝড়ের গর্জনের মধ্যে শব্দটা নগণ্য, তবুও যেটুকু উঠল সেটুকু একটা কঠিন নিষ্ঠুর শব্দ।

ঘোড়াটা একবার চমকে উঠে টলতে লাগল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। ডিউই ফিরে দেখলে না আর—সে সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। পিঠে বন্দুক, কোমরে পিস্তল। বুকের বেল্টে ঝোলানো বারুদ গুলির চামড়ার ব্যাগ। কাঁধে ঝোলানো খাবার মদের বোতল, জলের বোতলের থলি।

চলতে লাগল সে সামনে পথ ঠাওর করে করে। বন আর বেশি নেই—ঘন পাতলা হয়ে এসেছে। গাছগুলো এখানকার ছোট ছোট। বড় গাছগুলো এখানে সর্বাগ্রে কাটা হয়ে যায়। কাটা শালগাছের গোড়া থেকে ঝাঁকড়া হয়ে ডালপালা বেরিয়েছে।

ডিউই বন পার হয়ে বেরিয়ে দাঁড়াল। আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, প্রলয়ের সূচনার মত ভয়াল ধূসর অন্ধকার। সমস্ত সম্মুখটা আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত লাল ধুলোয় ভরে গেছে। মোটা মোটা ধারায় বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে।

দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এল।

সামনেটায় যতটা বোঝা যায়, গ্রাম নেই, সমস্তটাই লালমাটি আর পাথর কাঁকর মেশানো একটা বন্ধ্যা প্রান্তর। শুধু শালগাছের ঝোপ, অর্থাৎ কাটা শালগাছের গোড়া থেকে বের হওয়া ডালপালার ঝোপ।

ছুটতে লাগল ডিউই। সে জানে এই রকম মেঘে সব সময়ে বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। বজ্রপাত হয়ে থাকলে, সেখানে মাটিতে শুয়ে থাকলে খানিকটা নিরাপদ হওয়া যায়, কিন্তু শিলা-বৃষ্টিতে রক্ষা নেই। অজস্র বুলেটের মত এসে সর্বাঙ্গ ছেঁচে দেবে। মৃত্যু অবধারিত।

বড় কষ্টকর মৃত্যু।

কারুর সঙ্গে লড়াই করে মরা যায়, কিন্তু অসহায়ের মত মরা বড় শোচনীয় মর্মান্তিক। সে দৌড়ুতে লাগল। অন্ধকার ঘন থেকে ঘনতর হয়েছে। পথ ঠিক করা যায় না। সে যাবে তিনপাহাড়ীর কাছে কণ্ট্রাক্টারস ক্যাম্পে। কিন্তু কোন দিকে যে সে চলেছে তার ঠিক নেই।

অবিরল বৃষ্টিধারায় সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে এক এক চুমুক হুইস্কী খেয়ে নিয়ে নিজেকে তাজা করে নিতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ তার মনে হল সামনে একটা ছোট জঙ্গলের মত। হ্যাঁ একটা ছোট জঙ্গল। এখানে মধ্যে মধ্যে এমন জঙ্গল আছে। তার মধ্যে এদেশের ফকির এবং সন্ন্যাসীরা থাকে। না-হয় সিঁদুরমাখা পাথর থাকে, যাকে এদেশের বর্বরেরা পূজো করে থাকে। এমন জায়গায় আশ্রয় মিলতে পারে।

দ্রুতপায়ে হেঁটে এসে সে জঙ্গলের মুখে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, একটি আলোর শিখা যেন দেখা যাচ্ছে। ডিউই কোমর থেকে তার কিরিচটা খুলে ঢুকে পড়ল জঙ্গলটার মধ্যে। হাতড়ে হাতড়ে কোন রকমে আলো লক্ষ্য করে এসে পেলে পাথরে কাদায় গাঁথা দেওয়াল খাপরাচাল একখানা ঘর। ঘরখানার দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার জোড়ের মুখ থেকে পাতলা ধারায় আলোর রেশ বেরিয়ে আসছে।

ডিউই হাঁকলে—এই কোন হ্যায় ঘরকা অন্দর? এই!

কেউ সাড়া দিলে না।

ডিউই আবার হাঁকলে—এই দরওয়াজা তোড় দেগা—এই কোন হ্যায়!

মনে হল আলোটা নড়ল। ডিউই অধীর হয়ে বললে—খুলো খুলো—জলদি খুলো!

বলে মাটির উপর সজোরে লাথি মেরে বিক্রম জানালে।

এবার দরজা খুলে গেল। একটি প্রদীপ একটি হাতের আড়াল দিয়ে বাঁচিয়ে যে ডিউইর সামনে দাঁড়াল, তাকে দেখে ডিউই হতবাক হয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য নারীমূর্তি। তার হাতের প্রদীপের আলো তারই মুখের উপর পড়েছে। রুক্ষ এলানো চুল, সে চুল অনেক, একরাশি। টিকালো নাক, বড় বড় চোখ—এদেশের আশ্চর্য সুন্দর, একটু শ্যামলা ফরসা রঙ (তাদের দেশের মেয়ের মত ফ্যাক-ফ্যাকে সাদা নয়), কপালে সিঁদুরের টিপ; মেয়েটি বললে—কে তুমি? কি চাই?

—হামি হুজুর আছে, আংরেজ আংরেজ।

—তা জানি সাহেব। কিন্তু কি চাই তোমার?

—পানিমে ভিজিয়েছি, বহুৎ ভুখ হইছে, হামি টুমার ঘরমে ঠাকবে! বকশিস মিলেগা।

—বেশ সাহেব, তোমাকে থাকবার জায়গা দিচ্ছি। চল।

—কাঁহা? হামি ঐ ঘরে ঠাকবে।

—তা হয় না সাহেব, এ ঘরে আমার ঠাকুর আছে। আর আমি নিজে মেয়েছেলে—আমি কোথা যাব? চল ওদিকে চালা আছে, সেখানে তোমাকে জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। চল।

আশ্চর্য মেয়ে। ডিউইর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মেয়েটা সাহেব দেখে ভয় করে না, সংকোচ করে না, অসংকোচে এমনভাবে কথার জবাব দিয়ে গেল! আশ্চর্য! এদেশের সন্টাল মেয়েগুলো মাথায় কাপড় ঢাকা দেয় না, সামনাসামনি কথাবার্তা বলে—লজ্জা করে না, হাসে কিন্তু তারা বুনো জাত, অসভ্য জাত, তাদের স্বাস্থ্য আছে, যৌবন আছে—তারা লোভনীয় কিন্তু অত্যন্ত একগুয়ে। কিন্তু এই সব হিণ্ডু উইমেন তারা ভেরী শাই—মুখে কাপড় ঢাকা দেয়—অত্যন্ত কোমল অত্যন্ত মিষ্ট। তারা কথা বলে না। তারা ভয় পায়। কিন্তু এ মেয়ে আশ্চর্য! ডিউই আন্দাজ করে বুঝেছে এ মেয়ে সন্ন্যাসিনী—একলা ঘোরে। তারা হিমালয়া পর্যন্ত যায়। দূর থেকে সে দেখেছে কিন্তু এমন ভাল করে দেখে নি। আজ কাছ থেকে দেখে কথা বলে সে আশ্চর্য হয়ে গেছে।

মেয়েটি বেরিয়ে এল ঘর থেকে একটা ছোট ঝুড়িতে প্রদীপটা ঢাকা দিয়ে, এবং বললে—এস।

পাশেই একটি খাপরার চালা। সেই চালার একধারে একখানা খেজুরপাতার চ্যাটাই পাতা ছিল, সেইটে দেখিয়ে দিয়ে বললে—এইটে পেতে নাও সাহেব, নিয়ে বস কিংবা গড়াও। আর তো কিছু নাই যে আমি দেব।

ডিউই বললে—টুমি কে আছে লেডী?

—আমি সন্ন্যাসিনী ভৈরবী, সাহেব।

—টুমার আর কে আছে?

—কে থাকবে বল? আছেন আমার কালী মা। ওই ঘরে আছেন। নইলে তোমাকে ওই ঘরে ঠাঁই দিয়ে আমি এখানে থাকতাম!

—হুঁ! ঢন্যবাড আছে। লেডী। থ্যাঙ্ক ইউ।

মেয়েটি চলে গেল। ডিউই বসে রইল সেই চ্যাটাইয়ের উপর। তখন ঝড় কমে এলেও বয়ে চলেছে। বৃষ্টি চলছে। প্রান্তরের মধ্যে সেই ফুট চল্লিশেক উঁচু পাথরের স্তূপের চারিপাশে জন্মানো শালগাছের মাথায় শব্দ হচ্ছে একটানা। চারিদিকে পোকার ডাক তার সঙ্গে মিশছে। ডিউই একলা বসে ভাবছিল। ঘন অন্ধকার। তামাক ভিজে গেছে, দেশলাই ভিজেছে। নানান এলোমেলো চিন্তা। ক্যাম্পে আজ মৌজের দিন! ফূর্তি চলছে। মদ খাচ্ছে। খালি গায়ে বেরিয়ে এসে জলে ভিজছে। কিংবা হয়তো নাচছে।

এমন সময় একটি চৌকো কাচের লণ্ঠনে একটি প্রদীপ নিয়ে আবার সেই সন্ন্যাসিনী বেরিয়ে

এল। আলোটি নামিয়ে দিয়ে বললে—এটা তোমার কাছে রাখ সাহেব। অন্ধকারে ভূতের মত বসে থাকতে বড় কষ্ট হবে। আর এই দেখ, কিছু খাবার আছে, তুমি খাও—মেয়েটি নামিয়ে দিলে দুটো আম আর গুড়ের মেঠাই।

ডিউইর কানে কিছু যাচ্ছিল না। সে সেই লণ্ঠনের আলোতে সেই মেয়েটির মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। আশ্চর্য লাগছে।

সে আবার বললে—টুমি কে আছে?

—আমি? বলেছি তো সাহেব আমি ভৈরবী, সন্ন্যাসিনী। বুঝতে পারলে?

—হাঁ হাঁ বুঝে। ইখানে টুমি একলা ঠাকো? অ্যালোন?

—হাঁ। আমার ভৈরব মরে গিয়েছে। এখন মা কালীর পায়ের তলায় একলা পড়ে থাকি।

—টুমাকে হামি বহুট রুপেয়া ডিবে।

—না। সাহেব টাকা নিয়ে আমি কি করব? টাকা থাকলেই তো চোর ডাকাতে এসে লুঠে নেবে। এখানে আশপাশের গাঁয়ের লোক যা দেয়, তাতেই চলে যায়। নাও, তুমি খাও। এই রইল। এখানেই কষ্ট করে রাতটা কাটিয়ে দাও। কাল সকালে বরং যেয়ো। জল হল ঝড় হল, অন্ধকার রাত—আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, রাত্রে আর বেরিয়ো না।

বলেই সে উঠে চলে গেল।

ততক্ষণে ডিউই ডেভিল ডিউই হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরটায় এতক্ষণ, যতক্ষণ সে কথা-বার্তা বলেছে ততক্ষণ একটা লড়াইয়ের মত চলেছে। মেয়েটির সপ্রতিভতা তার আতিথেয়তা যেন মুখ বাড়ানো শয়তানকে বলেছে—নো নো, ইউ মাস্ট নট ডু ইট। শয়তান তাকে দাঁত ভেঙিয়েছে কিন্তু ঝাঁপ দিয়ে বের হতে পারে নি। মেয়েটি পিছন ফিরতেই সেই স্বল্প আলোকের মধ্যে ডিউই—ডেভিল ডিউই তার কালো চুলের রাশি এবং তার গতিশীল পরিপূর্ণ যৌবন দেহখানির দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দিগ্ধ নিঃশঙ্ক মন্থরগামিনী হরিণীর উপর সুযোগ-সন্ধানী বাঘের মতই মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল।

মুহূর্ত দেরি করবার অবকাশ নেই, হয়তো মিনিটখানেকের মধ্যেই মেয়েটি ঘরে গিয়ে ঢুকবে, দরজা বন্ধ করবে; ঘরে ঢুকলে আর এ সুযোগ ফিরবে না।

শী মে ফাইট, যুদ্ধ দিতে পারে। পারে নয়, দেবেই। তার ঘরে নিশ্চয় ওয়েপন আছে ডিউই জানে এদের হাতে লোহার ডাণ্ডার মাথায় তিনটে ফলা দেওয়া একটা অস্ত্র থাকে, দে অলওয়েজ ক্যারি ইট; তাছাড়া সে কালী মা দেখেছে—কালো নেকেড গডেস, চার হাত, হাতে একটা 'দাও' থাকে, সেটা 'টয় দাও' হলেও এই ব্ল্যাক নেকেড গডেসের সামনে 'গোট সাক্রিফাইস' দেয় এরা। তার জন্য একটা সত্যকারের 'দাও' থাকে। এরা 'খাণ্ডা' বলে। সে দেখেছে। সেটা হাতে নিলেও বিপদ। সে বন্দুক দাগতে পারে। কিন্তু তাতে কি লাভ। ডেড বডি নিয়ে সে কি করবে?

গেল, ভৈরবী ঘরে বুঝি ঢুকে গেল। অ্যানাদার হাফ এ মিনিট। ডেভিল ডিউই তোমার চান্স গেল! ইউ টাইগার জাম্প জাম্প—।

ডেভিল ডিউই নিজের কামার্ততা এবং পশুত্বের তাড়নায় নিজের অজ্ঞাতসারে একটা গর্জন

করে উঠল।

আ—বলে একটা শব্দ। শব্দটার কাজ হল। মেয়েটি চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—কি হল সাহেব? কি হল? সাপটাপ—

সে ভাবলে সাহেব বুঝি ভয় পেয়েছে কিছু দেখে। তখন ডেভিল ডিউই দাঁড়িয়েছে এবং তার কথা শেষ হতে হতে সে চালাটার উপর থেকে ঝাঁপ দিলে সেই সমতল-করা পাথরের উঠোনে। এবং এক লাফেই তার কাছে এসে পড়ে তার কাপড় ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে নিজের কোলের দিকে।

মেয়েটি এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে সেই হ্যাঁচকা টানে কাত হয়ে আছাড় খেয়েই পড়ে গেল। শুধু তীব্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠে একটা চিৎকার করে উঠল—সা—য়ে—ব!

ডেভিল ডিউই তখন হরিণীর পিঠে ঝাঁপ দেওয়া চিতাবাঘের মত তার বুকে চেপে বসে তার মুখে তার হাতের থাবা চাপা দিয়ে বলে উঠল——চিল্লাও মাৎ, চিল্লাও মাৎ!—তারপর হেসে উঠল।

এরপর খানিকক্ষণ একটা ধস্তাধস্তি। আঁচড়ে কামড়ে মেয়েটা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। ডেভিল ডিউইর কামার্ততা তাতে যেন শতগুণে বেড়ে গেল। সেও তাকে আঘাত করলে, ঘুষি মারলে! মুখে কপালে।

বাঘের সঙ্গে হরিণী কতক্ষণ লড়বে? হতচেতন হয়ে গেল হরিণী। বাঘ এবার তাকে মুখে ধরে হেঁচড় দিয়ে তুললে সেই চালায়।

লণ্ঠনটা জ্বলছিল একধারে। ডিউই সেটাকে লাথি মেরে ফেলে দিলে—লণ্ঠনটা উলটে পড়ল পাথরের উঠোনে। দপ করে উঠে ভিতরের প্রদীপটা নিভে গেল।

নিবিড় অন্ধকার ভরে গেল ঠাঁইটা। শুধু ঘরের খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরের প্রদীপের দরিদ্র বিষণ্ণ আলোর ম্লান প্রতিচ্ছবিটা বেরিয়ে এসে দরিদ্র ভিক্ষার্থিনীর মত ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর ডিউই বেরিয়ে এল সেখান থেকে; নেমে এসে প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করে উত্তর-পশ্চিম মুখে চলতে লাগল।

বোতলের মদ ফুরিয়ে এসেছে প্রায়।

জলের বোতল থেকে আন্দাজে খানিকটা জল মদের বোতলে ঢেলে তাতেই চুমুক দিতে দিতে সে এগিয়ে চলল—

আকাশে মেঘ তখন কাটছে। বৃষ্টি থেমে এসেছে। বাতাস আছে কিন্তু সে সামান্যই। গরমটা নিঃশেষে কেটে গেছে। শরীর যেন ঠাণ্ডা বাতাসে শিরশির করছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে সে খুঁজলে পোল স্টার কোথায় কোন্ দিকে? কিন্তু না, দেখা যায় না, সে আন্দাজ করেই চলল। কিরিচখানা খুলে হাতে নিলে। তারপর একটা অশ্লীল গান গাইতে গাইতে প্রান্তরের পথ ধরে আন্দাজ করে উত্তর পশ্চিমমুখে চলতে লাগল।

সে খুব খুশী। একটা আশ্চর্য রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার।

নয়ন পাল পট দেখিয়ে বললে—দেখুন, পরের দিন মা কালীর থানে লোক জমেছে।

পরদিন লোক সব কান্দি করে কলরব—

লণ্ডভণ্ড পণ্ড সব—কালী ভগ্ন—মা ভৈরবী নাই।

নয়ন পাল বললে এই দেখুন বাবু, ওদিকে সেই কালবোশেখীর রাতে আর একটা বাজ পড়েছে বাগানডিহি সাঁওতাল গাঁয়ের 'জহর সর্ণা'য়।

আমি বললাম—সেখানে গিয়েছি, সে ঠাঁইটা দেখেছি। সেইখানেই তো দুর্গাপূজা হয়েছিল ?

পাল বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি দেখেছেন—তা হলে বুঝতে পারবেন খুব ভাল করে। এই দেখুন সেই 'জহর সর্ণা'। সাঁওতালরা দেবতাকে বলে 'বোঙা'। আর দেবতা যেখানে থাকেন, সেই ঠাঁইকে বলে জহর সর্ণা। সেখানে একটা বড় শালগাছ ছিল। ঠিক একেবারে পাহাড়ের যে দেওয়ালটা আছে তার মাথায়। সেই গাছটায় বাজ পড়েছে। গাছটা ঝলসে গিয়েছে। এখানেও লোকজনেরা ছুটে এসে ভিড় করেছে।

(ওদিকে) বাগানডিহির ধারে জহর সর্ণার পরে
উচ্চ শালবৃক্ষচূড়ে পড়িয়াছে বাজ—
সাঁওতালে দলে দলে ছুটে এসে কেন্দে বলে
হায় 'বোঙা' একি কৈলে—করিয়াছি কোন্ মন্দ কাজ !

এই তো সেদিন, ১৯৬৫ সনে বর্ষার সময় কালীঘাটের মন্দিরের কলসচূড়ায় বজ্রপাত হয়েছিল ; যার জন্ম এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের আধুনিকতার তীর্থস্থল কলকাতায় পরদিন লোকের ভিড়ের অন্ত ছিল না। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল উর্ধ্বদৃষ্টি উদ্‌গ্রীব মানুষদের, শুধু উদ্‌গ্রীবই বা কেন, তাদের মুখে চোখে উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। হায় কি হল ! কি অপরাধ হল ! এবং তার জন্ম একটা বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান হয়ে গেছে।

১৮৫৪ সনের বৈশাখ মাসে বাগানডিহির জহর সর্ণার সব থেকে উঁচু শালগাছের মাথায় বাজ পড়েছিল—তাতে সাঁওতালরা হায় হায় করে সেখানে ছুটে এসেছিল স্বাভাবিকভাবে।

পটে সে ছবি ঠিক ফোটে নি। আমি মনে মনে দেখতে পাচ্ছি কি ব্যাকুলতা কি আশঙ্কা কি উৎকণ্ঠা তাদের মুখে চোখে দৃষ্টিতে।

বৃদ্ধ চুনার মাঝি দাঁড়িয়েছিল সকলের সামনে।

বৃদ্ধ চুনার এ গ্রামের সর্দার তো বটেই তা ছাড়া গোটা সাঁওতাল সমাজে সে সম্মানিত লোক। বুড়ো চুনার মাঝির উপাধিই হল 'মুর্মু ঠাকুর' ; যার মধ্যে পরিচয় আছে যে সাঁওতালদের যখন নিজেদের রাজত্ব ছিল তখন তাদের বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন 'রাজা'। আজ তারা 'পুড়খানা জেটে' অর্থাৎ সাদা চামড়া ওই এংরেজদের অধীন হলেও তাদের সেকালের গৌরব তারা আজও ভোলে নি। দশ বিশখানা গ্রামের সাঁওতালরা তার কাছে আসে পরামর্শ শলার জন্ম। এই জহর সর্ণার পাশে ওই যে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পাথর আছে ওই পাথরটির ঠিক মাঝখানটি চুনার মাঝির জন্ম নির্দিষ্ট। তার দু দিকে ডান বাঁ পাশে

আধগোল হয়ে বসে অন্যান্য মুর্মু উপাধিধারী সর্দাররা, তারপর অন্যান্য সর্দার মাঝিরা। বিবাদে বিসংবাদে বিচারের শেষ কথা বলে চুনার মুর্মু ঠাকুর।

সে হাঁটুর উপর হাত দুখানা রেখে একটু ঝুঁকে তাকিয়ে আছে সামনে খাড়া পাথরটার দিকে, যেটার উপরে আছে ওই, বজ্রাহত শালগাছটা। বিস্ফারিত দৃষ্টি তার। দুই পাশে তার চার ছেলে।

চাঁদ ভৈরব সিধু কানহু। চাঁদ ভৈরব প্রৌঢ় হয়েছে। পাকা চুল দু-চারগাছা দেখা যায় কানের পাশে কপালের ঠিক উপরে। সিধু কানহু বয়সে জোয়ান। কানু তৃতীয় ভাই সিধুর চেয়ে বড়, সিধুই ছোট তবে বড় ছোট বোঝাই যায় না—তারা যমজ সন্তানের মত। দেড় বছর দু বছরের ছোট বড়। তবু কানহু সিধু কেউ বলে না। সবাই সিধুর নাম আগে করে; সিধু কানুর মধ্যে সিধু মাথায় লম্বা—বুকের পাটাও তার চওড়া এবং দুজনেই কষ্টিপাথরের মত কালো হলেও সিধুই যেন উজ্জ্বলতর জোয়ান এবং উজ্জ্বলতর কালো। তার উপর সিধু যেন থমথমে মানুষ; সে গম্ভীর। গলার আওয়াজে গম্ভীর, চোখের চাউনিতে গম্ভীর; কথাবার্তাও যেন ভারি ভারি।

সিধু চুপ করে বুকে হাত জড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে কানহু ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে ওই বাজপড়া গাছটার দিকে।

পিছনে সাঁওতালরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। মেয়েরা শঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছে। এক বৃদ্ধা কাঁদছে—পাপ পাপ; আক্কাই আক্কাই পাপে ভোরে গেল সব। আঃ আঃ—তা যেই বাবা বোঙ্গা চলে গেল, তাই জানান দিলে বাজ ফেলে পুড়ায়ে দিলে গাছঠো। বলে গেল আমি চললাম। আঃ আঃ।

হঠাৎ চুনার মাঝি সোজা হয়ে দাঁড়াল—তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে পাথরের দেওয়ালটায় হাত বুলিয়ে বললে—দেখ।

—কি?

—ফাট—। পাথর—এতো বড়ো পাথরটোকে ফাঁটায়ে দিছে। গাছের মাথায় পড়ে এই দিকে নেমে গেল!

সত্যই এবার সবার চোখে পড়ল একটা লম্বা ফাট নেমে এসেছে গাছটার গোড়া থেকে এবং গোটা পাথরটা দু আঙুল কোথাও চার আঙুল চওড়া ফাটলে দুখানা হয়ে গেছে।

সিধু বললে—দেখ, ফাটের ভিতরে টিপিং টিপিং করে জল পড়ছে।

চূড়া মাঝির বুড়ী মা কপালে হাত চাপড়ে বলে উঠল—আক্কাই আক্কাই পাপে এই বড় পাথরখানা ফেটে দুঠো হয় গেল!

চুনার মাঝি দেখছিল—হ্যাঁ, ফাটলের ভিতর টিপ টিপ ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছেই বটে। সে বললে—হঁ। ঝরছে বটেক।

সব মাঝিরাই ঝুঁকে দেখতে লাগল।

সিধু বললে—চূড়া কাকার মা বলছে আক্কাই হল আক্কাই হল। না। আক্কাই হল না। তা হলে জল পড়ত না টিপিং টিপিং করে। দেখবি দু দিন বাদে উখান থেকে পানি ঝরবেক।

ঝরনা বাইরাবে। ই লক্ষণ ভাল বেটে, খারাপ লয়। পাথর ফাটালে বোঙ্গা। পানি দিলে।

চুড়া মাঝির মা একেবারে হাঁ হাঁ করে ঝাঁপিয়ে উঠল—কি ভাল বটে? ই বাজ পড়ল গাছটি উপর ভাল হল? আঁ? আয় বাবা গ আয় মা গ, ইগিধ্‌রা বুলছে কি? চুনারের ই বিটাটি এমুনি বটে। সব কথাতে কথা বুলবে। দেখবি দেখবি—আক্কাই হল, পাপ হল কি না দেখবি—

সিধু বললে—বুলতে হবে তুকে কি আক্কাই হল আমাদের। রুজ রুজ আমি শুনি তু বুলবি আক্কাই হছে, ই সব আক্কাই হছে—বল তু কি আক্কাই হছে।

—কি আক্কাই হছে? কি আক্কাই হছে?

—হাঁ হাঁ কি আক্কাই হছে—

—হছে না? পাহাড়ের মাথাতে ছিলাম, এই সব দিকুদের সঙ্গে মুসলাদের সঙ্গে সাত ছিল না, পড়খানা জেটে এই সায়েব লোকের সঙ্গে সাত ছিল না। শিকার করতিস—জোয়ার ভুট্টা লাগাতিস—বোঙ্গার পুজো করতিস, এখুন জমিনের লোভে পাহাড় থেকে নামলি, জাঙ্গ মুলুকে গেরাম করলি, ধরতির বুকে ফাল চালছিস, ধান করছিস—তাথে কি হছে তুদের? আঁ? কি হছে?

উদ্ধত কণ্ঠে সিধু বললে—কি হছে? আমরা দাকা জম করছি, আমাদের জমিন হছে—

—হছে? কচু হছে! সব লিয়ে লিছে—দিকুরা সব লিয়ে লিছে। শুধু জমিন লিছে? জনম লিছে। লিছে না! তুরা জন্মিতে এসে দেনা করছিস—দিকুদের কাছে জনম বিকাইছে। গুলাম হছিস। তুরা রাস্তা বন্দিতে কাম করতে যাছিস! লোহার সড়ক হবে—লোহার ঘোড়ার গাড়ি ছুটবে। তুরা পাহাড় কাটছিস পথ বানাইছিস—পুয়সার লোভে ছুটছিস দলে দলে—মেয়্যাগুলোকে লিয়ে ছুটছিস। আমি কুছু জানছি না—তু কুছু জানিস না—সিখানে ডবকা ডবকা মেয়্যাগুলাকে লিয়া ওই পুরখানা শালারা দিকু শালরা দাড়িওলা শালারা কি করছে তুরা জানিস না। পাপ হছে না! পুণ্যি হছে! তুরা দু ভাই—তু আর কানুহর সঙ্গে ওই করন রায় মাঝির দু বিটী ফুল আর টুশকির হাঁড়কাবাদি করলে তুদের বাপ; সেই তখুন তুরা এতটুকুন—তুরা বড় হলি মরদ হলি। তুরা দু ভাই সাদী করলি না—পিরীত করলি লিটিপাড়ার বিশু মাঝির দুটো মেয়্যার সঙ্গে। কি হল? তাদের বাবা খাটতে গেল রাস্তা বন্দিতে—মেয়্যা দুটোকে লিয়ে গেল সোঙ্গে। দেখগা কি হল তাদের?—আক্কাই হল না?

সিধু শক্ত হয়ে উঠেছে। মুখ চোখ তার থম থম করছে। বড়ভাই চাঁদ এগিয়ে এল। সে তো জানে সিধু গোঁয়ার—রাগ হলে তার জ্ঞান থাকে না। বাবার ছোট ছেলে সে; তাদের ছোট ভাই সে, দেখতে বড় সুন্দর। ছেলেবেলা থেকে তার সমাদর। সে দুরন্ত, দুর্ধর্ষ। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। সে বদ্ধ গোঁয়ার। চাঁদ মাঝি তাড়াতাড়ি চুড়া মাঝির মায়ের কাছে এসে হেঁট হয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বললে—ই কি কথা বুলছ গো মামা-মা (দিদিমা)। সে নতুন বয়েসে ছোকরা ছেল্যা মেলা দেখতে গেল টিলাপাড়ার ঝমরু মাঝির জাঁও বিটী দুটোর সঙ্গে। মেয়্যা দুটা খানিক তিড়িকপিড়িক মেয়্যা বটে। নাচলে হাঁসলে রগড় করলে। ছেল্যা দুটো

দু দিনের তরে ক্ষেপলেক উদিকে বিয়া করবে বুলে। কিন্তুক আমাদের বাপ চুনার মুর্মুক বটেক—সি তা শুনবেক ক্যানে? মানবেক ক্যানে? উদের সাদী তো সেই ফুল আর টুশকির সঙ্গেই হইছে—না কি? ই তুমি কি বুলছ? আর বিশু মাঝি তার বিটীদিগে নিয়ে রাস্তা বন্দিতে খাটতে গেইছে তো আমাদের কি? আমাদের গাঁয়ের পাপ কিসে?

—আর তুদের তেঁইয়াত ভগিনপোত যে তাদের সাতে গ্যেল তুদের বুনকে লিয়ে!

সিধু বড় ভাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে বললে—হাঁ, রাস্তা বন্দিতে খাটছে গেইছে—খাটবেক, রোজগার করবেক—এই এ্যাতো পয়সা আনবেক। তাতে পাপটো কুথা?

—কুথা? শুধাগা, ওই সব দিকুদিগে শুধাগা—ওই সব ভাল ভাল লোককে শুধাগা ওই সব সায়েব ঠিকাদারেরা কি করে? ই—কেউ জানে না বুঝি?

সিধু বললে—সি যিদিন শুনব, সিদিন এই কাঁড় আর ধেনুক নিয়ে যাব—গিয়া পেথম মানুকিকে আমার বহিনকে কাঁড় দিয়া বিঁধব—তারপরে যি পাপী তার ধরম লিবে, তাকে বিঁধব! আর যদি তু ইসব কথা বুলবি তবে তুকে আমি—

সে দাঁতে দাঁত টিপে পাগলের মত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বুড়ীর দিকে। হাতের পেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠেছে তার। নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে সে সমস্ত অন্তরে অন্তরে। তবু বুড়ী তার সম্পর্কে মামা চূড়া মাঝির মা। তার মায়ের মাসী। তাই সে বলতে পারলে না, তোকেও কাঁড় দিয়ে বিঁধব আমি।

চুনার মুর্মু এতক্ষণ ধরে সেই ফাটলের ধারে কয়েকজন প্রৌঢ় ধার্মিক সাঁওতালদের নিয়ে বসে ভিতরের জল পড়া দেখছিল। দেখছিল জলটার রঙ কিরকম—লালচে না কালচে না সাদা। লালচে কালচে জল বের হলে সে লক্ষণ শুভ নয়। কালচে কাদাগোলা হলে অজন্মা হবে, লালচে হলে মহামারী হবে, সাদা হলে ভাল—সু বর্ষা হবে।

তারা কিন্তু এ জল দেখে বিস্মিত হয়ে গেছে, কারণ এ জলের রঙ পাতলা দুধের মত, বা জলমেশানো দুধের মত এবং এর স্পর্শ যেন গরম। ঠিক ভাল করে বোঝা যায়নি! কারণ ফাটলের অনেকটা ভিতর জল ঝরছে, তাও ফোঁটায় ফোঁটায়; অনেক বুদ্ধি করে তারা একটা কঞ্চির ডগায় খানিকটা ন্যাকড়া বেঁধে ফাটলে ঢুকিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে নিঙড়ে পরীক্ষা করে দেখছে।

একবার নয়, পাঁচ সাতবার দেখেও সন্দেহ মেটে নি। দেখেছে আর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দুটি কথার একটি প্রশ্নই বার বার করেছে—কি রকম? কিন্তু উত্তর কেউ দিতে পারে নি।

—বড়ো মাঝি!

—হঁ!

—কি রকম?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে চুনার বলেছে—কি রকম? তাই তো শুধাছি হে!

তাদের এই মৃদু প্রশ্নোত্তর এবং চোখের চাহনি দেখে ধীরে ধীরে ওখানকার সব মানুষই—সে নারী এবং পুরুষ সকলেই পায়ে পায়ে এগিয়ে জমাট বেঁধে স্তব্ধ বিস্ময়ে মনে মনে এই

প্রশ্নটিই উচ্চারণ করছিল—কি রকম ?

এরই মধ্যে বুড়ী চেঁচিয়েই চলেছিল। এবং মধ্যে মধ্যে সিধু কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ করছিল। হঠাৎ মাঝখানে এসে পড়েছিল সিধুর বড়ভাই চাঁদ। আরও একজন—সে সিধুর বউ ফুল। সে নীরবে এই দিকে তাকিয়ে দেখছিল এবং শুনছিল।

হঠাৎ সিধুর উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে বাপ চুনার মাঝি মুখ ফিরিয়ে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল। —সিধু—বেটা।

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল ফুল। কাছে দাঁড়াল।

বুড়ী তখন স্তব্ধ হয়েছে ভয়ে। সিধুর মূর্তি সত্যই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে! সিধু বলছে—পাপ পাপ! সব আমাদের পাপ! ঐ দিকুরা সব লিছে—ধান পান জমি কাঁড়া থালা বর্তন—সি আমাদের পাপ! আবার খেটে রোজগার করে আনছে তো সিটোও পাপ! তাহলে পুণ্যি কিসে রে বুড়ী—বল বল পুণ্যি কিসে হয় ?

চুনার মাঝি বললে—হাপেঃ!—গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে—থাম্!

সিধু বললে—থামব ক্যানে—বলুক, উ বলুক—

চুনার আবার বললে—হাপেঃ!

বুড়ী এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল—হাপেঃ! হাতম্ হাপেঃ!

চুনার বললে—শুন হে আমার কথাটি আগে শুন। বলে সে বাজপড়া গাছটার মাথার দিকে তাকালে; সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাকালে। চুনার বললে—দেখ মাথাটি শুকায়ে যেন ঝলসে গেইছে। হঁ, লক্ষণটি খারাপ বটে।

বুড়ী বললে—হঁ।—এবং সে তাকালে সিধুর দিকে। সিধু গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছে গাছটার দিকে।

চুনার বললে—হাতম্ হাপেঃ! কথা শুন আমার। গাছটি শুকাল, কিন্তুক পাহাড়ের পাথর ফাটায়ে পানি বাইরায়ে নিল। মারাংবোঙ্গা গাছ জ্বালায়ে দিয়ে মাটিতে নামলে। না নামলে তো পানি বাইরাইল ক্যানে ? আর পানি লাল লয়, কালো লয়, কেমন দুধের পারা সাদা! কি বুলছে মারাংবোঙ্গা ই ঠিক বুঝতে লারলম। আমরা সব বুড়া মিলে বুঝতে লারলম। না কি হে ?

প্রবীণেরা পাশেই দাঁড়িয়েছিল—তারা সকলেই ঘাড় নেড়ে বললে—হঁ। তা লারলম।

মান মাঝি—মান টুডু বললে—হঁ। মন্দও লাগছে—না কি গো মঙ্গল ?

মঙ্গল হাঁসদা ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে—হঁ। ভালও লাগছে। সাদা দুধের মতুন পানি। আবার গরম লাগছে। বকেশ্বর আছে বীরভূমে—সিখানে বাবা শিববোঙ্গা আছে—সিখানে এমুনি গরম জল!

চুনার বললে—তা হলে আমি বলি কি—

—হাঁ হাঁ—বল বল।

—বুলছি এইতো শনিচরবারে ইখানকার সব আমাদের মাঝির গাঁয়ের সর্দারেরা পরগনাতরা আসবেক; জমবে সব লিটিপাড়ায়। এই যে আমড়াপাড়ার কেনা ভকতের নতুন

দিকুরা সাঁওতালদের সব লিছে কেনেকুড়ে, দারোগার সঙ্গে জোট বেঁধেছে, তার লেগে সাহেবের কাছে দরখাসু দিবে, আর ফিরতি পথে লাবড়াপাড়ার জঙ্গলের ধারে আমাদের জমায়েত হবেক। শলা হবেক। তখুন—।

ডগরু হেমব্রম বললে—হঁ হঁ হঁ। তখুন আমরা শুধায়ে দিব ইটি কি বটে—ভাল না মন্দ। খুব ভাল, কি বল গ ?

—উঁ—হু—চুনার বললে—আমি বলি কি—

—কি বল !

—বলি কি—বলি এই গুরুমাঝি যারা তাদিগে না হয় লিয়ে আসব নেওতা দিয়ে। আঁ ?

—হঁ। হঁ।

—তারা দেখুক নিজের চোখে। আঁ ?

—হঁ। হঁ। খুব ভাল কথা।

—হঁ। খু—ব ভাল কথা। তা হলে এই কথা রইল।

—হঁ।

—তার আগে সব হাপেঃ। চুপ। চুপচাপ।

বৈশাখ মাস—গত রাত্রে এত ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে—কারুর চালা উড়েছে, কারুর ঘরের চালের খানিকটা উড়ে গেছে। রতন মাঝির বাড়িখানা একটেরে, জঙ্গলের গাঁ ঘেঁষে ; অবশ্য গাঁয়ের কাছাকাছি জঙ্গলের গাছপালাগুলি সবই ছোট ছোট ; তাও একটা ছোট গাছ মাঝ-বরাবর মুচড়ে ভেঙে রতনের ঘরের চালের মাথায় ঝুঁকে পড়েছে। একেবারে ভেঙে পড়লে চালাখানা মচকে যেত। কিংবা হয়তো ভেঙেও যেতে পারত। সকালে এতক্ষণ পর্যন্ত পাটকাম কারুর হয় নি। কাল রাত্রেই বাজটা যখন পড়েছিল, তখনই সকলে বুঝতে পেরেছিল বাজটা পড়ল জহর সর্ণার সেই সব থেকে উঁচু গাছটার মাথায়। রাত্রে ঝড় বৃষ্টি থামলে দু-চারজনে এসেছিল, চুনার মাঝি—তার চার ছেলে, টুডু গুষ্টীর মান টুডু, হাঁসদাদের মঙ্গল, হেমব্রমদের ডগরু মিলে এসেছিল, কিন্তু ঠিক ঠাওর কিছু হয় নি। তাই সকালে উঠেই সব কাজ ফেলে মেয়েছেলে জোয়ান বুড়ো, সকলে গিয়েছিল জহর সর্ণায় বোঙ্গা যে গাছটিতে থাকেন সেই গাছের উপর বাজ পড়ল—গাছটা পুড়ে গেল। তাই দেখতে গিয়ে প্রায় আধপ্রহর কাটিয়ে বাড়ি ফিরল।

মেয়েরা ঘরের কাজে ব্যস্ত হল। পুরুষেরা গরু বাছুর মহিষ ছাগল ভেঁড়া ছেড়ে দিলে। বাঁধা রইল শুধু চাষের কাঁড়া আর দামড়াগুলা। গিদ্‌রা অর্থাৎ বাচ্চা ছেলেগুলো তাদের নিয়ে চলল গ্রামের ধারে। মাঠে ঘাস খাবে। মুরগীগুলোকে ছাড়লে।

মরদেরা তামাকপাতা পলাশপাতায় জড়িয়ে চুটি বানিয়ে চকমকির আগুনে ধরিয়ে ভাঙা তাল পরিষ্কার করতে লাগল। সাঁওতালপাড়ার জীবন সংসারের চাকায় ঘুরতে শুরু করলে।

উঁচু ডাঙায় সাঁওতালদের গ্রাম। এবং প্রত্যেকের ঘরের পাশে কতকটা করে খোলা পতিত জমি। কাঁকরে এবং পাথরে ভরতি। সেগুলো কালকের জলে বেশ ভাল নরম হয়েছে।

আজই তাতে চাষ দিতে পারলে সহজে চষে ফেলা যাবে। এই জমিতে তারা জনার লাগাবে। জোয়ার লাগাবে, মরদেরা কাঁড়া খুলে হাল জুড়লে।

চুনার বললে—আজ যে বসে থাকবেক, তার আর চাষ হবে না। চষে দে। চষে দে। হড়হড় করে হাল চলবেক।

দেখতে দেখতে গোটা গ্রামটা কর্মরত হয়ে গেল।

শুধু একজন ছাড়া।

সে সিধু। অহর র্গা থেকে সকলে চলে এল যখন তখনও সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার আসবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তার বউ ফুল মেঝেন তাকে জানে—সে ফিরতে ফিরতেও বার বার ফিরে ফিরে দেখছিল সে আসছে কিনা। থমকে থমকে দাঁড়াচ্ছিল সে। তার জা তারই সমবয়সী টুশকি মেঝেন তার সঙ্গে ছিল। কথা বলতে বলতে আসছিল। কথা সবই এই কথা। আজকে বাগান-ডিহিতে কারুরই আর অন্য কোন কথা ছিল না। সকলেই ভয় পেয়েছে। তার উপর চূড়া মাঝির মা 'বুড়ী' যে সব অলক্ষুণে কথা বলেছে তাতে ভয় বেড়ে গিয়েছে। শুধু সিধু তার সঙ্গে তকরার করে খুব জোরে জোরে 'না না' বললেও তারা বিশ্বাস করতে পারে নি। মনে মনে দোষই দিয়েছে সিধুকে। ফুলের বার বার ইচ্ছে হয়েছে সিধুকে মিনতি করে বলতে—থাপেঃ থাম। ও গো থাম।

কিন্তু এত লোকের সামনেও বটে এবং নিজের স্বামী বলেও বটে, বলতে পারে নি। সিধুকে সে জানে। আজ ছ সাত বছর তাদের বিয়া হল, বেটা বেটী হল দুটো, তবু এখনও সে সিধুকে বুঝতে পারে না। তাকে কেমন ভয় লাগে। শুধু সন্ধ্যাবেলা হাঁড়িয়া জম করে নাচনের সময় সিধু যখন মাদল বাজায় তখন সব মেয়ের মধ্যে সে-ই মেতে ওঠে বেশী। তার মত নাচ আর কেউ নাচতে পারে না। তারপর বাকী রাত্রিটা, সেও এক এক দিন। তখন সিধু আর এক মানুষ। সে তখন ফুলের পালন করা দামড়া বাছুরটার মত অনুগত। আবার রাত পোয়ালেই যাকে তাই। শুধু ফুল কেন গোটা চুনারের সংসারটাই তাকে ভয় করে—তাকে নিয়ে বিব্রত।

ফুল থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সিধু কানু দুই ভাই বেশ পিছনে পড়ে গিয়েছে। টুশকি বলেছিল—দাঁড়ালি কেনে?

—উই দেখ দু ভেয়ে পিছাইছে; মতলব—উহা আসবে নাই।

—আসবে নাই তো করবেক কি বিধুয়া মিনসেরা?

—গুজুর গুজুর করবেক দু ভেয়ে। আর কি করবেক? তু ডাক্।

টুশকির প্রতাপ আছে। সে মুখরা মেয়ে। ফুলের মত নরম মেয়ে নয়। সে পিছিয়ে খানিকটা গিয়ে বেশ উচ্চকণ্ঠে ডেকেছিল, শুনছ হে—হেই! হেই দু ভেয়েরা! বলি পিছাও কেনে হে? ঘরদুয়ারে পাটকামগুলা করবেক কে? বলি গিদরা চারটে কাঁদছেক, ভুখ লাগল, তাদের খেতে দিব, না ঘরে কাম করব? হঁ। আমাদিগে কিনে আনছিস না কি? গিদরাগুলা আমরা বাপের ঘর থেকে আনলম লয়? লাজ লাগে না তুদের?

টুশকির কথা বলবার একটি মনোরম উদ্ধত ভঙ্গি আছে, যা সকলের ভাল লাগে। যার জন্ত এই গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যেও সকলে একটু হেসে ফেলেছিল। চুনার মাঝি পর্যন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—দেলাঃ হো, হো সিধু হো কানু, দেলোঃ—জলদি সি—ধু—।

সিধু কানু তখনকার মত ফিরেছিল। ফিরে কাজকাম সেরে, কিছু গাছের ডাল সরিয়ে, গরু বাছুর ছাগলগুলোকে বড় ভাই চাঁদের বারো বছরের ছেলেকে জিম্মা দিয়ে চুটি অর্থাৎ ওদের নিজের হাতে তৈরি বিড়ি খেতে বসেছিল।

সাঁওতালেরা ভোরবেলা ফ্যানে ভাতে চারটি খেয়ে নিয়ে দিনের মত কাজে নামে। সে খাওয়া আজ হয় নি। ভোরবেলা আজ ভাত চড়ানো হয় নি। মেয়েরা ঘরের কাজ সেরে প্রহরখানেক বেলা হতে ভাত নামিয়েছিল। তাই কিছুটা খেয়ে ঘরে ঢুকে ঘরের কোণে পচাই মদের হাঁড়ি থেকে খানিকটা মদ ছেঁকে খেয়ে সিধু চুপ করে বসেছিল দাওয়ার উপর।

ফুল কাজ করতে করতে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল? বসলি যে? হাল জুড়বি না?

—না।

—তবে কি করবি?

—ঘুমুবো।

—ঘুমুবি? কেনে?

—আমার মন! বলে খাটিয়াটার উপর গামছা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ফুল আর কিছু বলতে সাহস করে নি।

তারপর কখন যে সে উঠে চলে গিয়েছে ফুল তা দেখতে পায় নি। কারণ সে তখন বাড়ির পাঁদাড়ে ঘুরছিল। সেখানে সে কতকগুলো কাঁকুড়ের থানা দিয়েছে, দেওয়ালের গায়ে ঝিঙের লতা উঠেছিল সেগুলো কালকের ঝড়ে পড়ে গেছে; কতকগুলো ভিণ্ডির গাছ হয়েছে। সে সবগুলোর তদ্বির করতে গিয়েছিল। তাদের বেটা বেটী খেলা করছিল উঠানে।

সিধু কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েও ঘুমোয় নি! তার মনটা কেমন হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে নয়, সে কাল সকাল থেকেই। মন অবশ্য তার ছেলেবেলা থেকেই চড়া। কেমন যেন চট করে খিঁচড়ে যায়। লোকে বলে, তার গায়ে অনেক জোর আছে···তার কাঁড় কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না; সে ধনুকের বাঁশটা পা দিয়ে চেপে দুই হাতে জ্যা টেনে একসঙ্গে চারটে পাঁচটা কাঁড় ছাড়তে পারে। এবং তাতেও তার লক্ষ্য মোটামুটি ঠিক থাকে। তাদের টাঙির এক কোপে সে একটা কাঁড়ার গলা দু ভাগ করে দিতে পারে। পারে সে অনেক কিছু। তার জন্তে তার গরব আছে দেমাক আছে, কিন্তু তার জন্তে মেজাজ তার খারাপ হয় না। মেজাজ খারাপ হয় লোকের অন্তায় দেখলে, অন্তায় কথা শুনলে।

কাল সকালে সে বুলুং অর্থাৎ নুন আনতে গিয়েছিল লিটাপাড়ার দিকে বারহেটের বাজারে।

বারহেটের বাজার বেশ বড় বাজার। ধান চাল ডাল কলাইয়ের আড়ত। বড় বড় কাপড়ের দোকান আছে। নুন-মশলা তেল থেকে শুরু করে কাঠ-লোহা সব মেলে। শৌখিন পুঁতি লাল গামছা ভালো কাঁকুই চাবকি ফিতে মাদুলি তক্তি, পিতলের ও রূপাদস্তার গহনা

তাও পাওয়া যায়। ওখানকার সব থেকে বড় কারবারী মহেন্দ্র ভকত; আমড়াপাড়ার কেনারাম ভকতের জ্ঞাতি ভাই। তা ছাড়াও মাহাতোদের দোকান আছে, বাঙালী দিকুদের ছোটখাটো কারবার আছে, আরও সব বাঙালী দিকু আছে—বাম্‌ড়ে অর্থাৎ বামুন আছে—আরও সব বাঙালী দিকু আছে—বাম্‌ড়ে অর্থাৎ বামুন আছে—তারা সব ওই দোকানে খাতা লেখে কাম করে।

সিধুর সঙ্গে গ্রামের আর কয়েকজন ছোকরা মাঝি ছিল, তারা সিধুকে সর্দারের মত মানে। সিধুর বয়স ২৮।৩০। দলের ছোকরারা প্রত্যেকেই বিশ কিংবা বাইশ। তারা নুন কিনবার নাম করে গেলেও আরো কিছু কিছু জিনিস কিনবার জন্ম দল বেঁধেছিল সিধুর সঙ্গে। সিধুর যেমন গোঁয়ার বলে অখ্যাতি আছে তেমনি বুদ্ধি এবং হিসেব-বোধের সুখ্যাতি আছে। তাকে সহজে ঠকানো যায় না। তারা নিয়ে গিয়েছিল প্রত্যেকে এক কেঁড়ে করে ঘি, আঁটি-বন্দী ময়ূরের পালক, তার সঙ্গে সিধুর ছিল তার শিকার করা বড় চিতাবাঘের নখ। দিকুর ছেলেদের গলায় সোনা রূপার তক্তির সঙ্গে গেঁথে দিলে খুব ভাল লাগে। কিন্তু সিধু এসব দিয়েও আড়াই সেরের বেশী নুন ছাড়া আর কিছু আনতে পারে নি। সে শুনেছিল ঘিয়ের সের ছ আনা, নুনের সের ছ পয়সা। কিন্তু তারা গিয়ে শুনলে ঘিয়ের দর চার আনা নুনের সের ছ আনা।

সে বলেছিল—না। আমি শুনলাম ঘি ছ আনা সের।

ভকত হেসে বলেছিল—সে উঁয়সা ঘিউয়ের লয় মাঝি। গাওয়া ঘিউয়ের দর ছ আনা লয় পাঁচ আনা—টাকাতে 'পে' সের; বলে তিনটে আঙুল দেখিয়ে ছিল। তারপর বলেছিল—ভঁয়সা ঘিউয়ের দর টাকাতে 'পোন' সের—বলে আর একটা আঙুল যোগ করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল—মিৎ, বার, পে, পোন। টাকাতে পোন সের। মিৎ সের পোন আনা।

প্রথম সিধু এ দরে জিনিস দেয় নি ভকতকে। কিন্তু সকলেই বলেছিল সেই এক দর। তার ওপর দিতে গিয়েও তার বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না; তার এক কেঁড়ে ঘিউ এক সেরের বেশী নয়। তার, আন্দাজ ছিল অন্তত আড়াই সের ঘি। ভকত তাকে দাম দিয়েছিল চার আনা, আর অল্প খানিকটা বাড়তি হয়েছিল বলে তার জন্যে এক আনা। এই পাঁচ আনা দাম দিয়েছিল তাকে।

বাঘের নখ কটার দাম পেয়েছিল তিন পয়সা আর ময়ূরের পেখমগুলার দাম এক পয়সা।

ঘিয়ের বেলায় মাপের সেরটা এক কেঁড়ে ঘিয়ে ভরে খানিকটা বেশী হল। কি করে যে কি হল সে বুঝতে পারে নি। সে শুনেছিল যে ওতেই তারা মারপ্যাচ করে; সেই জন্যে মাপের বাঁশের চোঙটা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়েছিল ভাল করে। কিন্তু কোন হদিস মিলল না। কিছু বুঝতে পারলে না। ভকতের নিজের বড় ঘিয়ের হাঁড়ির উপর চোঙটা রেখে ঘিটা গরম করে নিয়ে ঢালতে লাগল। ঢালছেই ঢালছেই, ভরছে না।

সে সব সমেত সাত আনা পেয়েছে, কিন্তু ছোঁড়াগুলা কিছুই পেলে না, কারুর সের আর ভরলই না।

ফুলের জন্যে রূপাদস্তার হাঁসুলী কিনবে, গিদ্রা দুটোর জন্যে বালা কিনবে ভেবেছিল।

পুঁতির মালা কিনবারও ইচ্ছে ছিল কিন্তু কিছুই কেনা হল না।

সে বুঝতে পেরেছিল যে ভকত দিকু তাকে ঠকালে। কিন্তু কিসে ঠকালে সে ধরতে পারে নি। মুখ তার রাগে থমথমে হয়ে উঠেছিল—বলেছিল—ই কি হল? ঘিউটো গেলো কোথা গ ভকত?

ভকত হি হি করে হেসে বলেছিল—ভূ.ত খেলে রে।

—ভূতে কি করে খেলে?

—না খেলে তো কাঁহা গেল? তু বল না। তোর চোখের সামনে তো মাপলাম।

—আমার ঘি ফিরে দে।

—ফিরে দেব? কি করে ফিরে দেব? আমার হাঁড়িতে ঢাললাম। ফিরে দেব কি করে? ভাগ্ বোজা কাঁহাকা!

চোখ দুটো হঠাৎ রাঙা করে এরপর ভকত হয়েছিল আর এক ভকত। গলাটা ঝেড়ে ষাঁড়ের মত গাঁক করে ডেকেছিল—ভূপ সিং।

দশ বারোজন পশ্চিমা দারোয়ান এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে—ভকতজী!

একজন সাঁওতাল ভকতের বাড়ির চাকর—সে ছুটে তাদের কাছে এসে বলেছিল—চেদা এন্দ্রে কেনাম? রাগ করছিস কেনে? মাপ যা হল তার দাম লে, ঘি ফিরে লিবি কি কথা?

কথা তাদের নিজেদের ভাষাতেই হচ্ছিল। কিন্তু ভকত তাদের ভাষা জানে। সে বলেছিল—হাঁ। ন্যায্য দাম যা হল নিয়ে চলে যা। মাপ করে ঘি নিয়েছি, ফিরে দিব ই কোন্ কথা? আঁ? কোন্ আইনে তু ফিরে পাবি? বেশী চালাকি করলে থানাতে মহেশ দারোগার কাছে বেঁধে পাঠিয়ে দিব। হাজার সাঁওতাল আসছে, ঘি কিনছি, ধান চাল কিনছি, চালন দিব শহর খুলুকে। ঘি ফিরে লিবি?

চাকর সাঁওতাল বলছিল—তাই দে গো ভকতজী, তাই দামই দে। লে গো লে—কি নাম বেটে তুর?

—নাম আমার সিধুমুর্মু। বাগনাডির চুনার মুর্মুর ছুটু ছেলে বটি আমি।—বেশ অহঙ্কার করেই বলেছিল সে।

সে সাঁওতালটি বলেছিল—আর বাবা! চুনার মুর্মুর বেটা তু! ছুটু বেটা! সে ডান কনুইয়ে বাঁ হাত ঠেকিয়ে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেও দিয়েছিল, সে যখন নমস্কার করছে তাকেও করতে হবে বৈকি!

সে লোকটার বাড়ি সাহেবগঞ্জের দিকে। সে ভকত বাড়ির চাকর আজ সাত বছর। বাপ মরার সময় গেল্ (দশ) টাকা ধার করেছিল ভকতের কাছে···সেই টাকা শোধ করবার জন্তে আজও খাটছে। সে খাটে, তার স্ত্রী খাটে। খাবার ধান পায়। বাস্। আর কিছু না। লোকটার নাম নিমু হাঁসদা।

এমন চাকর ভকতের বাড়িতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন আছে। কেউ ভকতের দোকানে খাটে, বাড়িতে খাটে—বাকী সব খাটে ক্ষেতির কামে। গোটা বারহেটের বাজারে দিকুদের

বাড়িতে এমন চাকর আছে দেড়শো দুশো। বারহেট মস্ত বাজার। আগে বাজারটা ছোট ছিল। এখন রেলের রাস্তাবন্দি হচ্ছে, তার জন্যে এখান থেকে ঠিকাদাররা রসদ কেনে; তিনপাহাড় বারহারোয়ার কাছ থেকে তারা আসে গাড়ি নিয়ে। এরাও নিয়ে যায়। রাজমহল বাজারে যায় বড় বড় মহাজনেরা। মহিন্দর ভকত মাল পাঠায় রাজমহল। সাহেবদের নীলকুঠি আছে—সেখানেও সে মাল দেয়।

জিনিস ওই এক নুন ছাড়া আর কিছু কেনা তার হয় নি। আড়াই সের নুন—তাও সে কতটুকু! তাদের পাইয়ে মাপলে খুব জোর দু পাই ভরে এক মুঠা হবে। নুনের বাটখারা আলাদা। ধান যে বাটখারায় নেয় সে বাটখারা নয়! ছোট আলাদা বাটখারা। সরকারী আবগারী বাটখারা। সবাই বলে আলাদাই বটে।

সঙ্গের ছোঁড়াদের মধ্যে ঝিকরু মাঝি—সে তার সমবয়সী—সে এর আগে অনেকবার বারহেটে এসেছে। অন্য ছোকরারাও দু'চারবার এসেছে। কিন্তু সিধু সব থেকে কম এসেছে। তাকে তার বাপ দাদারা আসতে দেয় না। বলে মেজাজ খারাপ মারামারি করবে। ঝিকরু বললে—তা সিধু মিছা রাগ করিস হে।

তারা বারহেটের বাজারে লক্ষ্যশূন্যের মত ঘুরছিল—শুধু দেখা। কত দোকান কত বাড়ি—দিকুরা সব কেউ ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, কেউ হেঁটে চলেছে। কত কেনাকাটা করছে। কত হাসছে। দোকানে দোকানে কত জিনিস। কত রঙ; কত সুন্দর। কিন্তু তাদের পয়সা নেই। শুধু দেখেই বেড়ালে। সিধু চুপ করেই চলেছিল। মনের ভিতর সেই ভকতের দোকানের রাগ যেন সাপের মত ফোঁসাচ্ছিল।

সে বেশ বুঝেছে পাকে ঠকিয়ে নিলে। কিন্তু কি করবে সে? কিছু সে বুঝতে পারছে না, বোঝাতে পারছে না, তা ছাড়া তারা এখানে ক'জন! কি করবে? বেশী জন হলেই বা কি করবে। 'পুড়খানা জেটেরা' অর্থাৎ ওই ছালচামড়াওঠা সদা রাঙা সাহেবগুলান এখুনি বন্দুক সিপাহী নিয়ে আসবে। দারোগা আসবে লালপাগড়ি বাঁধা সিপাহী নিয়ে।

হঠাৎ সে থুথু ফেলেছিল। থু থু থু থু।

ঝিকরু জিজ্ঞাসা করেছিল—গলা শুকাল হে। খৈনী খাবে?

—না।

—তবে?

—দেখ কেনে আমাদের জাতভাই সাঁওতালগুলানকে কি বুলছে। গাল দিছে।

—দিবে না! উরা তো টাকা নিয়ে বিকাইলে হে।

—কত টাকা দাম দিলে হে? একটা হড় (মানুষ) বেটে!

—তা দশ টাকা আট টাকা। যে যেমুন। টাকা লিলে কেনে?

এর উত্তর খুঁজে পায় নি সিধু। চুপ করেই থেকে ছিল। বিশু মাঝি বলেছিল—ইবার ফিরে চল। মিছা ঘুরে ঘুরে কি করব? ধূপ বড়া চড়া হয়েছে, ফিরা চল। পথে ঝরনার ধারে খাজারি (মুড়ি) ভিজায়ে খেয়ে লিয়ে সিরিং করতে করতে চলে যাব।

—সিধু।

—হুঁ।

—চলা কানা। চল্। ফিরে চল্।

সিধু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। সামনেই একটা দিকু দোকানদার ছোট একটা দোকানে কাঁকুই, পুঁতির মালা, পিতলের গহনা বিক্রি করছিল। তার আপসোস হচ্ছিল সে কিছুই কিনতে পারলে না। মাত্র ছটা পয়সা তার মাথার পাগড়ির চাদরের খুঁটে বাঁধা আছে।

ঝিকরু বুঝতে পেরেছিল তার আপসোসের কথা। সে হেসে বলেছিল—তুর পেখম কিনা। তুকে তো তুর বাবা দাদারা আসতে দেয় না। তু রাগ করছিস! কিন্তুক মিছে রাগ সিধু। মিছে রাগ করছিস।

সিধু অকারণে ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলে। তারপর বললে—একটা হাড়ের (মানুষের) দাম দশ টাকা। ফিরে চল। ফিরে চল।

বলে পিছু ফিরে হনহন করে চলতে শুরু করেছিল। কোথাও দাঁড়ায় নি। পিছন ফিরে দেখে নি সঙ্গীরা আসছে কিনা। শুধু ভাবছিল একটা হাড়ের দাম দশ টাকা। বারহেটে থেকে বের হয়ে এসে একটা ছোট জঙ্গলে একটা ঝরনা পেয়ে ফিরে দেখলে সঙ্গীরা নেই, তারা অনেক পেছিয়ে পড়েছে, সে ঝরনার ধারে বসল সঙ্গীদের অপেক্ষায়। হঠাৎ ঝিকরুর কথার জবাব সে দিতে পারে নি। তাতে তার রাগ বেড়েই গেছে। এবং জবাব দিতে না পারলেও, অত্যন্ত অন্যায় মনে হয়েছে। নিয়েছিল কেন! টাকা নিয়েছিল কেন! কিন্তু একটা মানুষের দাম দশ টাকা! আজীবন খেটে তা শোধ যায় না!

ঝরনার জলে নেমে মুখ হাত ধুয়ে মাথার চাদরের পাগড়িটা খুলে রেখে মাথাটাও ধুয়ে ফেললে।

তারপর সঙ্গীদের অপেক্ষায় একটা শালগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইল। বাঁশীটা গোঁজা ছিল কোমরে, সেটা খুলে বাজাতে মন লাগল না। বসেই রইল।

পাশে রাস্তা দিয়ে লোক আর চলছে না। বোশেখ মাস—দুপুর হয়ে এসেছে। বাড়িতে ভোরে ফ্যানভাত বেশ পেট ভরে খেয়ে এসেছে। কিন্তু তা কখন হজম হয়ে কোথায় গিয়েছে তার ঠিক নেই। খিদেতে পেট চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু সঙ্গীরা ফিরে না এলেও খেতে ইচ্ছে করছে না। তার সঙ্গে খানিকটা গুড় আছে, লঙ্কা আছে, ক্ষেতের বুটকলাই আছে। কাল রাত্তে ফুল চারটি বুটকলাই ভিজিয়ে সিদ্ধ করে দিয়েছে। বেশ বতর হবে। সকলকে দিয়ে খাবে এই ইচ্ছে। কিন্তু এরা এখনও আসছে না! কি হল? রাগ করলে? না। রাগ করবে না। কি করছে? দেখে বেড়াচ্ছে! দেখে বেড়াচ্ছে! শুধু দেখে বেড়াচ্ছে! ফ্যালফ্যাল করে দেখছে। থু থু! কি হবে দেখে? কি হবে?

তারা খরগোশ পাখী মেরে খায়—কুকুরগুলো জিভ হা হা করে বসে থাকে। টপটপ করে লাল পড়ে। এ তাই। থু!

হঠাৎ তার অত্যন্ত রাগ হয়ে উঠল। এই দুষ্টু দিকুরা যদি একেবারে সব মরে যায় তো ভাল হয়। তারা সব দখল করে নেয়। মরংবোঙা তা কেন করে না তা সে বোঝে না। না। উরা যদি রোগ হয়ে মরে যায় তো কি হবে? তাতে বুকের আগুনটা কি করে মিটবে?

তার চেয়ে মরংবোঙ্গা যদি তাকে চড় দেয়—বলে, সিধু তুর বাপ দাদোর বাপ দাদোর দাদোর দাদো রাজা ছিল, তার টাঙ্গিতে হাতী কাটত সে। তার গায়ে কাঁড় বিঁধত না। আজ থেকে তু তাই হলি। যা তু চাই হলি। যা তু টাঙ্গি হাতে বেরিয়ে চলে যা—যত দিকু আছে সকত আছে কেনারাম আছে মহিন্দর আছে দারোগা আছে সিপাহী আছে সব কেটে ফেলা। কচাকচ কচাকচ। তা হলে সে বেরিয়ে পড়ে সব ওই দুশমন দিকু আর পুড়খানা জেটেদের কেটে ফেলে রাজা হয়ে বসে। সাঁওতালদের সব ওই বাড়ি দেয়। তবে তবে তবে সে খুশী হয়। বোঙ্গা হে! হে বাবা তুমি তাকে—

হঠাৎ শিকারী সাঁওতালের কানে এসে পৌঁছুল একটা শব্দ। খরখর শব্দ হচ্ছে। এই ছোট শালবনটার এই ঝরনাটার চারিপাশ ঘিরে অল্প ক'টি গাছ আর বাকী সব কাটা শাল-গাছের গুঁড়ি থেকে বের হওয়া ঝোপ। কোন ঝোপের মধ্যে কিছু নড়ছে—শুকনো পাতা পড়ে আছে ভিতরে, তার উপরে চলেছে। মাঝদুপুর হয়ে এসেছে। ঝোপের ভিতর যে সব ছোট জন্তু শুয়ে ঘুমোচ্ছিল তাদের কেউ তেষ্টায় জেগে উঠেছে। এখুনি মুখ বের করে চারিদিক দেখে খুরখুর করে ঝরনার ধারে এসে চুকচুক করে জল খেয়ে আবার ফিরে যাবে ঝোপের মধ্যে। অতি সন্তর্পণে সে কাঁধের ধনুকটা ঠিক করে নিয়ে গাছের আড়ালে বসল—দুটো কাঁড় ঠিক করে নিলে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

আরেঃ! ওপাশে একটা জলের ধারের ঝোপ থেকে ওটা কি। ছেয়ো রঙের গোল মুখ বের করে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে! ওরে শালা! 'রোণ্ডা' বটে—বনবিড়াল! হাঁ! শালা কি তাকে দেখলে নাকি? না হলে এমন করে মুখ লুকিয়ে নেবে কেন? কিন্তু খরখর শব্দটা তো ওখান থেকে উঠছে না। একটু এপাশ থেকে হাঁ, ওই যে একটা খরগোশ বেরিয়েছে। বেরিয়ে উবু হয়ে বসার মত বসে দেখছে। আর তার পিছনে দুটো বাচ্চা। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে জল খেতে বেরিয়েছে। হাঁ—। এতক্ষণে সে বুঝলে ব্যাপারটা, শালা শয়তান বন-বিড়ালটা ঠিক কান খাড়া করে মুখ বের করেছিল। শালা ওই ঝোপে ঘাপটি মেরে বসে আছে। খরগোশ তিনটি এগিয়ে আসছে খুরখুর করে। ওদিকে ওই বনবিড়ালটার মাথা বেরিয়েছে। বাগ পেলেই ঝাঁপ দেবে। কিন্তু সে কি করবে? খরগোশটাকে মারলেও বনবিড়ালটা ঠিক মুখে করে নিয়ে পালাবে।

শালা ওই দিকুদের মত। শালা।

কিন্তু সে খরগোশটা ছাড়বে? উঁহু। সেই মুহূর্তে ঠিক করে ফেললে মতলব। দুটোকেই মারবে সে এক কাঁড়ে। শালা বনবিড়াল দিক ঝাঁপ খরগোশটার উপর। খরগোশটা চেঁচাবে—একটু ঝটপট করবে···সেই মুহূর্তে সে ছাড়বে কাঁড়। এক কাঁড়ে দুটোকে বিঁধবে।

কাঁড় ধনুকে লাগিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসল। ওই শালা বনবিড়াল তৈরী হচ্ছে। দেবে লাফ এইবার। দিলে লাফ, এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে মা খরগোশটার উপর পড়ে কামড়ে ধরলে তার ঘাড়।

সেও কাঁড় ধরে টান দিলে ধনুকে। লক্ষ্য করতে করতে তার মনে হল এ লক্ষ্য যদি ঠিক বেঁধে তবে নিশ্চয় মরংবোঙ্গা তার উপর খুশী হয়েছেন। এবং সেই টাঙি তিনি তাকে নিশ্চয়

দেবেন যাতে সে ওই দিকুদিকে আর ওই সায়েবদিকে এমনি করে একসঙ্গে মেরে ফেলবে। ছেড়ে দিলে সে কাঁড়। একটা 'হিজ্' মত শব্দ করে কাঁড়টা বেরিয়ে গেল।

তারপরই উঠল একসঙ্গে দুটো জন্তুর ক্রুদ্ধ আর্তনাদ। হা হা, দুটোই গেঁথে গেছে এক তীরে। জয় মরংবোঙ্গা!

লাফিয়ে উঠে ছুটল সে এবং যেখানে জন্তু দুটো ছট্‌ফট্ করছিল যেখানে এসে দাঁড়াল। শালা বিড়ালটার ঘাড়ে কাঁড়টা ঢুকে খরগোশটার মাথায় ফেঁড়ে একেবারে মাটিতে গেঁথে গেছে। একসঙ্গে গাঁথা জন্তু দুটো একসঙ্গে মরণযন্ত্রণায় গর্জন করছে, কাতরাচ্ছে। শিকারী সাঁওতাল সিধুর এতটুকু কষ্ট হল না দেখে। মর মর, দুটোই একসঙ্গে মর!

শালা দিকু আর জেটে ওই সাদা সায়েব একসঙ্গে।

মর। ওদের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে সিধুর মুখের চোয়ালটা কঠোর হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একটা চ্যাঁ শব্দ শুনে ঘুরে তাকালে। আ!

একটা খরগোশের বাচ্চা ভয়ে লাফ দিয়েছিল কিন্তু ভয়ের মধ্যে দিক ঠিক করতে পারে নি—লাফ দিয়ে পড়েছে ঝরনার জলে। এখানে ঝরনাটা একটা চওড়া গর্তে ডোবার মত ভরে রয়েছে। জলটা অনেকটা স্থির। বাচ্চাটা খানিকটা সাঁতরে আর পারছে না। ডুবছে। ডুবতে ডুবতে চেঁচিয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য! সিধুর শক্ত চোয়ালটা মুহূর্তে শিথিল হয়ে গেল। মনে কি হল। কি হল তা ভাববারও অবকাশও ছিল না তার। এবং সে-বিচার করবার মত বুদ্ধিমান মানুষও সে নয়। সে লাফ দিয়ে পড়ল ঝরনার জলে। প্রায় এক-কোমর জল সেখানে। ডুবন্ত খরগোশের বাচ্চাকে সে তুলে নিয়ে একবার তার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে উপরে উঠে এল। তখন এ জানোয়ার দুটো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। খরগোশটা শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে মধ্যে মধ্যে; রোগুটা অর্থাৎ বনবেড়ালটা তখনও গোঙাচ্ছে—এক একবার একটু বেশী গর্জে গুটিয়ে ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাচ্ছে।

হাসলে সিধু—লে শালা, ছাড়া। লে লে। অঁঃ!

ঠিক সেই মুহূর্তে হাঁক এল—সিধু হে! অ সিধু!

সিধু সাড়া দিলে—হাঁ হে! হিজু মে। এইখেনে, হ! মজা দেখ হে!

ওদের দলের লোকেরাই শুধু আসে নি, তার সঙ্গে নিমু হাঁসদা এসেছিল এবং আরও ক'জন—তারাও বারহেটের ব্যবসাদারদের বাঁধা বা কেনা চাকর। তারা এদের এগিয়ে দিতে এসেছে আর সিধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এক ঠিলি হাঁড়িয়া এনেছে, বারহেটের বাইরে খানিকটা দূরে সাঁওতালপাড়া আছে, সেখানে গিয়ে নিয়ে এসেছে। ঝিকরুরা এর মধ্যে খানিকটা খেয়েছেও—মুখে গন্ধ উঠছে।

হাত বাড়িয়ে হাতে হাত ধরে কপালে ঠেকিয়ে সম্ভাষণ সেরে নিমু বললে—তু বীর বটিস হে। আমরা শুনি সব লোকে বলে চুনার মুর্মুর ছুটু ছেলে সিধু খুব তেজী বেটে আর বীর বেটে। হাঁ, তা দেখলম আজ। ওই ভকতের সঙ্গে এমুন করে কথা কেউ বলতে লারে হে।

লোকটা বাঘ বেটে। মহেশ দারোগার সাতে খুব সাত। আসে. বোতলের মদ খায়। শালার অ্যাই প্যাট! একটা পাঁঠা খেয়ে লেয়। রাতে তিন চারটে মেয়েলোক লইলে হয় না শালার। আর শালা সায়েবদিগে সুদ্ধ ভয় করে না হে। কিছু মানে না—কোর্ট কাছারী হাকিম কিছু না। সি সব উর হাতধরা বেটে। তা তার সাতে তু—হাঁ খুব জোর জোর বুললি হে। আর ঠিক বুললি - উরা এমুনি চোরাই বেটে। কি যে করে হে ওই বাপের বাঁশের চোঙাতে—শালা এক কেঁড়ে ঘি গিলে ফেলায়!

সিধু বলল—তা তু তো আমাকে উদের হয়ে বাত বুললি। ই কথাগুলি তো বুললি না তখুন।

—আর বাবা, তা হলে আমার জান রাখতো নাই ভকত! বাবারে! ওই পশ্চিমা দারোয়ানগুলো আমাকে ঘরে ভরে পিটত। হয়তো মেরেই ফেলাত হে। তা ছাড়া বিপদ তুরও হত ভাই। দেখলি তো শালারা যমদূতের মতুন এসে দাঁড়িয়েছিল। কি করতিস তু বোল!

ওদের মধ্যে একজন ছিল লক্ষ্মণ—সে ছোকরা মানুষ, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—উরা রাক্ষস বেটে সিধু ভাই, উরা রাক্ষস বেটে। রাক্ষসে হাড় মাস খায়, লহু চাটে—ই রাক্ষসরা সারা জীবন খেয়ে দেয় হে। তবু ছাড়ে না? এই দেখ কেনে ভাই, আমার বাবা দেনা লিয়েছিল এই এক কায়েত দিকুর কাছে 'গেল' টাকা (দশ টাকা) তা বাবা মরে গেইছে—আমি খাটছি। চাষে খাটি—ধান সব উই লেয়। তবু শেষ হয় নাই। হবেক না।

ওদিকে একজন বনবিড়ালটাকে পুড়িয়ে ঝলসে এনে তার চামড়া ছাড়িয়ে আবার একবার সেঁকে ঝলসে নিয়ে এল—খানিকটা নুন খানিকটা লঙ্কা সের করে খাজারি অর্থাৎ মুড়ির সঙ্গে হাঁড়িয়া খাওয়া শুরু হল।

সিধু বললে—ওই দেখ কেনে লিটিপাড়াতে ভীম মাঝি জবর লোক। জমিন আছে। কাঁড়া আছে চারটে। তেজী লোক। আর লোক ভাল।

ঝিকরু বললে—তাকে আমরা জানি হে।

—জানবি বইকি—সে লিটিপাড়ার সর্দার।

—তা লয় হে। হাসলে ঝিকরু। বললে—একবার আমাদের সাতে লেগেছিল হে!

—কি বেপার? ভীম মাঝি তো ধার্মিক লোক—তবে খানিক তেজী বটে সিধুর মতুন।

—হঁ! ওই সিধুর সাতেই লেগেছিল। সে চেপে ধরেছিল সিধুর হাত। এক হেঁচকাতে সিধু ছাড়ায়ে লিলেক।

—বেটে বেটে!

—ই তো কি! সিধু কম লয় হে!

—ই তা মানছি। ভকতের সাতে বাতে বুঝলম। আর এই কাঁড়ে ইখানে বসে হুইখানে শালা রোগা আর খরগোশটাকে থরতির সঙ্গে গেঁথে ফেলালছে—সি কম কথা লয়। কিন্তুক এমন হল কেনে? ভীম মাঝি সাতে—

সিধু চুপ করে বসেছিল—গামছায় খরগোশের বাচ্চাটাকে বেঁধে রেখেছে কোলের উপর—সেটা নড়ছে—সেইটার গায়ে সে কাপড়ের উপর থেকে হাত বুলোচ্ছে। আর মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ বুট মুড়ি খাওয়াবার চেষ্টা করছে। দুই আঙুলে ধরে কাপড়ের বাঁধনের ফাঁক দিয়ে তার মুখের কাছে ধরছে। বাচ্চাটা খাচ্ছে না। তার নখ দিয়ে আঁচড়াতে চেষ্টা করছে।

ঝিকরু বললে—সি এক কাণ্ড বেটে হে! ভীম মাঝির গাঁয়ের লাল মাঝি আছে—তার সাতে সিধুর বুনের বিয়ে হল।

—হঁ! লাল তো এখন বড়লোক বেটে হে! সি তো রাস্তাবন্দিতে কাম করছেক। সিখানে সি সদ্দার হইছেক! মেলা টাকা পেছে!

সিধু বললে—হঁ। আমরাও শুনলম।

ঝিকরু বললে—সেই বিয়ার পরে সিধু কানু দুই ভাই গ্যেল কুটুমবাড়ি;—বলতে বলতে থেমে গিয়ে সিধুকে বললে—কি হে সিধু কথাটা বুলি? না শরম লাগবে, গোস্যা হবে? খিলখিল করে হেসে উঠল প্রথমে ঝিকরু তারপর বাগনাডির আর সকলে।

সিধু বললে—সিটো আর কি কথা হে। মরদ বটি—তখুন আবার ছোকরা বয়েস—তখুন ছুকরি দেখে মনটো খলোবলো করেছিল। তা ছাড়া মেয়ে দুটাও খুব তিড়িকপিড়িক ছুকরি। আমরা দু ভাই, তারাও জাঁও (যমজ) বুন। দু ভাইয়ের দুজনাকে মনে লেগে গ্যেল।

—হঁ! বুঝলে কিনা! লিটাপাড়া গিয়েছিল দু ভাই কানু আর সিধু—ইরাও দু ভাই জাঁও ভাইয়ের মতুন। হামদুটী। গিয়া পিরীতে পড়ে গ্যেল। তিড়িকপিড়িক মেয়া দুটো—

—সি দুটা কে বটেক হে? আমি লিটাপাড়া জানি। সেই টুকনী আর রুকনী?

—হঁ হঁ হঁ। সেই বেটে সেই বেটে। তা পিরীত হল তো খেপল দু ভাই। ওদিকে বিয়া করব।' ইদিকে বাবা সদ্দার মাঝি দুই ভেয়ের বিয়ের ঠিক করে 'হুড়কবাঁদি' করেছে শিমুলতলীর মানী ঘরে—ধনরায় হেমব্রমের দুই বিটী টুশকি আর ফুলের সঙ্গে। তা সি ইরা মানবে না। বাপের সঙ্গে ল্যাই করে। হাপে হাপেতে চলে যায় লিটাপাড়া। সিখানে গিয়ে হৈ হৈ করে মাতন লাগায়। শালবনে গিয়ে ইরা বাজায় বাঁশি আর টুকনী রুকনী সিরিং (গান) করে নাচে হে! এই একদিন ভীম মাঝি তকে তকে গিয়া ধরলে—আর ধরবি তো ধর সিধুর হাত। বুললে—লিটাপাড়ায় মজা করতে আইছ হে! এস—আগে আমার সাতে মজাটো হোক তার পরেতে উদের সাতে লাচগান লাগাবে। এস। মুর্মুর বেটা দুটোকে আজ দড়ি দিয়ে বেঁধে কাঁড়ার গোঁজে বাঁধব। তার পরেতে কাঁধে হাল লাগায়ে জমিন চষব। এক বিঘা জমিন যদি চষে দিতে পার তবে তখুন কথা হবে। কানু ভয় খেয়েছিল, সিধু কিন্তুক এক হেঁচকাতে হাত ছাড়ায়ে লিয়ে বুলেছিল—তার পহেলে এস মাঝি দেখি কে কারকে জোয়ালে গতাবেক। কার জোর বেশী। তা ভীম মাঝির তখুন তাক্ লেগে গেইছে। ভীম মাঝি লাঙলের মুঠা ধরলে বড় বড় কাঁড়া হাল টানতে কুঁজ হয়ে যায়, তার সেই মুঠা এই ছোকড়া এক হেঁচকাতে ছাড়ায়ে লিলে! ডান হাতের মুঠা!

নিমু বললে—হঁ হঁ!

ঝিকরু বললে—তা ভীম মাঝি তখুন বুললে—হঁ হে, তু মরদের বেটা মরদ বটিস। তা চল্ দেখব তুর মদ্দানী। আমার ঘরে একটা ভালুক আছে, সিটার সঙ্গে আমি লড়াই করতাম হে তুমার বয়সে। এখুন আর লড়ি না। তু লড়তে পারবি? সেটার সঙ্গে?

সিধু বলেছিল—হঁ। চল্।

ভীম বলেছিল—তা পারলে তুকে আমার হড়কবাঁদি ভেঙে বিটী দুটোকে দিব।

ঝিকরু বললে—ওই স্থাখ ক্যানে সিধুর পিঠে ভালুকা শালার নখের দাগ। অ্যা—ই ফালি করে চিরে দিয়েছিল। শালা ভালুকা ক্ষেপে গেইছিল। না ক্ষেপলে কি হবে, সিধু তার বুকে বসে দুই পায়ে শালার ছামুকার পা দুটো চেপে দু হাতে টিপে ধরেছিল তার গলা। ভীম মাঝি বলেছিল—সাবাস! তু উঠ। খুব হইছে। সিধু বলেছিল—উঠে ছেড়ে দিব তো শালা ফের ধরবে আমাকে।

ভীম বলেছিল—না—আমি আটকাব—তু ছাড়।

সিধু বলেছিল—তুকে ধরবে। ক্ষেপে গেইছে শালা।

ভীম বলেছিল—না রে না। উ আমার পুষা বটে হে! আমাকে মানবেক। দে, তু ছেড়ে দে।

—দেখিস।

—হঁ, দেখেছি তু ছাড়।

সিধু তাকে ছেড়ে লাফায়ে উঠেছে আর শালা গাঁ গাঁ করে ছামনের পা দুটো হাতের মতুন বাড়ায়ে খাড়া হয়ে উঠেছে। তো ভীম সদ্দার ছামনে দাঁড়ায়ে তাকে বললে—হাপে হাপে হাপে! বেটা হাপে! তা শুনবে কেনে? সদ্দারকে জাপুটে ধরে কাঁধে দিলে কামড় আর পিঠে বসালে নখ। ধপাস করে জড়াজড়ি করে পড়ল মাটিতে। সদ্দার পড়ল হ্যাঁট তলাতে। শালা সিদিন মেরেই ফেলাতো হে। তা সদ্দারের কুকুরটো এসে শালার ঠ্যাঙ কামড়িয়ে ধরলেক। আর ইদিকে সিধু একটো টাঙি লিয়ে এক কোপ লাগালে শালার পিঠে। শালা সদ্দারকে ছেড়ে ফের ফিরল সিধুর ওপর। তখন সিধুর হাতে টাঙি। সে আলোপাথাড়ি দিলে শালাকে কোপায়ে। শালা পড়ে গেল। ভীম সদ্দারের দুখ হল কিন্তুক সাবাস দিলে সিধুকে। আর বুললে—হাঁ, তু মরদ বটে, লড়েছিস, খুব লড়েছিস। উটাকে মারলি। তা—তা ভালই করেছিস। শালা এমুন হইছে? তা জানতম নাই। তু জিতেছিস; তা তুরা বিয়ে কর বিটী দুটোকে।

নিমু মাঝি বললে—সি বিটী দুটোর কার সঙ্গে বিয়া হইছে? ইয়ার সঙ্গে আর ইয়ার ভাইয়ের সঙ্গে? টুকনী আর রুকনী? কি বুলছিস হে? সি বিটি দুটো—তাদের বাবা বিশু তো—

সিধু বললে—হঁ হঁ। বিয়ার সব ঠিক হছে। আমার বাবা তখন ক্ষেপেছে। বলে আমি কথা দিলম। আমি বলি—তু কথা দিলি আর আমি মন দিলম। বিয়া আমি করব হে। আমি যাকে মন দিলম তাকেই আমি বিয়া করব। তোমার কথা থাকল কি না থাকল আমি জানি না। এই সব টানাটানি হচ্ছে। তখুন বিশুর কুটুম আইছিল বেনাগোড়ে থেকে।

তারা খুব টাকাওলা লোক। পাদরীদের সঙ্গে ভাব। কেরেস্তান হইছে। পোশাকের বাহার হইছে। পাদরীদেগে নিয়ে এল। পাদরীকে কে কি বলবেক! পুড়খানা জেটেরা খুনের জাত হে! বন্দুক দিয়ে গুলায়ে দেয়। পাদরী বলে সব কেরেস্তান হও। তা ভীম সর্দার সাহস করে মানা করলেক। পাল্টিন সাহেব সাঁওতালদের সাহেব—তার কাছে খবর পাঠালেক! কিছু হল নাই। শ্যাষ সাহেব পঁদর দিন পরেতে ফিরে গ্যেল বেনাগোড়ে—তাদের সাথে বিশু শালাও চলে গ্যেল। রুকনী টুকনীও গ্যেল। শুনছি নাকি বিশুর কুটুমের সেই ছেল্যাদের সঙ্গে সাদী হইছে।

—বেঁচে গেইছে হে, বেঁচে গেইছে সিধু মুর্মু! বিটী দুটো এখুন তো রাস্তাবন্দিতে খাটে হে। তাদের সোঁগুষ্টি গেইছে। উ মেয়্যারা ভাল লয়। খারাপ বলে লোকে।

সিধু চুপ করে রইল। মনে পড়ল তার রুকনীকে। রুকনীর সঙ্গেই তার প্রেম হয়েছিল আর টুকনীর সঙ্গে দাদা কানুহর।

—লাও হে হাঁড়িয়া জম করো। উয়াদের লেগে ভেবো নাই। তিড়িকটিড়িক মেয়্যা দুটা যে কত ছোকবার সাথে তিড়িকটিড়িক করিছে তার টিকানা নাই হে।

সিধু এবার হাঁড়িয়ার পাত্রটা থেকে খানিকটা খেয়ে একমুঠো মুড়ি বুটকলাই সিদ্ধ নুন দিয়ে খেতে খেতে কাঁচা লঙ্কা দাঁতে কেটে খেতে লাগল।

—মাংস খাও হে। এই খোরগোশের মাংস লাও। হাঁ, তুমি জবর শিকারী বট হে।

সিধু বললে—লিব মাংস, এখুন ভীম মাঝির কথা বুল। ভীম মাঝির কথা বুলছিলে, মাঝখানে ঝিকরুটা সব ভুলায়ে দিয়ে পুরানো পিরীতের কথা তুললেক। উরি লেগেই তো মেজাজ আবার চড়ে যায় হে! কুন সময়ে কুন তান দেখ।

লক্ষ্মণ বললে—হঁ। ঠিক বুলেছ। অমনি হঁয়ে যায়, কি করব কও? দুখ দুখ আর দুখ—দুখ তো পাহাড় হঁয়ে গেইছে হে। বুকে শালা চেপেই রইছে। তাই বুঝেছ ভাই। দুখ-দুখ আর কত করব হে। অমন একটা কাঁড়াকে এ—ই এইটুকুন থেকে পাললম, বড় হ'ল, জোঁয়ালে গতালম—বাস্, শালা কি হল কে জানে—সনঝেবেলাতে গোয়ালে ভরলম, সকালে দেখি শালা ঠ্যাং চারটেকে তুলে ঠিরকাটি করে দাঁত ছিকুড়ে হাই পড়ে আছে! যাঃ শালা, মরেই গেইছে। কাঁদলম—এখুনও কাঁদি হে। তা কাঁদব কত বুল?

সিধু বললে—তু থাম হে। তু একটো উজবুক।

—দেখ্ হে দেখ।

সিধু ঝিকরুকে অবজ্ঞা করে বললে—ভীম মাঝির কথা বুল ভাই নিমু। কি হল মাঝির? এত বড়ো একটা মাঝি হে। কি হইছে তার?

নিমু বললে—ভীম মাঝিকে এমুন হাঙ্গামায় ফেলালছে ওই দিকু কেনারাম ভকত। আমাদের ভকত বুলছিল কেনারাম তাকে জেহেলে দিবে।

—কেনে! কথাটা বললে ঝিকরু। ভীম মাঝির জেল হয়েছে এ কথাটা যে অসম্ভব।

নিমু বললে—ধান ধার লিয়েছিল। বারো শলি ধান। গ্যেলবার আকাড়া গেইছে! তা বারো শলি ধান লিয়েছিল, তার লেগে ইবারে বাঁধনার পরে হিসেব করে এল, কেনারাম

বুললে—সুদে আসলে একশো শলি হইছে। তা ধান ভাল হইছিল। জমিনও অনেকগুলান আছে। তা দিয়ে এল একশো শলি। তা পরেতেও ভীম মাঝি বাঁধলে দু দুটো ধানের বাথার। খবর শুনলে ভকত। শুনে দু মাস পরে এসে বুললে—ধান দে মাঝি। একশো শলি।

ভীম বললে—সি কি ভকত, সিদিন যি দিলম তোকে একশো শলি।

ভকত বললে—তা দিলি, সি তো তু তিন বছর আগে যে ধান লিয়েছিলি, তার দরুন বাকী ছিল আধ শলি।

—সি তো তুকে বলেছিলম আর দিতে পারব নাই গ। সিবার আট শলিতে তুকে একশো শলি দিলম। আধ শলি বলেছিলম দুব নাই।

ভকত বললে—তু বললি আমি বলি নাই। সিটো খাতায় লিখা ছিল, আমার মনে ছিল নাই। ইবার ধান নিয়ে গিয়ে খাতা লিখতে গিয়ে দেখি সেই আধ শলি ক বছরে একশো শলি হয়ে হাঁ করে রয়েছে। তুর ইবারকার একশো শলি যেমন লিখলম অমনি পুরনো হিসেব গিলে দিলে। কি করব? খাতার হিসেব সি যদি খেয়ে দেয় তো আমি কি করব। এখন সেটোই শোধ গেল, ইবারের একশো শলি আবার ই ক'মাসে বাড়ল, বেড়ে দেড়শো শলি ছাড়ায়ে গেইছে হে। তু তো ধরম মানিস। লক্ষীর খাতা—সে খাতা খেয়ে দিলে আমি কি করব। তাকে খেতে দিতে কোথা থেকে ধান আনব বল।

ভীম মাঝি পেথম চুপ করে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না। তারপরে বুললে—আবার একশো শলি দিব তো খাব কি গো ভকত? ভকত বললে—আবার লিবি। দিব। আর না-হয় তো তুর জমিন চার বিঘে লিখে দে। কি গো সব মাঝিরা বল কেনে, আমি অধরমের বাত বললম? সবাই চুপ করলে। কি বুলবে? ভকত তো ধরমের বাতই বুলেছে। লক্ষীর খাতা খেতে চাইছে তা সে কোথা থেকে আনবে? দিতে হবে। সবাই চুপ। কিন্তুক ভীম বুললে—মাথায় তার খুন চাপল না ভুত চাপল—কে জানে, বুললে—না—জমিন দিব না।

ভকত বললে—তবে দে ধান দে।

হাঁকিড়ে উঠল ভীম—না না না। ধানও দিব না। তুর লক্ষীর খাতা খেতে চাইছে—তু দেগা। আমি দিব না।

ভকত তখন তাতলে—বললে—দিবি নাই?

—না।

—দিবি নাই?

—না না না। দিব না দিব না দিব না।

তখন ভকত, সি কেনারাম ভকত, হুকুম দিলে চাপরাসীকে—লে তবে; ভাঙ মরাই। মাপ ধান।

ভীমের মাথায় খুন চাপল, সে আপন কাঁড় নিয়ে দাঁড়ালেক—যে আদমী মরাইয়ে হাত দিবেক তার জান লিব আমি। আর মাঝিদের বললে—নিয়ে আয় কাঁড় ধনুক। নিয়ে আয়।

তখুন কেনারাম বললে—থাক। তা হলে তোর কাঁড়া গরু বাছুর কোরক' করছি আমি —খোল্ কাঁড়া গরু খোল্। একটা কিছু দিতে হবেক। হয় ধান নয় জমিন, নয় কাঁড়া গরু।

—দিব না দিব না দিব না, বলে হাঁক মেরে গাঙাড়ে উঠল ভীম। কেনারাম ভকত খানিক ভাবলে, তাপরেত্তে বললে—এই গাঁয়ের লোক সাক্ষী রইল যে আমার কোরক ভীম মাঝি জবরদস্তি করে ফিরায়ে দিলে। আমি লালিশ করব। আদালতের কোরক আনব।

—বুঝলি কিনা বারহেটে মহিন্দর ভকতের উখানে এল কেনারাম। তাপরেতে দারোগাকে খবর গেলে। প্যাটমোটা মহেশ দারোগা এল—খানাপিনা করলেক। সিদিন তিনটে দিকু মেয়ে দিলে গা হাত পা টিপতে। তাপরেতে শলা করে জঙ্গিপুরের আদালতের সেই তকমাপরা প্যায়দা এল—সব দলবল নিয়ে কেনারাম গেলছিল আদালতের কোরক লাগাতে। তা ভীম তখুন পাল্টিন সাহেব হাকিমের কাছে দরখাস পাঠালছে। জবাব আসে নাই। তবু সি গাঁয়ের লোক জুটায়ে কাঁড় ধনুক নিয়ে রুখে দিলেক। দিলে না কোরক করতে। ফেসাদ লাগল। ইবার অনেক সিপাই নিয়ে এসে ভীমকে ধরে লিয়ে গেলছে। জেহেলে ভরে রাখছে। লোকে বুলছে ফাটক হবে ভীম মাঝির।

ঝিকরু বললে—কই আমরা তো শুনলম নাই।

—কি করে শুনবি? তাকে তো ইপথে আনে নাই—ওই হেরণপুরের হাট হঁয়ে যে পথটো গেইছে উদিকে জঙ্গিপুর রাজমহল গঙ্গা পেঁরায়ে সেই পথে নিয়ে গেলছে।

—বড় ভাল লোক ছিল হে ভীম। জেহেলে দিলেক তাকে।

লক্ষ্মণ বললে—সাঁওতালরা বাঁচবেক নাই হে। মরবেক। বিলকুল সব মেরেই ফেলাবে হে। এক রক্ষে কিরিস্তান হলে। পাদরী বাবারা খানিক আদেক দেখে।

এ কথার উত্তর কেউ খুঁজে পেলে না। চুপ করে বসে রইল। সামনে খাবার পড়ে রইল, হাঁড়িয়া পড়ে রইল—সে খেতেও কারুর ইচ্ছে হল না। সিধুর কোলের মধ্যে গামছায় বাঁধা খরগোশের বাচ্চাটা চিৎকার করে উঠল—কখন যে সিধু তার মাথার উপর রাখা হাতটা দিয়ে সেটাকে মুঠো শক্ত করে চেপে ধরেছে তা সে নিজেও বুঝতে পারে নি! হঠাৎ চিৎকারেও সিধু বুঝতে পারলে না কি হয়েছে—কেন সেটা চিৎকার করছে! তার রাগ বেড়ে গেল। সে অকৃতজ্ঞ খরগোশের বাচ্চাটাকে ধরে মুঠোটা আরও কঠিনতর করে টিপে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষে 'মর শালা' বলে আছড়ে ফেলে দিলে সামনের পাথরটার উপর। তারপর আবার বললে—শালা! বাঁচালম জল থেকে তুলে। তবু শালা চেঁচাইছে। শালা—

খরগোশের বাচ্চা বাঁধা গামছাটা হঠাৎ রাঙা হয়ে রক্তে ভিজে গেল। গামছাটা একটু নড়েই বাস্ স্থির হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ বললে—মরে গেইছে।

সিধু বললে—হুঁ। তারপর টেনে নিলে হাঁড়িয়ার ঠিলিটা।

ঠিলিটা তুলে কাত করে ধরে খানিকটা হাঁড়িয়া খেয়ে বললে—চল হে। উঠ সব!—বলে সর্বাগ্রে সে নিজেই উঠে দাঁড়াল। এবং বিদায় নমস্কারের জন্যে বাঁ হাত ডান হাতের কনুইয়ে ঠেকিয়ে বাড়িয়ে দিলে।

তার হাত ধরে নিমু বললে—তু আর বারহেটে আসিস না। খানিক 'সতর' (সতর্ক) হয়ে থাকিস। ভকত বড়া বদমেজাজী বটে। শালা বাঘের মতুন। বুঝলি—কখন যে ঝাঁপ দিবেক। তুকে উ চিনে রাখলে।

ঝিকরুর কি হল কে জানে, সে হঠাৎ আস্ফালন করে বলে উঠলো—শালা আমরাও পাদরীর কাছে গিয়া কিরিস্তান—

কথা সে শেষ করতে পারলে না। সিধু বাঘের মত হাঁক মেরে লাফ দিয়ে এসে পড়ল তার কাছে, তাকে মারবে সে।

কিন্তু বাধা দিলে নিমু মাঝি। সে দুহাত বাড়িয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললে—হেই ভাই! হেই সিধু মুর্মু!

সিধু থমকে গেল। হয়তো একটু লজ্জাও হল। মনে পড়ল আজই একটু আগে তাকে চড় মেরেছে। কিন্তু নিষ্ঠুর কথা না বলে পারল না; বললে—কিরিস্তান হবি? ফিরেবারে বুললে তুর জিবটো টেনে আমি ছিঁড়ে ফেলাব। আমার টুংরা কুকরনটাকে খেতে দিব। বলে দিলম। তারপর সে মুখে বললে—জোহর জোহর সবাইকে জোহর হে তুদের? অর্থাৎ প্রণাম প্রণাম সকলকে প্রণাম—বলে চলতে শুরু করলে। হঠাৎ মনে পড়ল গামছা-খানার কথা, নুন বাঁধা চাদরটারও কথা, ফিরে এসে সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে কাঁধে ফেলে চলতে লাগল।

কিছুদূর এসে দাঁড়াল সঙ্গীদের জন্যে। একটা দুরন্ত ক্রোধ তার মনের মধ্যে যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। বারহেটের বাজারে যা হয়েছিল তা যেন আকারে উত্তাপে অনেক বড় অনেক প্রখর হয়ে উঠেছে।

অরণ্যবাসী আদিম মানুষের মন—তার উপর বাল্যকাল হতে দুরন্ত দুর্দান্ত সিধু। প্রতিহিংসা ক্রোধ সেখানে কালো কেউটে সাপের মত নিষ্ফল আক্রোশে ছোবল মারছে মাটির উপর পাথরের উপর।

তার থেকে ঝরছে সেই কামনার বিষ। সেই কামনা—'মরে যায় যদি সব দিকুরা সব পুড়খানা জেটেরা মরে যায়। যদি সে পায় মরংবোঙ্গার বর, তাকে যদি বোঙ্গা সেই টাঙ্গি দেয়—যাতে সবাইকে সে কেটে ফেলতে পারে।'

চকিতে মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগে সেই বনবিড়াল আর খরগোশটাকে এক কাঁড়ে মারার কথা। সে মনে করেছিল যদি এক কাঁড়ে মারতে পারে দুটোকে তবে সে পাবে সেই টাঙ্গি।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল গামছায় বাঁধা মরা খরগোশের বাচ্চাটার কথা। মনটা কেমন হয়ে গেল। সেই গামছাটাকে টেনে নিয়ে গিঁট খুলে মরা বাচ্চাটাকে বের করে ফেলে দিলে ছুঁড়ে।

এঃ—পাথরে এমন আছাড় মেরেছে যে বাচ্চাটার মাথা চুর হয়ে গিয়েছে! এঃ।

সারা পথটা সে কারুর সঙ্গে কথা বলে নি। সঙ্গীরাও তাকে ডাকে নি, ডাকতে সাহস করে নি। অল্প পিছনে থেকেই তারা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে আসছিল।

সবই ওই ভীম মাঝির কথা, ভকতের কথা। আজকের কথা।

সে শুধুই ভাবছিল ওই কথা। অসম্ভব কথা সব।

এসে সে গ্রামের বাইরে এই জহর সর্দার দাঁড়িয়েছিল। ওই শালগাছটার দিকে তাকিয়েই সে বার বার মনে মনে বলেছিল—মরংবোঙ্গা হে! তুমি মেরে দাও—ওই শালা দিকুদিগে মেরে দাও। লইলে তুমার টাঙ্গি দাও। আমি সব কেটে দিব। মরংবোঙ্গা হে!

এতক্ষণে সঙ্গীরাও পাশে দাঁড়িয়ে বোঙ্গাকে নম করে নিলে।

সিধু ফিরে তাকালে ঝিকরুর দিকে। বললে—এমুন কথা আর কখনও বুলবি না। কখুনও না। ইথেই তো এই হাল হচ্ছে সাঁওতালদের।

সকলেই বললে—হঁ তা বটেক। ঠিক বুলেছে সিধু।

ঝিকরু কিন্তু মানতে পারল না। সে প্রথমবার চড় খেয়েও সহ্য করে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বারের এই অপমান তাকে অত্যন্ত আঘাত করেছে। বড় বেজেছে তাকে। তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল—তারপর সামলে নিয়ে সে বললে—তা হলে বাঁচি কিসে বল হে? ভীম মাঝির মতুন লোকটা—। আর সে কথা খুঁজে পেলে না।

সিধু বললে—বাঁচবি। বাঁচবি। বুঙ্গা বাঁচাবেক। আমি ইশেরা পেলম।

চমকে উঠল সকলে।—ইশেরা পেলি?

সিধু বললে, তাহলে বুলি শুন, বোস।

সেইখানেই বসে সে তাদের বনবিড়াল আর খরগোশটাকে এক তীরে বেঁধার মধ্যে যে ইশারা পেয়েছে তাই বিস্তার করে বললে।

ঠিক এই সময় আকাশে প্রথম মেঘ চমকে উঠল।

সকলে আকাশের দিকে তাকালে। আকাশ যেন কালচে সীসের আস্তরণে ঢেকে গেছে। গাছপালা সব স্থির। পাতা নড়ে না। বড় শালগাছের মাথাটার দিকে তাকালে সিধু। সবুজ পাতাগুলোর গায়ে যেন ভুসো কালির আস্তরণ পড়ছে মেঘের ছায়ায়।

সিধু বললে—বাবারে, কারীদাং বিমীল বাকাপ পানা! (ভীষণ কালো মেঘ উঠল হে।)

—বিজলী মাল্‌কাও কানা! (বিদ্যুৎ চিকুরছে হে!)

—দা গায়! (জল হবে।)

—মারংহারেদা গায়। (ঝড় হবেক হে।)

ঝিকরু বললে—আমার ঘরের চালটো আবার ফুটো আছেক হে।

—থাকবেক নাই! তু তো কেবল লেচে বেড়াবি হে।

—কি করব হে? দুখ আর কত করব বল্! হি হি করে হেসে উঠল। সাধে বলি হে—

বলেই জিভ কাটলে। বলতে যাচ্ছিল সে—সাধে কি বলি হে কিরিস্তান হয়ে যাই—পাদরী বাবাদের কাছে সুখে থাকি। কত-সুখ সিখানে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগের কথা মনে পড়ে চমকে উঠেছে। ভাগ্যিস সিধু শালগাছের মাথার দিকে তাকিয়ে আছে! কি ভাবছে! কথাটা শোনে নি। কিংবা গ্রাহ্য করে নি।

আবার একবার বিদ্যুৎ চমকাল। সিধু দেখলে কালো মেঘের গায়ে জ্বলন্ত রূপালী আঁকাবাঁকা হিজিবিজি দাগে কত কিছু যেন লেখা হয়ে গেল।

সে বললে—বুঝলি হে?

—কি হে?

—আরও ইশেরা পাব হে। মনে লিছে কি জানিস?

—কি?

—ওই ডাক ডাকতে ডাকতে আর আগুন ঘুরাতে ঘুরাতে মরংবোঙ্গা ইবার নামবে মাটিতে। হঁ। মন লিছে আমার।

আকাশের দিকে তাকিয়েই বলছিল সে।

মেঘে তখন কড়কড়ে বৈশাখী ডাক শুরু হয়েছে। ঝিকরু তার ঠোঁটটা উলটে দিলে।

সনসন শব্দের একটা ইশারা আসছে বহুদূর থেকে। ঝড়! ঝড় আসছে!

—উঠ হে। চল্। চল, ঘরকে চল।

সিধু উঠল। কাঁধে চাদরে বাঁধা নুন আছে সকলের, বৃষ্টি পড়লে ভিজে যাবে। ভিজলে বুলুং পানি হয়ে গেল।

—চল্।

গ্রামের ধারে এসে তারা পৌঁছুল যখন তখন ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয়েছে। খুব প্রবল তখনও হয় নি। মেয়েরা ছুটোছুটি করছে। জিনিসপত্র টেনে ঘরে আনছে। চ্যাটাই, খাটিয়া, মেলে দেওয়া কাপড়। শুকনো কাঠ, শুকনো পাতা। কতক মেয়েরা ছেলেদের নিয়ে গরু বাছুর ছাগল ঘরে ঢোকাচ্ছে; পুরুষেরা দাঁড়িয়ে দেখছে পশ্চিমের কালো মেঘের কোলে পুঞ্জীভূত লাল ধুলো।

—হ হ। মারংহায়দা, মারংহায়দা! ঝড়! ঝড়!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় প্রবলবেগে গোটা শালবনটাকে যেন শুইয়ে দিলে। তার সঙ্গে উড়ে আসা ধুলোয় সব ধূলাকীর্ণ হয়ে সমস্ত আকাশ পৃথিবী এক করে দিলে।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। এবার জোরে। কড় কড় কড় কড়!

জিনিসপত্র সামলে ফুল বসেছিল দাওয়াতে। পাশে বসেছিল বড় ছেলেটা—কোলে ছিল তার ছোটটা। সে বলছিল—আয় বাবারে।

সিধু এসে দাওয়ায় বসেছিল গম্ভীরভাবে, স্থির হয়ে মেঘের দিকে চেয়ে। মেঘ ডাকতেই ফুল উঠল—বড় ছেলেটাকে বললে—উঠ্ উঠ্। ঘরকে চল্। স্বামীকে বললে—উঠ্ হে। ঘরকে চল—

—তু যা হে, আমি দেখি—

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাজটা পড়েছিল। সমস্ত বিশ্বসংসার যেন সাদা আলোর ঝলকানির মধ্যে হারিয়ে গেল।

এর কিছুক্ষণ পর পর্যন্তও সিধু যেন স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে বসে ছিল। তখন থেকেই তার

মনে হয়েছিল এটা সেই ইশারা যে ইশারার কথা তার মনে হয়েছিল। বোজার শাল গাছে পড়েছে পড়ুক। বোজা এবার গাছ থেকে তা হলে মাটিতে নামল। সে যা বলেছিল ঝিকরুদের তাই ফলল। বুকের ভিতরটা তার দগদগ করছে। সে তখন থেকেই করছে।

সেই ভকতের অপমান। তারপর ভীম মাঝির কথা। তার সঙ্গে রুকনীর কথা টুকনীর কথা। তার ভগিনপোত আর বোন মানকীর কথা।

কিরিস্তান হয়ে গিয়েছে রুকনী টুকনী। নিমু বললে—খারাপ মেয়্যা। মানকী আর তার ভগিনপোতের কথা বললে না বটে তবে মনে হল তারাও কিরিস্তান হয়ে গিয়েছে।

সেই কথা আজ অর্থাৎ ঝড়ের পরের দিন চুড়া মাঝির মা তুলেছিল। মনটা তার খারাপ হয়ে আছে। তার সঙ্গে গ্রাম জুড়ে এই মন্দ কথা—বোজার গাছের মাথায় বাজ পড়ল। এবার সর্বনাশ হবে। এ কথায় তার মন মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সে যা ভাবছে বুঝছে সে কথা কেউ বুঝছে না। কারুর সঙ্গে মিলছে না। মন তার আরও খিঁচড়ে যাচ্ছে।

একমাত্র কানুই দাদা তার কথা বিশ্বাস করে। তাকে সে কথাগুলো বলেছে। সে বলেছে —হুঁ। তু যা বুলছিস্ আমারও তাই লাগছেক হে। তবে এখন চুপ করে থাক। ভাল করে আরও বুঝ করে লে।

সান্ত্বনা তার এইটুকু। সব থেকে খারাপ লাগছে সে ফুলকে বলতে পারছে না। ফুল যে মেয়ে তাতে এ সব কথা শুনে বিশ্বাস তো করবেই না, উলটে ভয় পাবে এবং দিদি টুশকিকে বলবে। আর টুশকির যা কথা আর চেঁচানি সে পাড়া মাথায় করবে। আর বলবে। দেখ্ হে দেখ্ শুন্ সব শুন্, এই বিধুস্তাদের কথাটো শুন্। ফুল হয়তো কাঁদবে।

মনে পড়েছিল তার রুকনীকে। রুকনী যে মেয়ে ছিল সে হলে তা করত না। কখনও না। হোক তিড়িকটিড়িক মেয়ে, হাসুক সে খিলখিল করে, ধেই ধেই করে বেড়াক সে ছুটে, হোক সে মরদের গায়ে পড়া, তবু সে মেয়ের জাত আলাদা। সে বিশ্বাস করত।

এই সবই সে ভাবছিল খাটিয়ায় কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সকাল। কাল প্রবল বৃষ্টি হয়েছে ঝড়ের সঙ্গে। বেশ মৌজ হয়েছে। তবু ভাল লাগে নি। হঠাৎ সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। চলে এসেছে সে সেই জহর সর্ণায়। জহর সর্ণার পাশেই যে ছোট পাথরের চত্বরটায় তাদের গ্রামের পঞ্চায়েতদের মজলিস বসে সেখানে—যে জায়গায় তার বাপ চুনার মাঝি বসে—সে সেইখানে বসে পাথরে হেলান দিয়ে ভাবছিল।

ভাবছিল রুকনীর কথা। মানকীর কথা। টুকনীর কথা। তার ভগিনপোতের কথা।

মানকী তাদের ছোট বোন। সবচেয়ে ছোট। ভারী মিষ্টি মেয়ে, দেখতে বড় ভাল। কিন্তু তার বুদ্ধি কম, আর বড় বেশী ঝোঁক। সবচেয়ে তাকে ভালবাসত তারা দুই ভাই, সিধু আর কানু। ছেলে বয়সে তাদের তিনজনের একটা ছোট দল ছিল। ভাইদের সঙ্গে ছোট মেয়েটা সমানে ছুটত, ঘুরে বেড়াত। সিধু কানুর প্রথম কুকুর দুটোকে সেই বেশী যত্ন করত। ছোট ধনুক তীর নিয়ে তারা দু ভাই বের হত, সঙ্গে কুকুরের বাচ্চা দুটো যেমন

তাদের সঙ্গে ছুটত, দাঁড়ালে কাটা লেজ নেড়ে নেড়ে চারিপাশে ঘুরে ঘুরে নাচত, মানকীও ঠিক তাই করত।

তারা তখন মোষের শিংয়ের মাথা পরানো তীর নিয়ে ঘুরত, এই জহর সর্দার কাছে এসে ওই যে ভেঙেপড়া মুড়ো শালগাছটা আজও দাঁড়িয়ে আছে ওইটেকে চাঁদমারি করে তীর ছুঁড়ত, সঙ্গে সঙ্গে কুকুর দুটোর সঙ্গে ছুটত মানকী, তীর কুড়িয়ে আনবার জন্তে। তীর নিয়ে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করত। সে বোল সতের বছর আগের কথা। তখন কানুর বয়স বারো বছর, সিধুর বয়স এগারোর কাছে। সিধুর চেয়ে মানকী তিন বছরের ছোট—তখন সে সাত আট বছরের 'হপন্‌কুড়ি'—ছোট মেয়ে। ঝাঁকড়া ছোট চুল—সেই চুলেই তার তখন ফুল গোঁজার শখ, দিনে দশবার ফুল এনে দিতে হত, নইলে কেঁদে কেটে তুমুল কাণ্ড করত। কারণ ছোট চুলে ফুল গুঁজতো আর পড়ে যেত, আবার তুলে পরিয়ে দিতে হত। বারকয়েকের মধ্যে ফুল যেত খারাপ হয়ে—তখনই সে ফুল ফেলে দিয়ে আবার নতুন ফুলের জন্ত আবদার ধরত। এ যোগাতো তারা দুই ভাই!

মানকী হবার কিছু দিন—বছর তিনেক পরেই মা মারা গিয়েছিল; চুনার মাঝির তখন অনেকটা বয়স—পঞ্চাশের উপর; চাঁদ ভৈরবের বিয়া হয়ে গিয়েছে—বড় বউয়ের দুটো গিদ্‌রা, মেজ বউয়ের একটা হয়ে আবার একটা পেটে; তা ছাড়া চুনার মাঝির বাড়ির পাশে থাকত তার দিদি, তার ছেলেপিলে ছিল না; ভাইয়ের খেতে খামারে পাটকাম করত; চুনার-ই তাকে খাবার ধান দিত, কাপড় দিত; বুড়ীও পাঁচরকম কাম জানত, ডালা কুলো বোনা— আর পারত পরিপাটি ঘর নিকানোর কাজ। দেওয়ালের বাইরে গোবর মাটির লেপন দিয়ে আঙুল দিয়ে এমন খেজুরপাতার ছক কাটত যে দাঁড়িয়ে দেখতে হত। চুনার সেই দিদিকে বলেছিল —কানু সিধু পাঁচ ছ বছরের হইছে, মানকী তিন বছরের। সব কটা বড়া বেবাগা বেটেক। দেখিস তো কাঁড়া গরু ছাগল চরাতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে বনের ভিতর ঢোকে। বউ দুটোর কোলেপিঠে গিদ্‌রা গিদ্‌রী—আবার পেটে রইছে। তু এসে ইবার ঘরে থাক। উদিগে দেখ। বউটো মরে গেল! উরই সঙ্গে তুর বনত নাই। ইবার ঘরকে এসে থাক।

সেই পিসী, 'বড়কী হাতম' মানুষ করেছিল তাদের তিনজনকে। তবে সব থেকে মায়া ছিল তার মানকীর উপর। মানকীকে সে বের করে দিত তাঁর নিজের বালিকা বয়সের পুঁতির মালা লাল কাঁটির মালা। নিজের পয়সা থেকে কিনে নাকে পরিয়েছিল পিত্‌রার (পিতলের) মিনি। হাতমের (পিসীর) সঙ্গে 'হিলি'দের (বউদিদের) বনত না। ঝগড়া হত। মানকী ভাইপোদের কোলে করলে পিসী হাঁ-হাঁ করত। বলত—নামা, নামা বুলছি। তু কতুটুকুন—ওই ভারী গিদ্‌রা কোলে করে কুমড়োর মত ভাবাপারা হয়ে যাবি। নামা।

এমনি করেই পিসী চাঁদ ভৈরবের বউদের সঙ্গে আলাদা হয়ে একটা সংসার পেতে নিয়েছিল। 'হিলি'রাও খুব ঝগড়া করত।

চুনার চুপ করে থাকত। চাঁদ ভৈরব প্রথম প্রথম বউদেরই বকত—তারপর ক্রমে আলাদাই হয়ে গেল। এদিকে কানু সিধু বড় হয়ে উঠল। অবাধ স্বাধীনতায় দুই ভাই এই

বাগনাডিহির চারিদিকের জঙ্গলে ছুটে বেড়াত। মানকী হত তাদের সঙ্গী। প্রথম যেবার একটা বড় হেঁড়োল মেরেছিল দুই ভাই সেবার মানকীও ছিল। কিন্তু মানকী হেঁড়োলটার নখের 'হাঁজর' (আঁচড়) খেয়েছিল কাঁধে। সে তারই নির্বুদ্ধিতা। দুটো পাথরের আড়ালে বসে দু ভাই হেঁড়োলটাকে দু পাশ থেকে মেরেছিল চার-চারটে কাঁড়। লোহার ফলাওলা কাঁড়। একটা বুকে একটা পেটে একটা কানের কাছে আর একটা কোমরে। হেঁড়োলটা চীৎকার করে মাটির উপর গড়াগড়ি খেয়ে যখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তখন আচমকা মানকী সিধুর টাঙিটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল পাহাড়ের আড়াল থেকে এবং সেই টাঙিটা দিয়ে হেঁড়োলটাকে কোপাতে গিয়েছিল কিন্তু হেঁড়োলটা শেষ চেষ্টায় দাঁড়িয়ে উঠে তার কাঁধে দুই থাবা দিয়ে ধরেছিল। তবে পড়েও গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। ততক্ষণে সিধু কানু দুজনে ছুটে এসেছে এবং সিধু সেটার গলায় পা দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে কানুকে বলেছিল—শালার কোমরে মার টাঙি।

কানু তাই মেরেছিল। কোমরটা প্রায় আধখানা কেটে গিয়েছিল। সিধুর পায়েও আঁচড় মেরেছিল হেঁড়োলটা পিছনের পা বাড়িয়ে। কিন্তু 'হাতম' হাউমাউ করেছিল মানকীকে নিয়ে। বলেছিল—ভাই কিনা। ভাইরা 'সিসেরা'দের একেবারে দেখতে পারে না। ওরা হল ভাইদের চোখের কাঁটা।

মানকীকে বলেছিল—আবার যদি ভাইদের সঙ্গে যাবি তো তুকে আমি ঝাড় মারব। আর তু বড় হলছিস ডবকা হলছিস—আদাড়ে পাদাড়ে যাবি তো ভূতে দানা দত্যিতে তোকে ধরবে।

সারতে দু-তিন দিনের বেশী লাগে নি। কিন্তু মানকীকে হাতম চোখে চোখে রাখত। তাকে সাজাত গোজাত আর গল্প বলত।

বলত ভাই বোনের গল্প। "এই তুর মতুন (অর্থাৎ মানকীর মত) এক মেয়ে ছিল, আর ছিল তার সাত সাতটা দাদা। দাদারা আর দাদাদের বউয়েরা দু চোখে দেখতে লারত সিসেরাটাকে ছুটু বুনটোকে। বুনটো খুব ভাল ছিল—খুব ভাল।

সাত ভাই রাজার পথুর কাটছিল। বুন যেতো ভাইদিকে খাবার দিতে। পথুরটা কাটা শেষ হইছে—জল খানিক খানিক বেরালছে, তখুন একদিন বুনটা গেলছে খাবার দিতে আর ভাই সাতটা করলেক কি, গুজুগুজু করলেক—বুনটাকে আর কত খেতে দিব হে। তার চেয়ে এক কাম কর—উকে মেরে ফেলা, আর এই পথুরের মাঝখানে 'গাঢ়া' খুঁড়ে পুঁতে দে। সবাই বুললে—হাঁ হাঁ, খুব ভাল কথা ; বুনের লেগে বউরা হাসছে না, রাগ করছেক, আর খেতে দিতে হছেক। তা তাই কর।

তাই করলেক তারা। দিলে তাকে মেরে গাঢ়া খুঁড়ে পুঁতে। দিয়ে বাড়ি চলে গেল সাত ভেয়ে। গাঁয়ে গিয়ে বললেক তাকে বাঘে নিয়ে গেল। বউরা সব জানত। তারা ঘরে ঢুকে সাত বউয়ে হাসতে লাগল—হি হি হি—হি হি হি।

এথুন ময়ংবোঙা দেখলেক। সি বুললে—তু বাঁচ গ। তু ভাল মেয়া। জহর সর্গার মাড়ুলি দিস, আমাকে নম করিস। ভাল মেয়া তু বাঁচ।

বাঁচল ম্যোয়া। তবে ম্যোয়া হল না। ওই পথুরে যিখানে তাকে গেঢ়েছিল সেইখানটিতে একটি পদ্মফুল হয়ে বেঁচে গেল।

এখুন রাজা একদিন পথুর দেখতে এল। এসে দেখে পথুরের মাঝখানটিতে একটি রাঙা টুকটুকে পদ্মফুল ফুটিছেক। তা ভাল লাগল। তো চাকরদিকে বুললে—তুলে আন্ হে।

চাকরটা নামলেক জলে। তো হল কি? চাকরটো যত্ত গেল ফুলটো ততো সরে সরে গেল, ইদিকে গেলে উদিকে যায় উদিকে গেলে ইদিকে আসে।

রাজা বুললে—ই তো মজার ফুল বেটে। ইটি আমি লিবই হে।

ফুল তখুন বুললে—

রাজা হাত বাড়ালে পায়—
চাকর বাড়ালে হারায়।
চাকরের হাত জোরে টেনে ছেঁড়ে—
রাজার হাত তোলে যতন করে।

রাজা তখুন নিজে নামল। নেমে খানিকটা গেলছে আর ফুলটি এসে আপনি রাজার হাতে লাগল। রাজা যতন করে তুলে এনে যেই পালকিতে উঠেছে আর ফুলটি সে-ই ম্যোয়া হয়ে গেল।

রাজা বুললে—আমি তুকে বিয়া করব। তু আমার রানী হবি।

ম্যোয়া বুললে—মরংবোঙ্গা তারই লেগে আমাকে তোর পথুরে পদ্মফুল করে ফুটালেক। আমি তুকে খুব যতন করব। তু শুশুড়ে ম্যোয়া আনবি, রেঁধে দিব। দাকা রেঁধে খেতে দিব। তোর গরুর যতন করব। ধান ভেনে চাল করব। আমি খুব ভাল ঘর নিকাতে জানি। পুঁতির মালা গাঁথতে পারি। তু আমাকে পুঁতির মালা দিস—গলাতে হাঁসুলী দিস—হাতে শাঁখের বালা দিস। আর লাল লাল ফুল এনে দিস খোঁপাতে পরব।

রাজা বুললে—হোক্। তাই দিব।

এই খুব মাদল বাজালে সিরিং করলে খুব নাচলে—হাঁড়িয়া জম করলে। খুব ভোজ করলে। অ্যানেক শুয়োর খাসী কাটলেক। এতোটো করে গুড় দিলে।

তখুন রাজার নতুন বউ বললেক—তুর যারা পথুর কেটেছে সাত ভাই তাদিকে ডাক। তারা আমার ভাই বেটে। তাদের সাত বউকে ডাক।

এই রাজা তাদিকে ডাকলেক।

তারা এল। এসে বুন রানী হলছে দেখে 'হাহাড়া' অর্থাৎ আশ্চর্য হলে গেল। 'আৎওৎ' মানে থতমত খেলে। আর খুব হিংসে হল। বুন তাদিগে যতন করে খেতে দিলে। তখুন, তারা মনে করলে বুনটাকে ওই উঠানে যে পাতকুয়াটি রইছে তাথেই ঠেলে ফেলে দিবেক।

বুন এল গুড় নিয়ে।

বড়কা দাদা বুললে—বুন জল আন্ হে।

বুন গেল কুয়ো থেকে জল আনতে। আর সাত ভাই সাত বউ তাকে ঠেল্যা ফেল্যা দিব বলে উঠল। যেই উঠল অমুনি বোঙ্গার হল গোস্সা। বোঙ্গা বুললে—মাটি, তু কেটে যা।

যেই বলা, আর সাত ভাই আর সাত বউয়ের পায়ের তলা ফাঁক হয়ে গেল, কুমীরের হাঁয়ের মতুন। আর তারা তারই ভিতর কুথায় পড়ে গেল। বুন বললে—যাস না, ভাইরা যাস না। তখুনি মাটি আবার বুজে গেইছে।"

সিধুর সব মনে আছে। কিছু সে ভোলে নি।

বারহেটের নিমু মাঝি বললে—সেই মানকী কিরিস্তান হয়ে গিয়েছে। পিসী যতই যা বলুক মানকী সিধুকে কানুকে খুব ভালবাসত, তারাও বাসত। কিন্তু পিসী তাকে তিড়িক-টিড়িক মেরা করে দিলে। পাড়ার ছোকরারা তাকে দেখে ক্ষেপত। কিন্তু তার বাপ আর সিধু কানুর ভয়ে কিছু বলতে পারত না।

সিধু সেই সব ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। মানকীকে সেই বেশী রক্ষা করেছে সে সময়। চাঁদ ভৈরব দাদারা কি ভৌজিরা বকলে কিছু বললে সে ঝগড়া করত। বলত—বেশ করে। ফ্যাকফ্যাক করে হাসে তো কি হলছে? লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে—তাই বা কি হলছে? সাজগোজ করে বেশ করে। আরও করবেক!

বাবা চুনারও মধ্যে মধ্যে বকত। বলত—মুর্মুঠাকুরের বাড়ির 'কুড়ি' অর্থাৎ বেটী তু। তুর লাজ নাই কেনে? বেহায়া কেনে তু? মুর্মুঠাকুর সাঁওতালদের রাজা ছিল। হাঁ। সেই বালী রাজা ছিল নরং বরু ধরতির সব চেয়ে উঁচু বরুর (পাহাড়ের) ধারে। সেখানে তাদিকে হারালে ওই হিঁদুদের এক রাজা ঠাকুর। তখুন সিখান থেকে পালায়ে এসে আবার বালী রাজার ছেলে রাজা হল। সি কুথা বটে। সিখানে আমাদের জাতভাইরা আজও রইছে। সিখানে আবার এল তুরুকরা। তুরুকরা লড়াই করলেক—সি লড়াই খুব লড়াই। রাজার এক বেটী ছিল। সি বিটীকে বিয়া করতে ছত্রী রাজারা ক্ষেপল। তুরুকরা ক্ষেপল। তো লড়াই হল। লড়াইয়ে হারল মুর্মুঠাকুর রাজা। মুর্মুঠাকুর রাজাকে তুরুকরা বেঁধে ফেলালে। তখুন বিটী কি করলেক জানিস? বিটী লোক পাঠালেক কি—হাঁ আমি নিজে যাব কিন্তুক, তার আগে আমার বাবাকে ছেড়ে দিতে হবেক। তুরুক রাজা বললে—বেশ। তখুন রাজাকে ছাড়লেক আর বিটীর পালকি এল তুরুক রাজার কাছে। রাজা পালকি খুললেক—তখুন, দেখে বিটীটো বিষ খেঁয়ে মরমরো, মরছে। বুললেক—তুরুক আমি মুর্মুঠাকুর রাজার বিটী—আমি ধরম দিব না হে। আমি মরলম। তখুন রাজা তার ছেলেপিল্যা নিয়ে সিখান থেকে চলে এল। এল হাজারীবাগের জঙ্গলে। সিখান থেকেও তাড়ালে তুরুকরা। তখন গেল রাঁচী। সিখান থেকে আমার বাবা আইছিল এই ছাশ। তখুন আমি গিদ্‌রা বেটে। শুখা হাতমকে।

হাতম বলত—তু তাই রাজার ছেল্যা দেখে বিয়া দে বিটীরে, তবে বুঝি। উ রাজার ঘরের বিটী রাজার বিটীর মতুন হইছে। সাজে গোজে, হাসে, সিরিং করে। নাচে। দোষ কি করলেক?

চুনার বললে—সাঁওতালদের কপাল মন্দ হইছে দিদি। রাজা তো আর নাই গ। আমাদের জাতের রাজাগুলান আজ দিকু হঁয়ে রেইছে। বুলছে আমরা সাঁওতাল লই হে।

আমরা ছত্রী বেটে। আমরা মুর্মু লই। সিং হয়ে যেইছে তারা। আমরা কি করব? গরীব ইয়ে যেইছি। খাটি খাই। জাতধরম মানি। মরংবোঙ্গাকে ছাড়ি নাই। কখুনও আবার যদি মরংবোঙ্গার ঘুমটো ভাঙে, সি যদি উঠে তখুন আবার হবে। এখুন যেমন কপাল তেমুনি চলতে হবেক।

মনে পড়ছে সেদিন নয়ন পাল তার পট দেখাতে দেখাতে বলছিল, এই দেখুন বাবুমহাশয়, এই একটা বাঁদরলাঠির গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে এই যে সাঁওতাল কন্যে, এই হল মানকী। তার দেখেন চুলে বাঁদরলাঠির হলুদ ফুল; এই দেখুন কেমন চোখ বড় বড়; গলায় পুঁতির মালার সঙ্গে গেঁথেছে বাঁদরলাঠির ফুল। কালো রঙের লম্বা 'ছেয়ালো' মেয়েটাকে কেমন লাগছে। কন্যেটি নাকি সত্যিই সুন্দর ছিল। আর এই হল চুনার মাঝি, এই হাতম মানে পিসী —আর এই হল সিধু আর এই কানু। দুই ভাই চুনারের কথা শুনছে।

"চুনার বলে—শুন্ কুণ্ডী মুর্মুঠাকুর রাজগুণ্ডী
মরংবোঙ্গার ছিষ্টি—অদৃষ্টের দোষে এই দশা—
প্রথমে দিকুরা তাড়ে তুরুকেরা তার পরে
বনে বনে ঘুরে ঘুরে হাতী থেকে হইলাম মশা।
তথাপি ধরমে মানি দিন খাই দিন আনি
দিকু করে টানাটানি দিনরাত সব কিছু ধরে—
সব দিই দিই না ধর্ম মুর্মু বোঝে তার মর্ম—
করে নাক ছোট কর্ম সাঁওতালে এই মান্য করে।"

নয়ন পালের পটের ছড়ায় আছে—চুনার মুর্মুঠাকুর সেদিন বিটী মানকীকে উপলক্ষ্য করে বংশের অনেক কথা এবং অনেক উপদেশ সে ছেলেমেয়েদের দিয়েছিল।

কানু তাতে বলেছিল—আপা (বাবা), তবে তু পরগনাত হলি না কেনে?

পরগনাইত কতকগুলি গ্রামের খবরদারি করত। কথাটা আরবী বা পারসী কিন্তু এ পদের সৃষ্টি করেছিল সেকালে ইংরেজরা। এখনও সাঁওতাল পরগনায় পরগনাইত আছে। সেদিন পর্যন্ত ছিল। এখন পঞ্চায়েতী আমলে গিয়ে থাকলে থাকতে পারে।

সে যাক।

চুনার ছেলের কথা শুনে বলেছিল—সি তো 'পাণ্টিন' এর হাত। (মিস্টার পোটেণ্ট ছিলেন সাঁওতালদের স্পেশাল অফিসার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে নতুন আবাদী জঙ্গি এলাকায় সাঁওতালদের কর্তা নিযুক্ত করেছিল, সাঁওতালেরা পোটেণ্টকে 'পাণ্টিন' সাহেব বলত)। চুনার তাই বলেছিল—সি তো পাণ্টিনের হাত বিটা। সি 'পুড়খানা জেটের' নোকরী হে। মুর্মুঠাকুরের ছেলা হয়ে নোকর হব কেনে হে! অ? তা পরগনাত চুনার মুর্মুঠাকুরকে মানে কি না, বুল কেনে তু?

ছেলেরা চুপ করে ছিল। কথাটা চুনার মিথ্যে বলে নি। পরগনাইত ভগলু মাঝি এসে আগে হাত বাড়াত, তবেই চুনার মুর্মু হাত বাড়াত; বিচার হলে মাঝখানে বসত চুনার—তার

পাশে বসত পরগনাইত। তাও তারা দেখেছে।

চুনার সেদিন বেটী মানকীকে অনেক ভাল কথা বলে বুঝিয়েছিল। মানকী খুব কাঁদতে আরম্ভ করেছিল।—সে করলেক কি? কি মন্দ সে করলেক?

হাতম বলেছিল—কানিস নাই মানকী, উয়ার মুরদ নাই, ঘরকে ভাত নাই; উ আবার ধরম ধরম করছেক।

সিধুরও খুব ভাল লাগে নি। গাঁয়ের দু-তিনজনার অবস্থা তাদের থেকে ভাল। পরগনাইত ভগলু মাঝির কত ধান,—বড় বড় কাঁড়া—কত জমিন, তাদের বাবার সে সব নেই। বুড়া ঘরে বসে থাকবে আর মুর্মু ঠাকুরাই ফলাবে।

সিধুর সে সব মনে পড়ছিল।

তার জন্ত লিটাপাড়ার বিশু মাঝির ভাইপো লাল মাঝি এল—আর তার সঙ্গে লুকিয়ে পালিয়ে গেল মানকী। লাল মাঝি তাদের চেয়ে কিছু বেশী বয়সের ছোকরা—এই চুল এই বাহার, হাঁড়িয়া খায় আর গল্প করে বেনাগড়িয়ার; বেনাগড়িয়ায় তাদের কুটুম আছে লিটা মুর্মু; সে সাঁওতালদের বড় পুরুত কদমনায়েক আবার ওখানকার পরগনাইতও বটে। বেনাগড়িয়ায় পাদরী বাবারা এসে সেখানে কিরিস্তানী গির্জা করেছে। পাদরী বাবারা তাকে খুব খাতির করে; লিটা মুর্মুও পাদরী বাবাদের কাছে যায়; লিটা মুর্মুর অনেক জমিন, অনেক কাঁড়া গরু। অনেক ধান পান। দিকুরা কিছু করলে পাদরী বাবারা খত পাঠায় বীরভূমের সাহেবের কাছে। অনেক ছোকরা সাঁওতাল কিরিস্তান হয়েছে; তারা লিখাপড়ি করছে। কুর্তা পরে তারা, দিকুদের মত বড় কাপড় পরে। পাদরীদের খত নিয়ে বর্ধমান মুলুকে রাস্তাবন্দিতে গিয়ে কাম পায়। অনেক পয়সা রোজগার করে তারা। লাল বছরে দু-তিনবার করে বেনাগড়িয়া যায়: পাদরী বাবাদের কাছে সে অনেক শুনেছে। লাল মাঝিকে সাহেব কতবার বলেছে বর্ধমানে কাম করতে যেতে, তা সে যায় নি। এবার সে যাবে।

এ গাঁয়ে লাল মাঝি এসেছিল হাঁসদাদের বাড়ি। লাল মাঝি, হাঁসদা। হাঁসদা হলেও লাল মাঝিদের খুঁত আছে, লাল মাঝির বাবা নিয়ম না মেনে এক হাঁসদা মেয়েকে বিয়ে করে সমাজে ছোট হয়ে গিয়েছে। অবশ্য লাল নিজে সে মায়ের ছেলে নয়। সে তার বাপের প্রথম স্ত্রীর ছেলে।

লাল হাঁসদাকে বড় বড় মাঝিরা ভাল চোখে দেখে নি, কিন্তু ছোকরাদের মধ্যে খুব জমিয়ে ফেলেছিল সে। সিধু কাহুকে লাল কিন্তু খাতির করেছিল। সে সিধুর শিকার করা দেখে খুব খুশী হয়ে বলেছিল—আঃ, সিধু মুর্মু তু যদি বন্দুক পেতিস তবে তু আসমান থেকে চাঁদ পেড়ে আনতিস হে! বাহা বাহা! আচ্ছা তাগ তুর। আচ্ছা মরদ।

অশ্লীল কথা বলত লাল। বনের মধ্যে বীর সিঙিং (শিকারের গান—অশ্লীল এর বিষয়-বস্তু) গেয়ে মাতিয়ে তুলেছিল।

এই লালের সঙ্গে একদিন রাত্রে পালাল মানকী।

হাঙ্গামা হয়েছিল তার জন্তে। গোটা বাগনাডিহি তীর ধনুক নিয়ে গিয়েছিল লিটাপাড়া।

কিন্তু মিটমাট না করে উপায় ছিল না। মানকী বিষ খেয়েছিল ভয়ে। কিন্তু অন্ত বিষ বলে বেঁচেছিল—তাই মিটমাট করে বাগনাডিহির লোকদের নিয়ে চলে এসেছিল চুনার মুর্মু, কিন্তু বলে এসেছিল—বিটাটো মরে গেইছে হে। উয়ার সঙ্গে আমার আর কিছু রইল না।

সিধু কানুর কষ্ট হয়েছিল তবু তারা বংশের অবমাননা গায়ে মেখে পারে নি, তারা লালের এবং মানকীর উপর খুব রাগ করেছিল। কিন্তু মাস তিনেক পর বারহেটের বাজারে আসা-যাওয়ার পথে লিটাপাড়ার বিশু মাঝি আর তার দুই যমজ বেটী টুকনী আর রুকনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জহর সর্ণার ধারে।

কানু আর সিধু দুই ভাই বসেছিল ওই মজলিসের পাথরটার উপর। লম্বা—ওই তাদের বোন মানকীর মতই লম্বা, আর ঠিক একরকম দেখতে দুই মেয়ে—বয়স পনের ষোল—বাপ বিশু মাঝির পিছু পিছু সেজেগুজে গান গাইতে গাইতে চলেছিল। সে সাজগোজ আবার যেমন তেমন নয়, বেশ ভাল। যেন শহুরে কিরিস্তানী ঢঙ। একজনের লাল পাড়। একজনের পাড় কালো। জহর সর্ণার ধারে পাথরের উপর বসে সিধু আর কানু দু ভাই মেয়ে দুটোকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল—তাদের চেহারার সাদৃশ্য দেখে। ঠিক একরকম।

বিশু মাঝি জল খেতে এসেছিল ঝরনায়। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটো, একেবারে শরক পাখীর মত কল কলে মেয়ে। বিশু জল খেয়ে গাছের ছায়ায় বসেছিল, আর মেয়ে দুটো জল খেতে নেমে হি হি করে হেসে এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে কলরব তুলেছিল।

নতুন জোয়ান দুই ভাইও চনমন করে উঠেছিল। সিধুর বুদ্ধি বরাবর প্রখর। কি করে ওদের সঙ্গে কথা কইবে ভাবছিল দুই ভাই-ই। কানু ভাবছিল ওই প্রবীণ মাঝিকে গিয়ে জোহর করে বলবে—বাড়ি কুথা হে? কুথা যাবিন?

কিন্তু তার আগেই সিধুর চোখে পড়েছে ঝরনার ধারে পাথুরে পাহাড়টার উপর ঘষঘষে ফুলের গাছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের বড় ফুল ফুটে আছে থোকায় থোকায়। মেয়ে দুটো সেদিকে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সিধুর মাথায় মুহূর্তে মতলব খেলে গেল। সে তার ধনুকটা তুলে কাঁড় জুড়ে নিশানা করে ছুঁড়লে তীর। একটা থোকাসুদ্ধ ডগাটা কেটে ঝপ করে পড়ে গেল ঝরনার জলে। দুই বোনেই কলরব করে উঠল। কিন্তু যার কাছে পড়েছিল সে লালপেড়ে কাপড়-পরা মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে বললে—আমি পেলম আমি দিব কেনে? তু উকে বুল—

সঙ্গে সঙ্গে কানু কাঁড় জুড়ে বলেছিল—দি ছি হে—তুমি লিবে ইবার!

কানুর প্রথম কাঁড়টা ঠিক লাগে নি, শুধু ক'টা ফুল ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার জুড়েছিল তীর। সিধু তাকে বলেছিল—তাড়াতাড়ি করছিস কেনে হে? মেয়েটা পালাবে নাই—দেখ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তাক করে মার, উর মুখে যাবে পড়ে।

কানুর তীর এবার ভ্রষ্ট হয় নি।

এরপর কথা হতে বাধা হয় নি। অবশ্য বিশু মাঝির মারফতেই আলাপ আরম্ভ হয়েছিল।

পরিচয় হতেই মেয়ে দুটোর একটা অন্যের গায়ে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—হায় মা গ! ই

ছোঁড়ারা কে বেটে? মানকী বউয়ের ভাই বেটে! বলে হেসে সারা। অন্ত মেয়েটি কিন্তু বলেছিল—অ। তুরা দু ভাই কানু সিধু। মানকী বউয়ের দাদা তুরা? অ! মানকী কেঁদে মরে তুদের লেগে আর তুরা, ধুর, ভাইরা এমুনি বটিস!

কানু সিধু কথা খুঁজে পায় নি। বুকে যেন খচ করে বিঁধেছিল। বিশু মাঝিও বলেছিল—ই, বউটো কাঁদে দুখ করে। তা—। হেঁ—তুরা মুর্মুঠাকুর বেটিস—লালের কুলে খুঁত আছে তা—একটু হেসে বলেছিল—বুন তো বেটে!

কানু বলেছিল—কিন্তুক চুনার মাঝির মানটো কেমন জান তো মাঝি!

—হু—জানে। সোবাই জানে। মান নিয়ে ধুঁয়ে খেছে। বেটী কাঁদছেক!—বলেছিল একটি মেয়ে।

বিশু বলেছিল—সি তো বেটে হে। কিন্তুক বাপের হিয়ে তো বটেক। এই দেখ কেনে আমার এই বিটী দুটো। ই দুটো 'জাঁও' (যমজ) বটেক! বিটী দুটো বড়া কলকলে খলখলে বেটে! লোকে বলে বজ্‌জাত, তা আমি তো—

বাধা দিয়ে একজন মেয়ে বলে উঠল—বজ্‌জাত বজ্‌জাত যারা বুলে সেই বিধুরারা বজ্‌জাত; বেশ করব আমরা কলকল খলখল করব।

—হাপেঃ! হাপেঃ! ইরা কুটুম বেটে!

—বেশ বেটে। আমরাও কুটুম বেটে।

বলে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, একজন হাসতেই আর একজন; দুজনের কণ্ঠের হাসি—সে যেন জলতরঙ্গ বেজে গিয়েছিল।

বিশু বলেছিল—এই ত্যাখ কেনে। কি বুলব হে? ইটা হল রুকনী আর ইটা টুকনী। জাঁও বুন। একরকম দেখতে। একটা হাসলে দুটা হাসে, একটা কাঁদলে দুটা কাঁদে।

—না, আমরা কাঁদি না। কেনে কাঁদব?

বিশু হেসে বললে—তেবে ল্যাই করিস—একজনার সাথে ল্যাই হল তো দুজনা লাগল। দুজনার সাথে লেগে গেল।

—হঁ। একজনার সাথে ভাব হল তো দুজনার সাথে হল।

আবার দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠেছিল তারা।

সিধু এবার বলেছিল—বেশ, বুলিস মানকীকে, আমরা দুই ভাই যাব।

—কবে যাবি?

—তুরা কবে ফিরবি বুল?

—কেনে? আমরা না ফিরলম তো তুদের কি?

—তুরা না ফিরলে মানকী জানবে কেমনে বুল?

—হেঁ! তা বেটে!

—আমরা কাল ফিরব হে। আজ রাতে থাকব। কাল বাজারে গয়না কিনব। তাপরেতে ফিরব।

—বেশ আমরা দুদিন বাদে যাব।

কানু আঙুল গুণে বলেছিল—তেঁহে গাপা সেয়াং, লুখীবার শুকোল শনি। (আজ কাল পরশু, লক্ষীবার শুক্রবার শনিবার।)

—যাস—নেওতা দিলম হেঁ কুটুম। হাঁড়িয়া রাখব, দাকা রাখব, সিম (মুরগী) রাখব—আরও অনেক রাখব—যাস।

তাই গিয়েছিল তারা।

মানকীর সে কি আনন্দ! তার সঙ্গে লালের আর বিশু মাঝির দুই বেটীর। লিটাপাড়ায় ওদের ঘরে খুব বেশী কেউ আসে না। সর্দার ভীম মাঝি কড়া লোক। রাগী মানুষ। এদের সঙ্গে বেনাগড়িয়ার লিটা মুর্মুর সম্পর্ক থাকার জন্যে সে এদের উপর নারাজ। সে বলে—লিটা মুর্মু নামে মাঝি—সে বারো আনা কিরিস্তান হয়ে গেছে। তার সঙ্গে দহরম মহরম রেখে এরাও হয়ে গেঁছে আধা কিরিস্তান। অন্য ক'ঘরের মেয়েরা এসেছিল—তাদের সঙ্গে জন দু তিন পুরুষ। তাদের মধ্যে বিশু মাঝি আর তার দুই মেয়ে।

মানকী ছুটে বেরিয়ে এসেছিল—দাদারা হে!

তারপর তার সে কি কান্না! বিশুর দুই মেয়ে গোড়া থেকেই ছিল। বাড়ির দোরে তারা তিনজনেই দাঁড়িয়ে ছিল পথের দিকে তাকিয়ে।

সিধুর মনে আছে তারা সেদিন দুজনে ঠিক এক পেড়ে এক রকম শাড়ি পরেছিল। দুজনেই একসঙ্গে হেসে সংবর্ধনা করে বলেছিল—এস কুটুম, এস।

তারপর তারা বলেছিল—কি দেখছিস হে। মানকী বউ, খবরদার, কার নাম কি তা বুলবি না। চিনে লিতে হবে। ইশারা করবি না। তাহলে ল্যাই হবেক।

সন্ধ্যে তখন হয়ে এসেছে, মাদল পেড়ে লাল বলেছিল—কুটুম এল গান কর হে। পেথম আইছে কুটুম।

তারা চারটি মেয়ে—মানকী ওরা দুই বোন আর লালের এক দিদি কোমর ধরে দাঁড়িয়েছিল। বিশু বাজিয়েছিল বাঁশী।

লাল গান ধরেছিল।

ছবির মতন মনে পড়ছে সিধুর।

সিংগিডো দুবুই জান, কুপুলকো হিজু জান
সাও নারিগা পাটী বিলাকম্

লাল বললে—সন্ধ্যের সময় কুটুম এল—ওরে বউ পাটি আন—পিড়ে আন—পেতে দে বসতে দে।

মানকী গাইলে—তার সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়েরা—

গানডুরো বানো জান পাটিয়া বানো জান—

বাড়িতে পাটি নাই পিঁড়ে নাই। কুটুম আমার হিয়ের কুটুম—বস বস এই আসনেতে মাটিতে বস।

নয়ন পাল বলেছিল—বুঝেছেন বাবু, এই এমনি করে ওরা খুব আপনার লোককে গান

গেয়ে মাটিতে বসায়; নইলে অবিশ্যি মাদুর পেতে খাতিরে করে কুটুমদের বসায়। তার রকম আলাদা। কিন্তু মানকী আর লাল এমনি করেই দাদাদের হিয়েতে বসাতে চেয়েছিল।

কিন্তু ওই মেয়ে দুটো করলে কি জানেন?

মেয়ে দুটো তিড়িকটিড়িক মেয়ে কিনা, রগড় নইলে থাকে না। তাড়াতাড়ি নাচের সারি থেকে বেরিয়ে এসে দুজনে দুখানা নতুন তালের চ্যাটাই আসন পেতে দিয়ে বলেছিল—না না, বউয়ের ভাই মাটিতে বসিস নাই। এই চ্যাটাইয়ে বস হে। তেবে—

আর একজন কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল—চিনে নিয়ে বসিস বউয়ের ভাই। যে যাকে ফুল দিলি তার চ্যাটাইয়ে সেই বসবি। নইলে আমরা কথা বলব না হে। তুদিগে বুলব কানা। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

সিধু সর্বাগ্রে ঠিক রুকনীর আসন চিনে নিয়ে বলেছিল—এইটো আবার বেটে।

কানু বসেছিল আর একটায়।

এবার মানকী খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।—হেরে গেলি হে, হেরে গেলি। ননদেরা হেরে গেলি আমার দাদাদের কাছে।

সত্যই ওরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

—কি করে চিনলি হে?

সিধু জহর সর্দার ধারে বসে ওই বাজপড়া শালগাছটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল পুরনো কথাগুলি। কাল রাত্রি থেকে তোলপাড় করছে। যে অবধি শুনেছে মানকী লাল কিরিস্তান হয়েছে, বিশুর মেয়ে রুকনী টুকনীও হয়েছে—তাদের আর বদনামের সীমা নেই, সেই অবধি তার মনে তোলপাড় করছে এই কথাগুলি।

তার উপর আজ চূড়ার মা বললে—সিধু।

—হাঁ।—ফিরে তাকালে সিধু; কানু এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। সে বাড়িতে এসে শুনেই বেরিয়ে চলে এসেছে এখানে।

বাড়িতে টুশকি তুফান তুলেছে। ফুল থমথমে মুখে ছেলেদের নিয়ে পাটকামই করে যাচ্ছে। বাবা চুনার চুটি টানছে আর বলছে—কি যে হল ছেলেটো। কি যে মেজাজ। দিনরাত মনে মনে ঘুটছেক, কি ঘুটছেক কে জানে! শুনলম, ঝিকরু বুলছিল বারহেটে গিয়েছিল কাল, সিখানে মহিন্দর ভকতের সাঁতে মিজাজ দেঁখিয়ে বাত করিছে। ঝিকরুকে এক চড় মেরেছে। আবার গলা টিপে ধরতে গেইছিল। ইয়ে কি মেজাজ হল রে বাবা! তাথেই উকে বেরাইতে দিই না।

বড় ছেলে চাঁদের বউ বললে—সেই হাতম (পিসী) এমুনি করে দিলেক উদিগে। মানকীকে সিধুকে বিগড়াঁয়ে দিছে সেই। সি মরে গেইছে, ইবার ঠেলা লে তুরা!

চুনার সে কথায় কান না দিয়ে কানুকে হাঁকলে—কানু!

কানুর সঙ্গে টুশকির লেগেছিল। ফুল তার নিজের বোন—সে বোনের জন্য গাল দিচ্ছিল সিধুকে—কানুর তা সহ্য হয় নি—সে প্রতিবাদ করছিল। পুরুষের প্রতিবাদ, ভয় দেখাচ্ছিল

—দিব তুর চুলের মুঠা ধরে কিল ধমাধম্—তখুন হবে। হাঁ—। চুপ কর বুলছি।

—হাঁ দিবি। কেনে দিবি? কেনে কেনে কেনে?

—দিব। এমন বুললে আমি দিব।

—আমি ফুলকে নিয়ে চলে যাব। তুদের ভাত খাব না।

—যাবি! চুলের মুঠা ধরে নিয়া আসব।

—কেনে তা আনবি? যা তুরা সেই খুঁজে আনগা তুদের টুকনী রুকনীকে। তাদের লেগে হেদাইছিস।

হয়তো এরপর মুখের ঝগড়া হাতে নামত। কিন্তু এই সময়েই বাপ চুনার মাঝি ডাকলে—কানু। কানু হো।

—হাঁ।

—শুন্ হে।

কানু এসে দাঁড়াল, চুনার বললে—কুথা গেল সি?

—কুথা যাবেক, সি সেই জোহর সর্ণায় গেইছে।

—জোহর সর্ণায় কি আছে এখন? ইয়ার আর সি কি করবেক? তু যা ডেকে নিয়ে আয়।

—সি বুলছে জোহর সর্ণাতে মরংবোঙ্গা ইশেরা দিছে।

—ইশেরা দিছে?

—হঁ। তাই বুললে আমাকে সোকালে।

—কি ইশেরা দিছে?

—সি তা জানে না। বুঝতে লাগলেক। তাই গেইছে।

—উঁহু। তু যা! ডেকে আন্ হে। কথা শুন আমার। বুড়া হলম হেঁ। তুদিগে মানুষ করলম। সাদী সাগাই করলাম নাই। তুদের দু ভাইয়ের লেগে আমার দুখ হে। বুলগা তাকে—ডেকে আন্ হে।

তাই কানু এসেছে সিধুকে ডাকতে। সিধু ভাবছিল পুরনো কথা; মনে পড়ছিল টুকনা রুকনীর সেই আসন পেতে দেওয়ার কথা।

কানু ডাকলে—সিধু!

সিধু ঘাড় ফিরিয়ে তাকে বললে—বস্!

—হঁ বসলাম। কি কুরছিস—কেনে ইসব ভাবছিস হে!

সিধু বললে—সেই মানকীর বাড়িতে আসন দিলে টুকনী রুকনী—বুললে যি যাকে ফুল দিলে সি তার পাটিয়া বেছে লে।

—হঁ, তু ঠিক বেছে লিয়েছিলি রুকনীর পাটিয়া।

—কি করে বেছে লিয়েছিলম জানিস?

—হঁ! রুকনীর গালে হাসলে পরে ভারী মজার টোল হত হে!

—সি টুকনীরও পড়ত হে।

—না। রুকনীর মতন লয়। আর তুর লজর খুব কড়া হে।

—উঁ—হঁ। সেদিন রুকনীর টোল দেখে চিনছি নাই।

—তবে কি করে চিনলি?

—রুকনীর পাটিয়ায় একটি লাল টোকা ছিল হে। সি দিয়ে রেখেছিল।

—হঁ, তু কখুনও বুলিস নাই!

—না। বুলি নাই। রুকনী বারণ করলে।

—তা রুকনীর কথা কেনে হে? সি ডিড়িকটিড়িক মোয়া দুটো পালালছে, ভাল হইছে! ফুল তার থিকা ভাল বউ বেটে।

—উঁ—হু। ফুল ভাল বেটে কিন্তুক মাত্‌তে লারে হে।

—ই কি বুলছিস? ফুলের মতুন নাচতে কে পারে বুল? তু মাদল ধরলে তো আশিনের ধানগাছের মতুন হেলে পড়ে হে। বাওড়ে 'মুন্‌গা' (সজনে গাছ) গাছের মতুন নাচে হে।

—তা বেটে হে। তবে বড়া 'পোচরা'; সব তাতেই ডর করে। এত ডর কেনে হে! রুকনীর ডর ছিল নাই। তুর মনে আছে সেই ভালুটোর সঙ্গে যখুন লড়াই করলম তখন রুকনী কেমন চেঁচায়ে চেঁচায়ে বুলছিল—মার হে মার, খুব করে মার। শ্যাষে ভীম মাঝিকে যখুন ভালুকটা ফেলালে মাটিতে তখুন টাঙিটো আগায়ে দিলেক টুকনী।

—হঁ। বাবা গ—সি কি লাফঝাঁপি হে মেয়েটার! কিন্তুক—হাসলে কানু, বললে—উরা ভাল লয় হে—পালায়ে গ্যেল বেনাগোরে; আমাদিগে খোবর দিলে না।

সিধু এবার ঘুরে বসল কানুর দিকে—সি তো মানকীও গ্যেলা হে। তু শুনছিস উদের কি হইছে?

—কি হইছে?

—কিরিস্তান হইছে।

—মানকী লাল?

—উদের নাম বুললে না। টুকনী রুকনীর কথা বুললে। আর ইশেরায় জানান দিলে কি মানকীও হইছে। সাহেবলোকের বাড়িতে কাম করছেক। ম্যামসাহেব সাজছেক—

—কে বুললে?

সিধু তাকে গতকালের বারহেটে যাওয়ার কথা, নিমু মাঝির কথা, সব বললে। তারপর বললে—তাথেই সোকালে চূড়া মাঝির মা বুড়ী যখন বুললে মানকীর কথা রুকনীর কথা তখুন আমার রাগ হল—বললম—সারি (সত্য) হলে আমি তাদিগে কাঁড়ারে মারব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল কানু—সে ভাবছিল তার বাপের কথা। বুড়া শুনলে বুক চাপড়াবে, মাথা খুঁড়বে।

সিধু বললে—কাল থেক্যা আমি বোঙ্গাবাবাকে ডাকছি। বুলছি, বাবা তু আমাকে দেখা দিয়ে যোল—আমাকে তুর টাঙি দে—আমি এই পুড়খান জেট শালাদিগে কাটি, এই দিকুদিকে কাটি।

বলতে বলতে ভয়ংকর হয়ে উঠল সে।

তারপর বললে—তখুন ইশেরা পেলম।

কানুর দেহে মনেও আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল—সে পট্ করে সিধুর হাত ধরে বললে—কি ইশেরা পেলি?

—পেলম।

সেই ঝরনার ধারে এক তীরে বুনোবেড়াল আর খরগোশ মারার কথা বললে—তারপর এই জহর সর্ণার ধারে বসে কালকের জল ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের সেই কামনার কথা জানালে। তারপর সেই বাজ পড়ার কথা বললে—বাজটো পড়ল; সাদা ঝকমকে লাল-পানিতে সব আঁধার লাগল। ফুল পড়ে গেল ধপাস করে। আমি বসে রইলম হে যেমন ছিলম। মনে হল বিজলী যেন আমার ভিতর ঢুকে গেল। ই ইশেরা আমি বুঝছি হে। মরংবোঙ্গা গাছ থেকে মাটিতে নামল। আবার শি ইশেরা দিবে। ধর তু আমার হাতটো চেপে ধর। দেখ সেই বিজলীর তাত তুর হাত দিয়ে তুর ভিতরে সিঁধায়ে যাবে। ঠিক যাবে।

কানু বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে পরম ব্যগ্রতাভরে সিধুর হাত চেপে ধরলে। সিধুও তার দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক দৃষ্টিতে। ঝকমক করছে সিধুর চোখ, আর কেমন ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা মনে হচ্ছে।

কানু অনুভব করলে—হ্যাঁ, সিধুর হাত আগুনের মত উত্তপ্ত। যেন সে তাপ তার ভিতরে ঢুকছে। তারও চোখ দুটো ঝকমক করতে লাগল।

সিধু হঠাৎ বললে—আরও ইশেরা দিবেক বোঙ্গা!

কানু বললে—হঁ হঁ। আমার মনও তাই বুলছেক।

—বুলছেক?

—হঁ। এই আমার বুকে হাত দে দেখ। ধপাস্ ধপাস্ করছে—কতো জোর করছেক দেখ

—হঁ। হঁ।

দুই ভাই দুজনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দুজনেই নীরব নিস্তব্ধ

হঠাৎ সিধু বললে—আমি যাব দাদা। তু যাবি?

—কুথাকে?

—মানকীর খোঁজকে যাব। রুকনী টুকনীর খোঁজ করব।

—কি করবি করে? তারা কিরিস্তান হইছে—

—হঁ। তাদিগে টাঙি দিয়ে কাটব! তারপরে—। স্থির হয়ে চেয়ে রইল সিধু।

কানুও স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—তারপরে?

—ওই সাহেব—যারা উদের—

—হঁ।

—তা—দি—গে কা—ট—ব।—একটু পরে বললে—বুকটা জলে যেছে আমার।

নয়ন পাল আমার যেন ধ্যানভঙ্গ করলে। আমি দেখছিলাম সিধু কাহুকে। কিন্তু নয়ন পাল থামালে। তারপর সে যে-পটখানা দেখাচ্ছিল সেখানা রেখে বললে—এই বাবা পেথম পট শেষ।

আর একখানা পট তুলে নিয়ে খুলে প্রথম ছবিটায় তার হাতের পাঁচনবাড়ীর মত ছোট বাখারির টুকরোটা ঠেকিয়ে বললে—

—এই দেখুন বাবু লিটাপাড়ায় পোটেণ্ট সাহেব—সাঁওতালেরা বলত পাণ্টিন সাহেব—সাঁওতালদের নিয়ে দরবার করছে। তখন এই সাহেবই ছিল সাঁওতালদের হাকিম। বোশেখ মাসে তারা আদর করে জাম খেতে দিয়েছে, সাহেব খাচ্ছে।

"এবে শোন কিছু বলি সাঁওতালী ব্যবস্থা বিলি
সরকারী কানুনগুলি জব্দির মুলকে ছিল চল্।
মেস্তর পাল্‌টিন নাম লোক ভাল গুণধাম
সাঁওতালের দেওয়া জাম খায় আর বলে—কি নালিশ বল্।
বল্ কি নালিশ আছে—পাঠাব সরকারের কাছে—"

শুনতে শুনতে ইতিহাসের পাতা মনে পড়ে গেল। আমি চোখ বুজলাম। ইতিহাসের সে এক সন্ধিক্ষণ। আমার মনশ্চক্ষের সামনে যেন একটা যবনিকা উঠেছিল। বাগনাডিহির সাঁওতালদের বাড়ির আঙিনা এবং নির্জন জহর সর্ণা থেকে জীবনের নাটক এসে প্রবেশ করছিল ইতিহাসের এলাকায়। ইতিহাসের পাতায় স্থান কিসেরই বা নেই। সবেরই আছে সবারই আছে। কিন্তু এই অরণ্যবাসী মানুষ যারা এককালের ঝাপসা হয়ে যাওয়া ইতিহাসের পাতার ইতিহাস থেকে মুছে গিয়ে দেশদেশান্তরে জীবনের জন্য মাটি পাথর অরণ্যকন্দরের নেপথ্য পট-ভূমির মধ্যে বাঘ ভালুক হাতী নেকড়ে সাপের সঙ্গে পৌঁছুল এই সমতল আর পাহাড়ের সঙ্গম এলাকায়। পাহাড়ের কোলে কোলে বসতি স্থাপন করলে—অসংখ্য গ্রাম গড়ে উঠল। গড়লে তারাই। বন কাটলে, সূর্যের আলোকে করলে অবারিত; উঁচু নীচু মাটি কেটে করলে সমতল। পাহাড়ে ঝরনাকে পাথর দিয়ে বেঁধে করলে জলাধার। চারিপাশ থেকে বাঘ ভালুক তাড়ালে। সরীসৃপ মারলে—তাদের হটালে। পাথর কাঁকর মেশানো জমিকে অসুরবিক্রমে কর্ষণে কর্ষণে উর্বর করলে। বাঁশীর সুরে আর মাদলের বাজনায় তুললে দিব্যলোকে মানুষের সাড়া। তারপর প্রবেশ করছে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায়। গৃহের অঙ্গন থেকে জীবনের প্রকাশ্য দরবারে। পুরাণের কর্ণের কথা মনে পড়ল। প্রতিযোগিতার রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করলে। কষ্টিপাথরে খোদাই করা মূর্তির মত সুন্দর সুঠাম সবল-পেশী মানুষের দল এসে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে বিশ্বরঙ্গমঞ্চের এই অংশের দৃশ্যে একটা কিছু ঘটবে। তখন আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন। সত্যই স্বপ্নাচ্ছন্ন।

১৮৫৪।৫৫ সাল। ইংরেজের ভারতবর্ষ জয় একরকম সম্পূর্ণ হয়েছে। লর্ড ডালহৌসী ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে সে কাজ শেষ করে গেছেন। দেশে পুরনো যুগ যাচ্ছে নতুন যুগ আসছে। ওদিকে রেল লাইন বসছে।

তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা একটি প্রদেশের অন্তর্গত। বাংলার মসনদ মুর্শিদাবাদে অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। রাজধানী গেছে কলকাতায়।

সে সময় ভাগলপুর একটি ডিভিশন, বীরভূমের উত্তর পর্যন্ত তার সীমানা। এই এলাকায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য সাঁওতালের গ্রাম।

সুদীর্ঘকাল পূর্বে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চের প্রকাশ্য দৃশ্যপট নগর জনপদ থেকে অরণ্য অন্ধকারে নেপথ্যে জীবনকাল শেষ করে নগর জনপদের প্রত্যন্ত এলাকায় এসে বসেছে এই সব সাঁওতালের দল।

"প্রতি দল যেখানে বাস করিল সেইখানেই ছোট বা বড় গ্রাম গড়িল। তাহাদের একজন দলপতি বা মাঝি বলিয়া মনোনীত হইল।...আবার কতকগুলি গ্রামের মাঝি একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মাঝিকে তাহাদের দলপতি বা পরগনাইত বিবেচনা করিল।...সাঁওতালরা দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালত পছন্দ করে না। তাহারা নিজেরাই দলবদ্ধ হইয়া যাহা বিচার করে তাহাই মানিয়া লয়। মুনসেফ সাবরেজেষ্ট্রার নাই। পরগনাইতরাই সকল কার্য করিয়া থাকে।"

বণিক ইংরেজ সরকার অন্ততঃ নিষ্ফলা বনভূমি থেকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

"সাঁওতালদের বসতি স্থপনের সুযোগ প্রদানের জন্য মিঃ জেমস পোটেণ্ট নামক প্রবীণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন।...সাঁওতালেরা এইবার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসের আশা করিয়াছিল। তাহাদের পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের উপর অন্য কোন সুসভ্য জাতি অত্যাচার করিবে না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল এবং মনপ্রাণ দিয়া কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগের প্রতি কিরূপ অকথ্য অত্যাচারের নির্মম হস্ত তাহাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।"

এসেছিল এরা লাখদরুণে লোক। অরণ্যভূমি তো কম ছিল না। এরা কারও অন্নে ভাগ বসায় নি। নিজেদের অন্ন নিজেরা উৎপাদন করেও আরও অনেক বেশী উৎপাদন করেছে। দুধ ঘিয়ের ভার নিয়ে এসে সভ্য জাতিদের যুগিয়েছে। আর এনেছিল অদম্য প্রাণশক্তি, শ্রমশক্তি।

আমার মন চলে গেল একশো বছরেরও আগে। বর্গী হাঙ্গামার আমলে।

বর্গীরা পশ্চিম উত্তর বীরভূম ও রাজমহলের পথে এই অঞ্চলটাকে বিপর্যস্ত করেছিল। জীবন অনিশ্চিত। দেশ শস্যশূন্য। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে গেছে। তারপর পলাশীর যুদ্ধ—কোম্পানির দেওয়ানী—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। চারিদিক যেন অন্ধকার, গ্রামের পর গ্রাম উৎসন্ন হয়েছে, অরণ্য এগিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আরণ্য অন্ধকারের শ্বাপদ ধর্মও এসেছে। তারপর পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় কোম্পানির সঙ্গে জমিদারের ছোটখাটো সংঘর্ষের মধ্যে মানুষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে। তারপর লেগেছে পাইকদের সঙ্গে। পাইকদের বিদ্রোহের পর দেশে এসেছে একটা শৃঙ্খলা—বানিয়া ইংরাজ শান্তি এনেছিল ব্যবসার জন্যে।

তার ব্যবসা বিচিত্র পথে আসে এদেশের অজানা বাজারে। একদিকে রেল কোম্পানির ব্যবসা অন্যদিকে নীলকুঠি এবং রেশমকুঠির ব্যবসা। নুনের আবগারীর একচেটে ব্যবসা। কাপড়ের তাঁত গেছে। কাপড় আসছে মানচেস্টার হতে। কয়লার খনি খুলেছে। এদেশের লোক ধান চাল তেল মসলাপাতি পাইকারী বিলিতী কাপড়ের আর হাটে তাঁতীর কাছে মোনা গামছা মোটা কাপড়ের দোকান ফেঁদেছে। বড় ধনী যারা তারা নিয়েছে জমিদারী।

এরই মধ্যে রাঁচী হাজারীবাগ থেকে এল এই কৃষ্ণাঙ্গ আদিম অধিবাসীর দল। যারা হাজার হাজার বছরের নির্যাতন ও পরাজয়ের মধ্য দিয়েও দুর্গম অরণ্যের মধ্যে সেখানকার অধিকারী জন্তু-জানোয়ারকে হারিয়ে বেঁচে থেকেছে তারা। আলোর আশায় মানুষের সঙ্গের ভরসায় লাখে লাখে এসে বসত গড়ে বন কেটে বহু কৃষিক্ষেত্র তৈরী করে বসে গেল।

কিন্তু দুটো পুরুষ না যেতে তারা দেখলে, বনের হাতীর পালের আক্রমণ কিংবা নেকড়ের দলের আক্রমণের চেয়েও নিষ্ঠুরতর ভয়ংকরতর আক্রমণে তারা আক্রান্ত হয়েছে।

একদিকে পাদরীরা তাদের জামা কাপড় ও চাকরির জলুসের সঙ্গে তাদের ধর্ম আক্রমণ করেছে। অন্যদিকে দলবদ্ধ নেকড়ের মত এই দিকু অর্থাৎ হিন্দু ব্যবসাদার এবং গৃহস্থদের দ্বারা তাদের সর্বস্ব আক্রান্ত হয়েছে।

প্রথম পুরুষ যে জমি তৈরী করেছিল দ্বিতীয় পুরুষে তার অধিকাংশই কেনারামদের লক্ষ্মীর খাতার হিসেব কুমীর হয়ে গিলেছে; অন্যদিকে তাদের প্রায় অর্ধেক লোক দশ টাকা ধার করে তাদের এক রকম ক্রীতদাস হয়ে গেছে।

নিমু মাঝি লক্ষ্মণ মাঝি হাজারে হাজারে। কতক কতক গ্রামে ভীম মাঝিরা লড়তে গিয়ে মিথ্যা মামলায় বিনা অপরাধে জেলে যাচ্ছে।

বিশু মাঝি লাল মাঝি মানকী টুকনী রুকনীর মত হাজার দরুণে ধর্ম হারিয়ে কাপড় জামা পরে সায়েবদের নোকর হচ্ছে।

মরংবোঙ্গা জহর সর্ণায় কোথাও শালগাছে কোথাও বটগাছের ছায়াতলে বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের উপর বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে।

বাজ পড়ছে বাগনাডিহির বোঙ্গার আশ্রয়স্থল শালগাছের মাথায়।

কচিৎ-দু-চারখানা গ্রামে চুনার মাঝির মত মুর্মুঠাকুরের চেষ্টায় আজও দিকু নেকড়েরা ঢুকতে পারনি গাঁয়ে। পীপড়া গাঁয়ের হাড়াম মাঝি—পাড়ারকেলে গাঁয়ের ভাম পরগনাইত—শিলিংগীর গাঁয়ের মাঝিরা আজও বেঁচে আছে কিন্তু আর বুঝি জীবন থাকে না।

পার্লিন সাহেব ভাল লোক কিন্তু মহেশ দারোগার মত দারোগারা কেনারাম মহিন্দর ভকতের মত দিকুরা তার এক্তিয়ার মানে না। ওদিকে ভাগলপুরের কমিশনার সাদারল্যাণ্ড সাঁওতালদের সত্যকারের প্রজা বানাবার জন্যে তাদের টেনে আনলেন জঙ্গিপুরের মুনসেব কোর্টের আওতায় আর ফৌজদারীতে ফেলে দিলেন ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন।

ভীম মাঝি কেনারাম ভকতের সঙ্গে ঝগড়া করে জঙ্গিপুর মুনসেফের চাপরাশীকে ভাগিয়ে দিয়ে চালান গেল ভাগলপুর জেলে।

পার্লিন সাহেবের কাছে দলে দলে সাঁওতালেরা গিয়ে বললে—সাহেব আমরা কি মরব?

তু বুল ?

পোটেণ্ট সাহেব খবরটা জানতেন না তা নয়, জানতেন। তিনি হিন্দুদের অত্যাচারের কথা জানেন, ক্রীশ্চান করায় এদের মনের যে দুঃখ তাও বোঝেন, আবার রেলের রাস্তাবন্দিতে কণ্ট্রাকটরের ইংরেজ এবং ফিরিঙ্গী কর্মচারীদের এদের নারী নিয়ে বিলাসের কথাও জানেন।

কমিশনার মিঃ সাদারল্যাণ্ডকে সে কথা তিনি বলেছিলেন। কিন্তু মিঃ সাদারল্যাণ্ড অন্ত ধরনের মানুষ—লর্ড ডালহৌসি তাঁর আদর্শ। তিনি বলেছিলেন—আমরা এম্পায়ার গড়তে এসেছি মিঃ পোটেণ্ট। ওই সব ব্ল্যাক নিগারদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ওরা মরবার জন্মেই জন্মেছে এবং অন্যের জন্য খেটে মরবে। আমি হিন্দুদের অত্যন্ত ঘৃণা করি কিন্তু তবু উই ওয়াণ্ট দেম টু সার্ভ আওয়ার পার্পাস। যদি ইংরেজদের এনে এই দেশটা ভরিয়ে দেওয়া পসিবল্ হত তবে ওদের দাম আমার কাছে থাকত না। ক্রীশ্চান করছে সে তো ভাল করছে। ভবিষ্যৎ কালে ক্রীশ্চান হিসাবে আমাদের অনুগত হলে ওদের দিয়ে হিন্দুদের জব্দ করব। আর ওদের মেয়েদের নিয়ে ব্যাচিলর ইংলিশ অ্যাণ্ড অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা এনজয় করে—করতে দাও। এদেশে তারা সেইণ্টের রোল প্লে করতে আসে নি। জান তুমি লর্ড ক্লাইভ ওয়ারেন হেস্টিংস এদের সময়ে হারেম রাখত তারা। বলে হেসে উঠেছিলেন আবার।

মিঃ পোটেণ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু উগ্র এই উপরওয়ালা সিভিল সারভেণ্টটির কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নি। দিয়েছিলেন রাজা হিসাবে কর্তব্যের দোহাই। আর বলেছিলেন—আপনি লর্ডের কথা স্মরণ করুন স্যার।

হেসে উঠেছিলেন সাদারল্যাণ্ড।

বলেছিলেন—রাজার ডিউটি সর্বাগ্রে দেশকে শাসন করা, রাজ্য রক্ষা করা। অ্যাণ্ড লর্ডের কথা—সেটা নট ফর দিজ ব্ল্যাক হিদেনস্। সে সবই ফর হোয়াইট পিপলস্।

শেষে পোটেণ্ট বলেছিলেন—মনুষ্যত্বের দাবিও কি করতে পারে না এরা আমাদের কাছে ?

হেসে সাদারল্যাণ্ড বলেছিলেন—তুমি বড় দুর্বল-হৃদয় পোটেণ্ট। তোমার চার্চ সার্ভিসে যাওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা ভাল, তুমি যখন এত করে বলছ তখন তোমার এলাকায় হোল্ড ওয়ান দরবার। তাদের বল তাদের কি কমপ্লেন্স্ আছে তারা জানাক। আই ওয়াণ্ট রিটিন পিটিশন্স অব কেসেস্। তারপর প্লেস বিফোর মি। আমি তোমাকে নিয়ে কনসিডার করব।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

সাদারল্যাণ্ড হাত বাড়িয়ে দিয়ে পোটেণ্টের হাতখানা ধরে বলেছিলেন—লুক টুওয়ার্ডস সাউথ আফ্রিকা, টুওয়ার্ডস আমেরিকা, টুওয়ার্ডস জামিয়েকা। তার কতটুকু এখানে হয়েছে। আমার বিবেচনায় ওদের অসন্তুষ্ট হবার কোন কারণ ঘটে নি। কারণ স্লাটস্ দেয়ার লট। আমরা স্লেভারি আইনসম্মত করি নাই। তবু তারা যদি হয় তবে লট ছাড়া কি বলব ?

সেই দরবার হবে লিটিপাড়ায়।

সাঁওতালদের পরগনাইতদের কাছে খবর গেছে। পরগনাইত গ্রামে গ্রামে মাঝিদের অর্থাৎ সর্দারদের কাছে নাগরা বাজিয়ে বাজিয়ে গিয়েছে।

"পাল্টিন সাহেব দোরবার করবেক লিটিপাড়ায়। সর্দার মাঝিরা সোব আসবি। সাহেব সবারি কাছে নালিশ শুনবেক। দরখাস লিবেক। দরখাস লিখাঁয়ে লিবি। দিকুদের কাছে গিঁয়ে লিখাঁয় লিস।"

আমার মনশ্চক্ষের সামনে আমি যেন এই সব ছবিগুলি প্রত্যক্ষ দেখছিলাম। গ্রামে গ্রামে জটলা হচ্ছে। সাঁওতালেরা জহর সর্দার পাশে বসে সমবেত হয়ে সর্দারের সঙ্গে কথা বলছে। মুখে চোখে তাদের বেদনা উত্তেজনা আশা নিরাশা মেঘ ও রৌদ্রের মত একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে।

লিটিপাড়ার ভীম সর্দারের ছেলে বসে আছে গুম হয়ে। মধ্যে মধ্যে তার হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠছে। তার নাম অর্জ্জুন—সে বললে—কি কি হবেক? প্যাটমোটা দারোগা কি বুলবেক? বুললে না দি মানে না পাল্টিন না ফাল্টিন কে? বুললে না? ওই দিকু কেনারামের কাছে টাকা খেলেক, বেঁধে নিয়ে গেলে বাবাকে। কোট আদালত, বিচার। কেমুন বিচার দেখলি? বাবা ধান লিলে শোধ দিলে তবু কোট বুললে পাবেক। বিচার!

ফাগু হেমব্রম প্রবীণ মাঝি, ভীমের পরেই সে লিটিপাড়ার মাতব্বর। সে বললে—তেবে করবি কি হে? করতে তো কিছু হবেক?

—হাঁ হবেক।

—সেইটো বুল।

—ঘরে আগুন দিয়া চলে যাব হে।

—যাবি কুথাকে?

হাঁ। যাবে কোথায়? খুঁজে পায় না কোন একটি স্থান যেখানে গিয়ে তারা নির্বিবাদে শান্তিতে থাকতে পারে।

ফাগু বললে—শুন, কথা শুন। দরখাস একটা লিখা। তার পরেতে মুখে বুলব।

—কে লিখবেক? দিকুরা লিখে দিবে? পয়সা লিবে, লিয়ে কিছুই লিখবেক না।

সমস্ত আসরটা নীরব হয়ে গেল। তাই তো।

ফাগু হঠাৎ বললে—আছে হে একজনা। বাঁবড়ে বোঙ্গা (বামুনঠাকুর) বেটে সে। ভশ্‌চাজ। বুড়া ভশ্‌চাজ। রামচন্দ্রপুরে বুড়া ভশ্‌চাজ আছে।

নয়ন পাল বললে—বাবু মহাশয়, ভশ্‌চাজ রামচন্দ্রপুরের ত্রিভুবন ভশ্‌চাজ মশায়। এই দেখুন—

"ভট্টাচার্য ত্রিভুবন তন্ত্রসিদ্ধ মহাজন
ভজন ভূজনে মন দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক রয়—
মা মা বলি গায় গান অশ্রুপূর্ণ দু নয়ান

সরল দয়ালু প্রাণ পাগলা ঠাকুর সবে কয়।
তাঁহারে করিয়া মনে— ফাগুলাল মাঝি ভণে
পাইয়াছি ঠিক জনে—চল সবে তার কাছে যাই।"

বাবু মশাই, এই দেখুন, ভট্‌চাজ মশায়ের ছবি। আমার জ্যেঠা তাঁকে দেখেছিলেন—বলতেন ঠিক তেমনিটি হয়েছে।

বড় বড় চুল দাড়ি গোঁফে ঢাকা শ্যামবর্ণ শক্ত কাঠামো এক ব্রাহ্মণ, চোখ দুটো বড় বড়—টিকলো নাক—মোটা ভুরু—কানের পাশে বড় বড় দু গোছা চুল—গলায় রুদ্রাক্ষমালা—কপালে সিঁদুরের টিপ। প্রসন্ন মানুষ। শরীরখানি বিশাল। দশাসই পুরুষ।

তাঁর বিষয়সম্পত্তি বেশী ছিল না বাবু। বিঘে পনের ব্রহ্মোত্তর জমি। তবে সিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন—শ্মশানে কালীপুজো করতেন আর শিষ্যসেবক সেরে ফিরতেন। কতজন আসত—কেউ কবচ কেউ ঝাড়ফুঁক, কেউ কিছু দিয়েও যেত যে যা পারত—তাতেই সংসার পরিপূর্ণ। চ্যালা ছিলেন আমার ঠাকুরবাবা। আমার ঠাকুরবাবা যে প্রতিমা গড়তেন আর সে প্রতিমা যেখানে ত্রিভুবন ভটচাজ পুজো করতেন সেখানে মা নাকি সাক্ষাৎ আসতেন।

ফাগুলালকে একদিন দয়া করেছিলেন। দয়া তাঁর সবাইকে ছিল। ফাগুলাল আর বিশু, লিটিপাড়ার বিশু মাঝি; বৈশাখ মাস—কোথায় কুটুমবাড়ি গিয়েছিল, ফিরছিল বাড়ি লিটিপাড়ায়। হাঁড়িয়াও খেয়েছিল অনেকটা, পথে ফিরতে ফিরতে দুপুরবেলা রোদে বিশু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। জায়গাটা এমন যে সবটাই কাঁকুরে পাথুরে ডাঙা, একটা গাছ নেই শ'খানেক হাতের মধ্যে। ফাগু এমন মাতাল হয়েছে যে তার ক্ষমতা নেই তাকে কোনরকমে তুলে কোন গাছতলায় নিয়ে যায়। সে বিশু মাঝিকে ডাকছে—উঠ্ উঠ্—বিশু উঠ্। বিশু উঠবে কি, মুখ রগড়াচ্ছে কাঁকুরে মাটিতে—মুখ থেকে বেরুনো গাঁজলার সঙ্গে রক্ত বেরুচ্ছে। ভট্‌চাজ মশায় ফিরছিলেন সেই পথে শ্মশানে তাঁর সাধনপীঠ থেকে তাঁর বাড়ি। ওই শতখানেক হাত দূরেই একটা জোড়ের ধারে শ্মশান। তার পাশে একটা পাথরের ডাঁই চারিপাশে গাছপালা—একটা বৃহৎ বটগাছ—সেই বটগাছতলায় তাঁর আসন, সেখানে এখনও একখানি পাথরে কালীমায়ের পুজো হয় শনি মঙ্গলবারে, অষ্টমী অমাবস্যাতে, তা থেকে আমার গুরুবংশের ভাল আয়টায় হয়।

ভট্‌চাজ মশায় কারণ করে ফিরছিলেন—হাতে একটা বড় ঘটি, আর তালপত্রের ছাতা মাথায়। গান গাইতে গাইতে ফিরছেন মনের আনন্দে। আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালেন ওদের দেখে।

—কি হয়েছে মাঝি?

ফাগু বললে—ধপাস করে পড়ে গেল—আর কি হল! গোঙাইছে। হুইখানে কালী আছে সি বুঝি উকে লিলে। বলে কেঁদে উঠল।

ভট্‌চাজ মশায় বললেন—হয়েছে। সর—দেখি।

বসে বসে তালপাতার ছাতাটা বিশুর মাথার কাছে রেখে তাকে দেখে বললেন—সর্দিগরম হয়েছে মাঝি; একে হাঁড়িয়া খেয়েছিস তার উপর এই বোশেখী রোদ। অসুখও হয়েছে

গলায় গলায়। তা এখানে থাকলে তো মরে যাবে রে। ওকে তোল—তুলে ছায়াতে নিয়ে চল। চল, আমার বাড়ি চল।

ফাগু বিশুকে তুলতে গিয়ে নিজেই পড়ে গিয়েছিল। ভট্‌চাজ তখন 'হয়েছে' বলে নিজেই তাকে তুলে সেই একশো হাত কোনরকমে বয়ে বাড়িতে এনে দাওয়ায় শুইয়ে নিজের কন্যাকে ডেকে বলেছিলেন—একে বাতাস দে মা। একটু ঘাম মরলে জল দে মাথায় মুখে চোখে।

ত্রিভুবন ভট্‌চাজের ওই এক কন্যে ছিল বাবু মশায়—নেহাত বাল্যকালে বিধবা হয়েছিল—লোকে বলত 'কড়ে রাঁড়ী'—বিয়ের তিন মাসের মধ্যে বিধবা হয়েছিল আট বছর বয়সে। এখন তিনি যুবতী—বিশ বাইশ বছর বয়ঃক্রম হবে যখনকার কথা বলছি।

বাপ বেটীতে সাঁওতালদের দুজনকেই পরিচর্যা করে সুস্থ করেছিলেন—সে রাতটাও বাড়িতে স্থান দিয়ে রেখে ভোরবেলা তাদের আঁচলে মুড়ি নাড়ু দিয়ে বিদায় করেছিলেন।

এ ঘটনা, বাবু, লিটিপাড়ায় সাঁওতালদের যে সময়ে মজলিস হচ্ছিল তার দশ বারো বছর আগের কথা। বারশো বাষট্টি সালে সাঁওতাল হাঙ্গামার আরম্ভ—লিটিপাড়ার মজলিস তার মাস দুয়েক আগে বোশেখ মাসে। ওই বজ্রাঘাত আর ঝড়ের কথা বললাম, তার দিন তিনেক পরের কথা।

এই ঝড়ের দিন আর একটি বজ্রাঘাত হয়েছিল বাবু, রামচন্দ্রপুরে ওই কালী থানের পাশে একটি তালবৃক্ষে।

ভট্‌চাজ মশায় তখন আসনে বসে ছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। তিনি কারণ করছিলেন আর মাকে ডাকছিলেন।

ভট্‌চাজ মশায় সংসারে তখন নির্বন্ধন; কন্যেটি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে কোথায়। নানান জনে নানান রকম বলে। ভট্‌চাজের তাতে গ্রাহ্য নাই।

গ্রামে কন্যেটিকে নিয়ে বড়ই ঝঞ্ঝাট করেছিল জ্ঞাতি ব্রাহ্মণেরা। নানান অপবাদে নানান টিটকারি রহস্য করত। ভট্‌চাজ গ্রাহ্য করতেন না। বলতেন—বলগে রে শালারা বলগে—চামড়ার মুখ আর মানুষের জিভ। বাঘের জিভ মাংস কুরে খায় আর গর্জায়, মানুষের জিভ নিন্দে করে আর পা চাটে।

মেয়ে কাঁদলে বলতেন—কাঁদিস কেন ক্ষ্যাপা মেয়ে, যে কাদা তোর গায়ে দেয় সেই কাদা কালীর পায়ে দে। চন্দন হয়ে যাবে। ওরে হারামজাদী তোকে আমি মন্ত্র দিয়েছি তবু তোর এই দুখ গেল না। চণ্ডাল রে ওরা চণ্ডাল। বামুন হয়ে সুদ খায়, লোককে ঠকায়—যে জিভ কালী কালী বলবার জন্যে সেই জিভ দিয়ে পরনিন্দে করে। নিন্দে নয় ও হল বিষ্ঠা—মুখ দিয়ে ওদের বিষ্ঠা ওঠে। করবে কি—মুখের বিষ্ঠা থু করে ফেলতেই হবে—গলগল করে বমি করতেই হবে। তাতে সামনে থাকলে গায়ে লাগবেই। মুছে ফেল মা মুছে ফেল। কিন্তু মেয়ের সহ্য হল না—একদিন গেল বক্রেশ্বর—বীরভূমের বক্রেশ্বর মহাপীঠ—সেইখান থেকে হারাল আর ফিরল না। লোকে মন্দ বললে ভট্‌চাজ বলতেন—যে ভাংটা মেয়ে ভাতারের বুকে পা দেয় সেই জাতের মেয়ে, আট বছরে বিয়ে দিলাম—তিন মাসের মধ্যে ও তাকে খেয়ে

ফেললে—ও হল ধূমাবতী। ভাতারখাগী আপন পথে গিয়েছে। বেশ করেছে। আমাকে পতিত করে কে রে—কোন্ শালা—তার ঘাড়ে ক'টা মাথা। আর করলি করলি—আমার বয়েই গেল!

এই হল ত্রিভুবন ভট্‌চাজ বাবু মহাশয়। এই এঁর কথাই মনে পড়েছিল ফাগুলালের। সে বলেছিল—চল্, ওই ভট্‌চাজের কাছে যাই, উকে বুলি, উ লিখে দিবেক।

ভট্‌চাজ জানতেন।

বলেছি বাবু, ওই ঝড়ের রাতে কালীর থানের শ্মশানে তালবৃক্ষে বাজ পড়েছিল। ভট্‌চাজ কারণ করছিলেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সর্বাঙ্গে তাপ লেগেছিল।

চেতন হয়েছিল মাঝরাতে।

তিনি মাঝরাতে চিৎকার করতে করতে বাড়ি ফিরেছিলেন—আগুন লাগল রে আগুন লাগল! মায়ের হাসি শুনলাম, লক্‌লকে জিভ দেখলাম। আগুন বাজ হয়ে পড়ল তালগাছে।

তিন দিন পর তখন ফাগুলাল মাঝিদিগে নিয়ে তাঁর কাছে এল, তখন তিনি উঠেছেন। কেমন পাগল হয়ে বসে আছে।

"সাঁওতালেরা নম করে, অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে!
বলে, আমি এরই তরে বসে আছি—
আয় তোরা আয়।"

ভট্‌চাজ নাকি বলেছিলেন তোরা তো সব দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করেছিলি! তা তোদের বিরূপাক্ষ কালকেতু কই রে?

ফাগুলাল হাত জোড় করে বলেছিল, আমরা বাবাঠাকুর সাঁওতালরা গো!

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ভট্‌চাজ বলেছিলেন—হ্যাঁ। তাই তো! তু তো সেই ফাগুলাল।

—হেঁ বাবাঠাকুর, আমি ফাগুলাল।

—ভট্‌চাজ স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলেন—বলেছিলেন শান্তকণ্ঠে—আয় আয় আয়। তা কি মনে করে রে? তু তো অনেক দিন আসিস নাই ফাগুলাল।

—হেঁ বাবাঠাকুর, অ্যানেক দিন আসি নাই গ।

—ভাল আছিস? এত দলবল নিয়ে? কি রে? ভূত প্রেত ডান ডাকিন কিছু নাকি?

—না গ তা লয়।

—তবে আমার কাছে? ওই সবের জন্যেই তো লোকে আসে আমার কাছে।

—তার বাড়া গ বাবাঠাকুর। আমাদিগে চুষে খেলেক, পিষে মেলেক—জাত লিলেক, জনম লিলেক; আমরা মরে গেলাম। তু একটো দরখাস লিখে দে।

—দরখাস—দরখাস্ত? কার কাছে রে? বোঙা বাবার কাছে? না আমার মা কালীর কাছে?

—না বাবাঠাকুর, আমাদের সাহেব পাণ্টিন সাহেবের কাছে।

হা হা শব্দে আবার ফেটে পড়েছিলেন ভট্‌চাজ।—পাণ্টিন সাহেবের কাছে? হা হা হা। আমি লিখব?

—আর কেই দিবে না বাবাঠাকুর। 'কাত'রা (কায়েতরা) টাকা নিয়ে লিখে দিবেক কিন্তু যা বুলব তা লিখবেক নাই।

—হুঁ। আবার স্বাভাবিক হয়ে ভট্‌চাজ ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—হুঁ। ঠিক কথা।

দরখাস্ত ভট্‌চাজ লিখে দিয়েছিলেন। ওরা যা বলেছিল তা লিখে দিয়েছিলেন।

সাঁওতালী ভাষায় তারা বলেছিল—ভট্‌চাজ বাংলা অক্ষরে তাই লিখে দিয়েছিলেন।

মনশ্চক্ষের সম্মুখে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চের পট অপসারিত হয়ে গেল। এমন মুহূর্ত মানুষের আসে যখন কানে শোনা গল্প মনের মধ্যে স্পষ্ট ছবি হয়ে ফুটে ওঠে।

লিটিপাড়ায় ইংরেজ বানিয়া সরকারের প্রতিনিধি মিঃ পোটেণ্টের দরবারের জন্ত একখানা ছোট শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। আগ্রা বা দিল্লী অঞ্চলের তৈরী লাল নীল হলদে রঙের ছককাটা শামিয়ানা—চারিপাশে তার ঢেউখেলানো ঝালর। পূর্বদিকের সূর্যের রোদ যাতে এসে রাজপ্রতিনিধির গায়ে না লাগে তার জন্ত সেদিককার আধখানা উপর দিক থেকে ঢাকা—নীচের দিকটা খোলা। একটা চৌকো হাত দেড়েক উঁচু মাটির বেদি তৈরী হয়েছে। তার উপর শতরঞ্জি পাতা। তার উপর কুর্সিতে বসে আছে পাণ্টিন সাহেব। নতুন জাম পেকেছে, তাই সাঁওতালরা আদর করে এনে দিয়েছে—সাহেব তাই খাচ্ছে।

"পাণ্টিন সাহেব নাম লোক ভাল গুণধাম
সাঁওতালের দেওয়া জাম খায় আর বলে কি নালিশ বল্।"

সামনে তিনদিকে হাজার হাজার সাঁওতাল বসেছে। তারা সাহেবের সঙ্গে দরবারে দেখা করতে এসেছে—তাদের পোশাকে আজ বাহার দেখা যাচ্ছে। মাথায় বাবরি চুল আঁচড়ানো—তাতে কেউ বেঁধেছে লাল স্তাকড়ার ফালি, কারও সাদা কাপড়ের ফালি, তার মধ্যে ফুল গোঁজা, পাখীর পালক গোঁজা—ময়ূরের পালক গোঁজা। পরনের কাপড় আজ কৌপিন নয়, খাটো গামছা নয়, ছ-সাত হাতি সাঁওতালী তাঁতে বোনা কাপড়। কোমরে এবং বুকে বেল্‌ট এবং পৈতের ঢঙে আর একখানা চাদর। অনেকের হাতে বালা। গলায় লাল কাচের বা পুঁতির মালা। হাতে তীর ধনুক। কোমরে গোঁজা বাঁশী। সঙ্গে অনেক মেয়েরা এসেছে। দরবারের শেষে সায়েবকে তারা নাচ গান দেখাবে শোনাবে।

প্রথমেই ভট্‌চাজের লেখা দরখাস্ত নিয়ে ফাগুলাল এগিয়ে এল। তার পেছনে ভীমের ছেলে অর্জুন।

ফাগুলাল সেলাম করে বললে—এই লে সাহেব দরখাস। তু বিচার কর।

পোটেণ্ট সাহেব সিভিল সার্ভিসের পুরনো লোক—১৮৬৬ সাল থেকে কাজ শুরু করেছেন—এসেছিলেন বিশ বাইশ বছর বয়সে—আজ ১৮৮৫ সাল—কুড়ি বছর হয়ে গিয়েছে। তিনি বাংলা জানেন। হাতে করে নিয়ে চোখ বুলিয়ে হেসে বললেন—ইটো টো টুরা কিছু লিখলি না। কি বুঝবে হামি? "আমরা মরে গেলাম বাবা পল্‌টিন সায়েব—দিকুরা আমাদিগে চুষে

খেলেক, পিযে মেলেক, পাদরীরা আমাদের জাত লিলেক, ধরম ইজ্জত লিলেক রাস্তাবন্দির সায়েবরা—।" কুঠা কি হয় বুল। টবটো টুড়ণ্ট করেগা।

হঠাৎ একটি তরুণ কণ্ঠে বেজে উঠল—আমার বাবাকে জেহেলে লিয়ে গ্যেল। মিছামিছি জেহেল লিয়ে গ্যেল। ছেড়ে দে। উকে ছেড়ে দে।

—টুমি কে আছ?

—ভীম মাঝির ছেল্যা আমি। তু জানিস ভীমকে।

—হাঁ হাঁ।

—বাবা দিকু কেনারামের কাছে ধান ধার লিলে দশ শলি—সুদ-সমেত দিলেক একশো শলি। দিলে। সব মাঝিদিগে শুধা। কি তুরা বুল।

একসঙ্গে লিটিপাড়ার মাঝিরা বলে উঠল—দিলে দিলে।

—তবু আবার এল—বুললে, আবার দেড়শো শলি দে—

সমবেত কণ্ঠস্বরে বললে—হঁ হঁ। বুললে। বুললে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল আর একজন—গর্ভু মাঝি। তার বাড়ি বারহেটের কাছে। বললে—আমার জমিনগুলান সব লিয়ে লিলে। আমি কিছু ধারি না। তবু লিলে। আমি লিই নাই। তবু জঙ্গিপুরের তুদের মুনসবি প্যায়দা এসে বুললেক—হাঁ তু টাকা লিলি। আদালতের হাকিম বুলেছে তু লিলি। এই লিখে দিছে।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক একজন নয়, দুই তিন চার পাঁচ দশ বিশ পঞ্চাশ একশো পাঁচশো সাঁওতাল উঠে দাঁড়াল। তারা সবাই বলবে। তাদের বুকের তুষানল আজ বাতাসে জ্বলে উঠতে চাচ্ছে। তারা বলবে।

পাণ্টিন উঠে দাঁড়ালেন।—বাবালোক বৈঠ্ যাও, বৈঠ্ যাও। সব বৈঠ্ যাও। সব লোগের বাত হামি শুনবে। একসাথমে নেহি। বৈঠো।

একপাশে বসেছিল বাগনাডিহির চুনার মাঝি। তাদের গ্রামের তরফ থেকে বলবার বিশেষ কিছু নেই। সে বহুকষ্টে তার গ্রামকে দিকুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কোনমতে কাউকে ধার নিতে দেয় নি দিকুদের কাছে। তবু ডাক শুনে এসেছে। বলতে এসেছে—বড় কষ্ট। তারা ঘি বিক্রি করতে গেলে কখনও এক সেরের বেশী হয় না। ধান বিক্রি করতে গেলে ওজনে একমন ভরে না। তাদের ভাল ভাল কাঁড়ার দাম কখনও দশ-টাকার বেশী পায় না। এক সের ঘি বেচে দু সেরের বেশী নুন মেলে না। কেনে কেনে—কেনে তারা পাবে না?

তার পাশে বসেছিল সিধু আর কানু। সে তাদের সঙ্গে আনে নি। রেখে এসেছিল—বারণ করে এসেছিল তবু তারা চলে এসেছে তার পিছনে পিছনে। ভাগ্যক্রমে দেখতে পেয়ে বুড়ো চুনার মাঝি তাদের দুজনকে দুপাশে বসিয়ে রেখেছে। সিধুর হাতখানা সে জোরে চেপে ধরে রেখেছে। কিন্তু সিধু ক্রমাগত বলছে—ছাড় আপা (বাবা) ছাড়। ছেড়ে দে।

—না। বস। হবে। হবে। কিন্তুক তু উঠছিস, সায়েবকে বুলবি কি?

—বোজা যা বলেছে তাই বলব।

—বোঙ্গা কিছু বলে নাই।

—বুলেছে। মানকীর কথা লালের কথা বুলতে বুলেছে আমাকে।

—কি বুলবি? কিরিস্তান তারা হল কেনে?

—তারা কানছেক। আমি শুনছি। কানছেক। বোঙ্গা ইশেরা দিলে। ছাড় আমাকে।

—না। বস্ কর হে।

ওদিকে তখন কোলাহল ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছে। সাহেবের সঙ্গের বন্দুকধারী চারজন হিন্দুস্তানী সিপাহী, জনকয়েক তীরধনুকধারী সাঁওতাল বরকন্দাজ, জনচারেক লাঠিধারী হিন্দুস্তানী বরকন্দাজ উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকছে—বৈঠ্ যাও। বৈঠ্ যাও। বৈঠ্ যাও।

পার্ল্টিন সাহেব চেয়ারে বসবেন এমন সময় একজন সাঁওতাল বেশভূষা তার ধূলিধূসর কিন্তু কিছুটা ভাল—সে বুক চাপড়ে ভাঙাগলায় চিৎকার করে উঠল—আমার ধরম ফিরে দে। আমার বিটী ফিরে দে। আমার ধরম আমার বিটী—দুটো বিটী—টুকনী রুকনী—

বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সে অকস্মাৎ স্তব্ধ হল, তারপর ধড়াস করে আছড়ে পড়ে গেল মাটির উপর।

ফাগু চিৎকার করে উঠল—বিশু—

ছুটে এল ফাগু। ঝুঁকে পড়ল বিশুর উপর—বিশু বিশু, কি হলছেক?

সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। সব মাঝি দাঁড়িয়ে উঠেছে। পার্ল্টিন সাহেবকে ছেড়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বিশুকে। কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না। ফাগু তাকে ডাকছে—বিশু! বিশু!

মিঃ পোটেন্ট হুকুম দিলেন—দরবার উঠাও। বাংলোয় চল। সেখানে আমি রিপোর্ট লিখব বসে।

বন্দুকধারী সিপাহীদের চারপাশে রেখে পোটেন্ট সাহেব চলে গেলেন বাংলোয়।

ফাগু তখনও ডাকছে—বিশু বিশু বিশু! উঠ!

বিশু ক্ষীণকণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে সাড়া দিলে—ফাগু!

—হঁ। কিন্তুক কি বুলছিস তু? কি বুললি?

এবার আবার প্রাণপণে হা হা করে উঠল বিশু এবং তারই মধ্যে বললে—পাদরী সাহেবরা লিলে ধরম। টাকার লোভ দেখালেক। আর রাস্তাবন্দির সাহেবরা লিলে—

কেঁদে উঠল বিশু।

—বিশু!

বিশু বললে—জোর করে ধরে লিয়ে গেল—বাংলাতে ভরলে—

কণ্ঠস্বর তার আরও উচ্চতর হয়ে উঠল—লিলে টুকনীকে রুকনীকে—লিলে মানকীকে—মানকী বহু তাকেও লিলে—

অকস্মাৎ সমবেত জনতার মধ্য থেকে কে একটা চিৎকার দিয়ে উঠল—একটা জন্তুর মত চিৎকার।

—আ—

নয়ন পাল ছবি দেখিয়ে চলেছিল আর ছড়া বলে চলেছিল।—

"সিধুর গর্জন শুনে চমকিল জনে জনে
হাসিয়া নফর ভনে—স্মর, কালকেতু ব্যাধ
করিল গর্জন।"

পট-আঁকিয়ে নফর পালের বিশ্বাস ছিল সিধু সেই কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু ব্যাধ। এটা বলেছিলেন ত্রিভুবন ভট্টাজ।

থাক।

পটের মধ্যে ছবিতে দেখলাম এবং ছড়ায় শুনলাম সিধু গর্জন করে উঠেছিল বিশুর মুখের খবর শুনে। তারা জাত হারিয়েছে। সে সপরিবারে টুকনী রুকনীকে নিয়ে ক্রীশ্চান হয়েছিল, লাল মাঝিও মানকীকে নিয়ে ক্রীশ্চান হয়েছিল। তারা রাস্তাবন্দিতে কাজ পেয়েছিল—ভাল কাজ। ক্রীশ্চান বলে তাদের কোম্পানির সায়েব ঠিকাদাররা ভাল কাজ দিয়েছিল। বিশু আর লাল সর্দারি করত। রুকনী টুকনী মানকী এরা তিনজন করত সাহেবদের বাগানে কাজ। তারা ক্রীশ্চান বলে আলাদা থাকত। সাঁওতাল মুনিষ সেখানে হাজারে হাজারে। তারা থাকে পাতার ঝুপড়িতে আর এরা থাকত তেরপলের ছোট তাঁবুতে।

ওই ঝড়ের দিন যেদিন বাজ পড়েছে বাগনাডিহির জহর সর্দার, রামচন্দ্রপুরের মা কালীর থানের শ্মশানের তালগাছে এবং আরও কত জায়গায়—সেই দিন রাত্রে সেই জল ঝড়ের মধ্যে রুকনী টুকনী আর মানকী তিনজনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে রাস্তাবন্দির সাহেবরা।

সেদিন সন্ধ্যের সময় তিনপাহাড়ীর সাহেবদের বাংলোতে এসেছিল আর তিনজন সাহেব। তারা ওই ঝড়ের সময় বেরিয়ে এসে তাদের তাঁবুতে হানা দিয়েছিল। মদ খেয়ে তখন তারা চুর।

লাল এবং বিশু বাধা দিয়েছিল, কিন্তু ওরা দৈত্যের মত আক্রমণ করেছিল তাদের। বিশুকে মেরেছিল বুটসুদ্ধ লাথি, বিশু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। লাল ধনুক হাতে নিয়েছিল—তাকে এক সাহেব বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরেছে। তারপর রুকনী টুকনী মানকীর মুখ বেঁধে নিয়ে চলে গেছে।

তারপর পড়ল বাজ।

জ্ঞান হয়ে উঠে বিশু লালকে খুঁজে পায় নি। কেউ খবর বলতে পারে নি। লাল কোথায় কেউ জানে না। হয়তো মরে গিয়েছে।

সেই খবর শুনে আবার চিৎকার করে উঠল সিধু। কানু কাঁদল। আর মুর্মু ঠাকুরের বাড়ির কর্তা চুনার মাঝি মাথা হেঁট করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

সাঁওতালেরা সেদিন জটলা করে বলেছিল—চল আমরা ই ভাশ থেকে চলে যাই। থাকব

নাই ই ত্যাশে, খাটব নাই রাস্তাবন্দিতে ; করব নাই দিকুদের গোলামি। পালাই, চ। পালায়ে যাই যি ত্যাশে দিকু নাই, যি ত্যাশে পুড়মান জেট ওই সাহেবরা নাই।

—কুথা সি ত্যাশ কুথা ?

কিন্তু সে দেশের খবর কেউ জানে না। কেউ জানে না।

পাল্টিন সাহেব বাংলো থেকে বেরিয়ে তাদের বলেছিলেন—বাবালোক, হামি টুমাডের সব কঠা কমিশনরকে লিখছি। সবুর করো বাবালোক, সবুর করো।

কথাটা শুনে সকলেই স্তব্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে-স্তব্ধতা আশার প্রসন্ন স্তব্ধতা নয়। সংশয়ে তিক্ত। বহু লোকের মিলিত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ একটা অজগরের গর্জনের মত শুনিয়েছিল।

নয়ন পালের ছড়াতেও তাই আছে—

"সাঁওতালেরা ফোঁসে হায় (যেন) অজগর গরজায়
সিধু কানু দুই ভাই হুঙ্কার করিয়া কহে বাত।"

সিধু বলে উঠেছিল—কি করবি তু সায়েব ? মহেশ দারোগা কালা আদমী মোটাপেটা দিকু—সি বুলে, তুকে সি মানে না। বুলে—পাল্টিন কে বটেক ? উকে আমি মানি না। তার তু কি করলি ?

মিঃ পোটেন্টের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল।

বিশু চিৎকার করে বলে উঠেছিল—তুদের সব ফাঁকি। তুরা দৈত্যি বটিস,—সাদা দৈত্যি। দে আমার দুটো বিটী ফিরায়ে দে, আর এই চুনারের বিটী ফিরায়ে দে। দে রুকনী টুকনী মানকীকে ফিরায়ে দে—এখুনি দে। তু খত লিখবি তারপরে সি কবে তখন জবাব আসবে আমাদের বিটীগুলাকে সাহেব তিনটে—

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল চুনার।

এর দিন বিশেক পর।

নয়ন পাল ছড়ায় বললে—

"চুনারের মৃত্যু হৈল শ্রাদ্ধ আদি শেষ কৈল
তারপর বার হৈল দুই ভাই বিশ দিন বাদ—"

কুড়ি দিন পর। নয়ন পালের পটে দেখলাম একটা ছবি।

সে ছবি আমার মনশ্চক্ষের সামনে যেন অতীতের যবনিকা তুলে দিল। ১৮৫৪।৫৫ সালের এদেশের জ্যৈষ্ঠ শেষের রোদে পোড়া লাল মাটি ভেসে উঠল। মধ্যে মধ্যে শালগাছের ঝোপ-ভরা খানিকটা জায়গা—তারপর খানিকটা শালবন—তারপর শুধু প্রান্তর—মধ্যে মধ্যে গ্রাম, আবাদী জমি—তার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে লাল কাঁকুরে মাটির উপর গরুর গাড়ির চাকায় গরু বাছুরের পায়ের ক্ষুরে মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি লাল ধুলাচ্ছন্ন পথ। বৈশাখে সেই ভয়ংকর কালবৈশাখীর পর আরও একটা দুটো ঝড় হয়েছিল। তারপর দ্বাদশ সূর্যের উদয়ে পৃথিবী যেন ঝলসে গিয়েছে। লাল ধুলো উড়ছে ঘূর্ণির পাকে পাকে।

ভরা দুপুরে তিনজন সাঁওতাল চলেছে হনহন করে। মাথায় সাদা মোটা কাপড়ের পাগড়ি, পরনে মোটা সাঁওতালী তাঁতের কাপড়, বুকে একখানা চাদর কোমর এবং বুক জড়িয়ে বাঁধা। কাঁধে টাঙি ধনুক এবং শানানো ঝকঝকে তীরের গোছা। এবং কোমরে বাঁধা একটা পুঁটুলি।

চলেছে দীর্ঘ সবল পদক্ষেপে। একটু ঝুঁকে পড়েছে সামনে। যেন মনের গতির সঙ্গে ঠিক চলতে পারছে না। যাবে তারা তিনপাহাড়। সিধু কানু আর বিশু। সিধু কানু প্রতিজ্ঞা করেছে জহর সর্গায় অর্থাৎ দেবস্থানে ওই তিনটে মেয়েকে তারা ছিনিয়ে আনবেই। আর ওই সাহেবদের উপর শোধ নেবেই। জান কবুল।

চলেছে তারা হিরণপুরের হাট হয়ে পাকুড়ের পথে। সেখান থেকে পীরপৈঁতি হয়ে তিনপাহাড়। এইখানেই রাস্তাবন্দির কাজ চলছে। সাহেবদের একজন থাকে পীরপৈঁতিতে, একজন থাকে পাকুড়ে, একজন থাকে তিনপাহাড়ের কাছে। তিনপাহাড়ে কয়েকজনই সাহেব থাকে। তাদের কাছেই এ সাহেব তিনটে থাকে। তারা খুঁজতে খুঁজতে যাবে।

বিশু বলেছে—হয়তো উরা এক একজনা এক একটাকে লিয়ে আটক করে রাখছেক।

তিনজনেই নির্বাক। বুকে আগুন জ্বলছে।

পথে পড়ে রামচন্দ্রপুর, রাস্তা থেকে একটু দূর। বিশু বললে—আয়, বাবাঠাকুর বলিছে উয়ার সাথে দেখা করতে। উয়ার মতুন বাঁবড়ে ঠাকুর দেখিস নাই। উ আমাকে একবার বাঁচালছিল। উ কালীসিদ্ধ বটে। উয়ার বিটীর যে কি হল? কেউ জানে না। সিও ওই ঝড়ের দিন বেটে। উর বিটী ঘর থেকে চলে গেইছিল সন্নেসী হঁয়ে। তাঁকে চিনতম। রাঁড় বিটী বেটে। ছুটুবেলাতে রাঁড় হইছিল। বজ্জাত দিকুদের খারাব কথাতে ঘর থেকে চলে গেইছিল। হদিস ছিল নাই। আমরা যখন গেলম তিনপাহাড়ে খাটতে, তখন দেখলম বনের ধারে একটো গাঁয়ে কালী ঠাকুরের ঘর গড়ে পুজো করেক। বাবার মতুন হইছে বিটাটো। লোকে বলে মা ভৈরবী। কালী কথা বলে তার সাতে। সেই ঝড়ের রাতে কি হয়েছিল কে জানে, সোকালে লোকে দেখলেক ঠাকুর ভেঙে পড়ে রইছে—মা ভৈরবী হাঁরায়ে গৈছে। কুথাও নাই। বাঘে লিলেক কি কি হল খবর হল নাই। কত খুঁজেছে লোকে তা পায় নাই। যখন আমি তিনপাহাড় থেক্যা লিটিপাড়ায় এলম সিদিন বাবাঠাকুরকে হুইখানে হুই যে ঝোঁপটো উইখানে উর দেবতা থান—সেই গেলম উকে বললম। বললম ঠাকুর তুর বিটীকে বাঘে খেলেক—আমার দুটো বিটীকে সায়েবে লিলে। কি করব ঠাকুর তু বুল, বুলে দে।

ঠাকুর খানিক চুপ হয়ে বসে রইল—তারপরে বললেক—দাঁড়া বিশু, আমি মাকে শুধাই। খড়ি পেতে দেখি। আর কাঁদি রে এখন। আমি এখন কাঁদি। তুঁ আজ যা। আজ যা। ইয়ার পরে আসিস। কিন্তুক আসিস। তো চ, বাবাঠাকুরের কাছে হঁয়ে যাই। উয়ার সঙ্গে দেবতার কথা হয়।

কানু বললে—সি সিধুর হলছে।

সিধু বললে—না। হবে। হয় নাই। হবেক—আমি জানি। ইশেরা আমার

মিলছে। আমার মন বলছেক।

—তেবে চল সিধু একবার বাবাঠাকুরের কাছে চল। সি অ্যানেক জানে রে। বুলে দিবেক। ঠিক বুলে দিবেক।

—চল তেবে।

নয়ন পাল গাইলে—

"তন্ত্রসিদ্ধ ত্রিভুবন একদৃষ্টে তাকায়ে রন
সিধু কানু দুইজন ভাইদের পানে।"

সিদ্ধাসনের বেদির উপর বসে দীর্ঘাকৃতি, রোদে পোড়া গায়ের রঙ, বড় বড় রাঙা চোখ, দাড়ি গোঁফ চুলওয়ালা ত্রিভুবন ভট্চাজের সে দৃষ্টি দেখে বিশু ভয় পেয়েছিল। কিন্তু সিধু কানু ভয় পায় নি।

বলেছিল—এমন করে তাকায়ে রইছিস কেনে ঠাকুর?

বিশু হাত জোড় করে বলেছিল—বাবাঠাকুর, ইয়ারা ভাল লোক গ। বোঙ্গার ইশারা মিলছেক ইয়াদের। বাবাঠাকুর—

নয়ন পাল গাইলে—

"দিব্যদৃষ্টি ত্রিভুবন, উঠিয়া দাঁড়ায়ে কন—
চণ্ডীর স্নেহের ধন আয় তোরা আয় বুকে আয়।"

তিনি নাকি তাদের কালকেতু আর বিরূপাক্ষ বলে চিনেছিলেন। ওই ঝড়ের রাতে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন চণ্ডীর কাছে। এবং বলেছিলেন—তুদের লেগে বসে আছি রে আমি। সেই ঝড়ের রাত থেকে। আজ আলি, আয়—আয়। ওরে যে তোদের মরংবোঙ্গা সেই আমার ভাংটা বেটী! কালী মা! হাঁ রে। তেমনি তোদের চেহারা বটে! বটে! লে—তোদের লেগে আমি কবচ নিয়ে বসে আছি—

গোল তামার কবচ—গাড়ির চাকার মত, মধ্যখানে একটা ছিদ্র—তাতে চণ্ডীর বীজ লেখা—সেই কবচ তাদের হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন।—যা তোরা দিগ্বিজয় করবি। আমি শুনেছি রে লিটিপাড়ায় যা হয়েছে শুনেছি। মা আমাকে স্বপ্ন দিয়েছে। ঝড় উঠেছে বাজ পড়েছে, তোদের নাচবার সময় হয়েছে। নাচ গা তোরা।

'চণ্ডী দেন শক্তিপ্রসাদ নাহি ভেদ বামুন ব্যাধ
দেবাসুর—এ আস্বাদ যার পুণ্য সেই জন পায়।
যে করিবে অত্যাচার পতন হইবে তার
পীড়িত সন্তানে মার করুণা যে বর্ষিছে সদাই।"

সিধু তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল স্থিরদৃষ্টিতে। সে বলেছিল—হাঁ ঠাকুর, আমাদের বোঙ্গাও তাই বুলছে। আমার মন বুলছে। কি দাদা হে, বুলে না?

কানু বলেছিল—হঁ, বুলছেক বুলছেক। যিদিন থেকে শুনছি মানকী টুকনী ফকনীর কথা, সিদিন থেকেই বুলছেক।

শুনতে শুনতে আমার মন চলে গেল ইতিহাসের পাতায়। হাণ্টার সাহেবের বিবরণে আছে—। থাক থাক, ইতিহাস থাক।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ—সারা ইউরোপের মানুষ তখন সামান্য অমঙ্গলের চিহ্ন দেখলে গায়ে ক্রশ আঁকে। ক্রায়েস্টের নাম করে। বুকে ক্রশ ঝুলিয়ে রাখে। তাতে বল পায়।

না, সে চিন্তারও অবকাশ নেই। নয়ন পাল ছড়ায় গল্প বলে চলেছে—সেই ছড়ার ছবি পটে ফুটেছে, ছবিতে দেখলাম, বুকের জ্বালায় প্রচণ্ড ক্ষোভে তিনজন তারা চলেছিল পাকুড়ের পথে। ঠাকুর কবচ দিয়েছেন সিধুকে কানুকে—বিশুকে দেন নি। বিশু চাইতে ভরসা পায় নি। সে ক্রীশ্চান হয়ে গেছে। নিজের ধর্মকে ছেড়েছে, নিজের মনেই তার অপরাধের সীমা নেই। কিন্তু বুকের আগুন তার সমান জ্বলছে। অশুশোচনা তাকে নিরন্তর যেন দাউদাউ করে জ্বালাচ্ছে।

গতি তাদের দ্রুত থেকে যেন দ্রুততর হয়ে উঠছে।

হিরণপুরের হাট পর্যন্ত দুধারে সাঁওতাল গ্রামের মানুষেরা বটগাছের তলায় জটলা করছে। শালপাতায় সংকেত এসেছে তাদের কাছে।

লিটিপাড়ার মজলিসের পর আরও মজলিস হয়েছে। সে মজলিস থেকে এই শালপাতা পাঠিয়ে গ্রামে গ্রামে জানানো হয়েছে।—

"দিকুদের কাছে কেউ যেন টাকা ধান ধার না নেয়। তারা মানুষ নয়—বাঘ। তারা খেয়ে নেবে।

জমির খাজনা কোন সাঁওতাল যেন মহিষের হালে আট আনা আর গরুর হালে চার আনার বেশী না দেয়।

ক্রীশ্চান পাদরীদের কথায় কেউ যেন ক্রীশ্চান না হয়। সাদা পুড়মান জেটেদের কাছে সাবধান। তারা সাঁওতালদের কুড়িদের কেড়ে নিবে।

সব সাঁওতাল যেন আপন আপন ধনুক শক্ত করে।

কাঁড়গুলি শানিয়ে রাখে। নতুন কাঁড় তৈরী রাখে।

বোঙ্গা কথা বলবেন। শীগগির কথা বলবেন।"

সিধু কানু বিশুকে দেখে তারা ডাকে।—কুথা যাবি তুরা? তুরা কুন গাঁয়ের বেটিস?

সিধু কানু বিশু দাঁড়িয়ে বলে—দাঁড়াবার বেলা নাই হে! অ্যানেক দূর যাব হে!

—কুথা হে?

—অ্যানেক দূর। অ্যানেক দূর। অ্যানেক ঠাই।

—সাবধানে যাস গ। দিকুরা সব গরম হইছে। তারা শুনেছেক কি সাঁওতালেরা চুলবুল করছেক। মহেশ দারোগা গাঙারছে বাঘের মতুন। বুলছে ধরব আর জেহেল দিব।

সিধু শক্ত হয়ে ওঠে। কানু ভাইয়ের দিকে তাকায়। বিশু মৃদুস্বরে বলে—সিধু কানু

চল হে! ইখানে কিছু লয় হে!

আরও কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াল বিশু।

সিধু বললে—দাঁড়ালি কেনে?

—হুই পাকুড়!

—হুই পাকুড়?

—হঁ। পাকুড়ে ঢুকব নাই হে এখুন।

—ঢুকবি না? তবে আলি কেনে?

—চুপ কর হে। কথা শুন আমার। উখানে দিকুরা আছে। রাঙ্গারা আছে। সাহেব থাকে। চাপরাসী থাকে। দেখে যদি চিনে ফ্যালে আর তুরা যদি রাগ সামলাতে লারিস তবে সব মাটি হবেক।

—না কিছু করব নাই। চল।

—না সিধু। তুর মুখ দেখে ভয় লাগছেক। চল এখুন ওই বনে ঢুকি। বুঝলি! রাতকে আঁধারে আঁধারে পাকুড় ঢুকব। তারপরেতে খবর লিব। সায়েবের আস্তানা আমি চিনি। ইখানে রাস্তাবন্দির মাঝিদিগে চিনি। রাতে গিয়া শুধাব।

—হঁ। তেবে তাই চ।

তারা বাঁ দিকে উত্তর মুখে পাতলা শালবনটার মধ্যে দিয়ে যে পায়ে চলা পথটা চলে গেছে সেই পথ ধরলে।

গভীর রাত্রি। অন্ধকার পক্ষ। অরণ্যের অন্ধকার গাঢ়তর; যেন চামড়ার মত পুরু। বড় বড় গাছগুলোর উপরের ডালপালা পাতার তলায় ছোট বড় গাছগুলোর গুঁড়িগুলোকে অন্ধকারে গড়া স্তম্ভের মত মনে হচ্ছে। বনটা থমথম করছে। সে এক বিচিত্র থমথমে ভাব। কারণ অজস্র ঝিল্লীর শব্দতরঙ্গ অবিচ্ছিন্ন অবিরাম একটানা বয়ে যাচ্ছে শব্দের ঝরনার মত। তবু মনে হবে—মানুষের মনে হবে কি নিদারুণ স্তব্ধতা।

মধ্যে মধ্যে কচিৎ ডেকে উঠছে কোন জানোয়ার। বাঘ এ অঞ্চলে বড় নেই। আছে চিতাবাঘ ঝিঙেফুলি। চিতার অধিকাংশই গোবাঘা। ঝিঙেফুলিগুলো বড়—তারা মানুষ মারে। বড় বড় মহিষ মারে। তারই একটা আধটা ডেকে উঠছে।

কখনও ডেকে উঠছে হরিণ। কখনও তাদের ছুটে চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর শব্দ উঠছে ঝরনার। পাহাড় থেকে ঝরনা ঝরে পড়ছে কোথাও কোথাও।

নীরন্ধ্র অন্ধকার।

এই নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে বনের গভীরতম অংশে কোথাও একটা আগুন জ্বলছিল।

আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে সেই আলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল—আমি অগ্রসর হয়ে চলেছিলাম। অনেক পিছনে ফেলেছি আমি সিধুকে কানুকে বিশুকে।

তারা আশ্রয় নিয়েছিল বনের প্রান্তে। রাত্রে গিয়ে সন্ধান নিয়ে আসবে। খবর নিয়ে আসবে এখানকার বাংলোয় সাহেব কোন মেয়েকে রেখেছে কি না।

কিন্তু গিয়ে খবর এনেছে—না। এখানে নেই।

সে নিশ্চিত জেনেছে। সায়েব এখানে এনেছিল একটা মেয়েকে কিন্তু সে আর নেই। সায়েব গেছে তিনপাহাড়ী।

আমার মন তাদের পিছনে রেখে অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে এই অগ্নিশিখার আকর্ষণে এগিয়ে চলেছে।

একটি ঝরনার পাশে পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা। সেই গুহার সামনে একখানা অল্প ঢালু প্রশস্ত পাথরের উপর একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে।

সামনে বসে একজন ভৈরবী। আগুনের কুণ্ডের সামনে বসে তিনি আহুতি দিচ্ছেন আর মন্ত্রপাঠ করছেন মনে মনে। ঠোঁট দুটি নড়ছে।

খানিকটা দূরে একটি আশ্চর্য সুষমাময়ী কালো কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তির মত একটি মেয়ে। একদৃষ্টে সে দেখছে এই ক্রিয়াকাণ্ড। দীর্ঘাঙ্গী। আয়ত চোখ। চুলগুলি খোলা এবং রুক্ষ। চুল ঘন—কপাল পর্যন্ত ঘিরে তার বিস্তৃতি কিন্তু দৈর্ঘ্যে খাটো, তার জন্যে ঝাঁকড়া হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

ক্রিয়ার ক্রমে আহুতি দেওয়া স্থগিত রেখে ভৈরবী বললেন—রুকনী!

কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটি বিশুর মেয়ে রুকনী। রুকনী চমকে উঠল—তারপর বললে—হঁ—

ভৈরবী বললেন—ডাক লালকে।

রুকনী অনুচ্চকণ্ঠে ডাকলে—দাদা হে!

গভীর জলে যেন একটা ঢিল পড়ল। অরণ্যের সেই বিচিত্র স্তব্ধতা যেন শব্দটির পরই প্রতিধ্বনির গোলাকার তরঙ্গ তুলে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে, দূর দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

নয়ন পালের পটে সেই ঝড়ের রাত্রে তিনপাহাড়ীর ক্রোশ দুয়েক দক্ষিণে গ্রাম প্রান্তের কালীতলায় সেই ভেভিল ডিউইর সঙ্গে দেখেছি এই ভৈরবীকে।

ভেভিল ডিউই সেই দুর্যোগের রাত্রে এই আশ্রয়দাত্রী অসহায়া সন্ন্যাসিনীর উপর, বাঘ যেমন করে হরিণীর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে—তেমনি করেই লাফিয়ে পড়েছিল।

ত্রিভুবন ভট্টচাজের নিরুদ্দিষ্টা বালবিধবা মেয়ে।

নয়ন পাল বলেছিল—মেয়েটির নাম ছিল শ্যামাময়ী। বালবিধবা মেয়েটিকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে ভট্‌চাজ বলেছিলেন—এই মন্ত্র জপ কর। তুই যে ধূমাবতী হবি আমি জানতাম। তোর রাশিচক্র বিচার করে দেখেছি। তা কি করাব! বামুনের মেয়ে। এই তোর ইহকাল—এই তোর পরকাল।

সেই পরকালের পথে সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হয়েছিল লোকনিন্দার জ্বালায়। ঘুরতে ঘুরতে ওই গ্রামটির প্রান্তে ওদের গ্রামের কালীস্থানে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামের লোক ভৈরবীকে পেয়ে খুশী হয়েছিল ভৈরবীর মতিগতি রকমসকম দেখে। কয়েক দিনের মধ্যেই স্থানটিকে ঝাঁটপাট দিয়ে এমন মনোরম ক'রে তুলে তারা বলেছিল—মা, এখানেই তুমি থাক।

তারাই গড়ে দিয়েছিল ঘর, চালা।

যে শিলাখানিকে আগে মা কালী বলে পূজা করা হত ঘরের মধ্যে সেখানিকে রেখে ভৈরবী তার পাশেই মাটির কালীমূর্তি তৈরী করিয়ে রেখে নিত্য পূজা করতেন। প্রথম বৎসরই যে মূর্তি কালীপূজার সময় তৈরী করিয়েছিলেন তাকে আর বিসর্জন দেন নি। বেশ আনন্দেই ছিলেন।

হঠাৎ জীবনে সেদিন সেই প্রাকৃতিক উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্যে তাঁর জীবন যেন ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গেল।

সেদিন ভৈরবীর চেতনা হয়েছিল রাত্রি দ্বিপ্রহরে শিবারবে। তখন চারিদিক দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। খোলা ঘরটার ভিতরের প্রদীপটা উতলা বাতাসের ঝাপটায় নিভে গেছে। ভৈরবী উঠে বসলেন। বসে রইলেন কিছুক্ষণ। মাথার ভিতর কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতা রয়েছে। মনে হল দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোধগম্য হল যে, না, স্বপ্ন নয়। সব সত্য। নিষ্ঠুর সত্য। তিনি পড়ে আছেন সেই চালাটার মধ্যে। আশে পাশে হাত বুলিয়ে দেখলেন। কিছু পেলেন না। ভিজে সব ভিজে। বৃষ্টির ঝাপটায় সব ভিজে গেছে। তাঁর পরনের কাপড় ভিজে গেছে। সমস্ত দেহে একটা অবসাদ যেন তাকে দুর্বল করে ফেলেছে। পিঠের দিকটায় যন্ত্রণা অনুভব করছেন। মনে পড়ল পশুটা যখন তাঁর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তখন পাথরের খোঁচায় আঘাত লেগেছিল। মুখে হাত বুলোলেন—ফুলে উঠেছে কপাল এবং নাকের পাশটা। বর্বর দৈত্যটা তাঁকে ঘুষি মেরেছিল।

অকস্মাৎ তিনি আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন। হা হা শব্দের ধ্বনি শিবারবের শেষটুকুর সঙ্গে মিশে মিলিয়ে গেল। মাথার উপরে গাছের শাখাপল্লবের মধ্য থেকে কয়েকটা বাদুড় শব্দ করে পাখা ঝাপটে উড়ে গেল।

তারপর তাঁর কান্নায় ভাষা ফুটল—এ কি করলি মা?

কিছুক্ষণ কেঁদে ক্লান্ত হয়ে স্তব্ধ হলেন। তারপর উঠলেন। অন্ধকারের মধ্যেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন। অন্ধকার যত ঘন হোক মানুষ চোখ বন্ধ করে বা হতচেতন হয়ে যখন থাকে তখন সে নিবিড়তম অন্ধকারে দৃষ্টি হারায়, প্রকৃতির অন্ধকার তার থেকে অনেক কম ঘন।

মৃত্যুর অন্ধকার আর সৃষ্টি-জগতের রাত্রির অন্ধকারে অনেক প্রভেদ। রাত্রির অন্ধকার—হোক অমাবস্যা—আকাশে নক্ষত্র থাকে; অন্ধকারের মধ্যে গাছপালা পাথর জমাট অন্ধকারের মত নিজের অস্তিত্বকে দৃষ্টির সম্মুখে জানিয়ে দেয়; আকাশে মেঘ থাকলেও মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আভাস চকিত দীপ্তিতে সব কিছুকে ভাসিয়ে দেয়। মৃত্যু বা হতচেতনার মধ্যে চোখের পাতা নেমে আসে—তার মধ্যে কিছু নেই। ঘুমের মধ্যে থাকে স্বপ্ন—হতচেতনার মধ্যে মৃত্যুর মধ্যে অন্ধকার স্বপ্নহীন—কালো কষ্টিপাথরের দেওয়ালের মত। সেই অন্ধকার থেকে রাত্রির অন্ধকারে চেতনা পেয়ে চোখ মেলে তিনি সব দেখতে পাচ্ছেন। সেই পশুটা নেই সে তিনি প্রথমেই দেখেছেন। তারপর মনে হল সে কি মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে?

উঠলেন তিনি। ধীরে ধীরে তাঁর শোকার্ত হতাশা অসহায় বেদনা কেটে গিয়ে জেগে

উঠতে লাগল একটা ক্রোধ একটা হিংসা। নেমে এলেন তিনি ওই চালাটা থেকে। তারপর সন্তর্পণে গিয়ে কালী ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন দরজাটা খোলা হাঁ-হাঁ করছে। ভিতরটা বাইরের অন্ধকার থেকে গাঢ়তর। ভৈরবী একখানা ভারী ওজনের পাথর তুলে নিয়ে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ঘরের চারিপাশে খুঁজছেন তিনি। ওই কি! ওই সে! দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে—

মুহূর্তে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পাথরটা তুলে মেরেছিলেন—পরক্ষণেই নিজে চিৎকার করে উঠেছিলেন—মা—

খেয়াল হয়েছিল—কালীমূর্তি! কালো নিবিড়তম তমসার পুঞ্জীভূত আদ্যাশক্তির মূর্তি যে! কালীমূর্তিটিও সশব্দে ভেঙে পড়েছিল—তিনিও আবার পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

আবার চেতনা হয়েছিল শেষরাত্রে। তৃতীয় প্রহরের শিবারব তখন সদ্য শেষ হচ্ছে। এবার অনুভব করেছিলেন মাথায় নিদারুণ যন্ত্রণা। হাত দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন মাথাটা ফেটে গেছে পাথরে লেগে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন—তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে জগৎ সংসার অতীত বর্তমান যেন মধ্যে মধ্যে হারিয়ে সব যেন ভুল হয়ে যাচ্ছিল। একটা আশ্চর্য শূন্যতার মধ্যে হতবাক হতচেতন হয়ে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে একবার চেতনা ফিরে পেয়ে হাতড়ে খুঁজে চকমকি ঠুকে তাতে গন্ধক-লাগানো পাতকাঠি ধরিয়ে প্রদীপ জেলেছিলেন। তারপর ভগ্ন কালীমূর্তির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে নিজের ত্রিশূল আর ঘটের তলা থেকে তাঁর সাধনার তামার তৈরী চক্রটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কালীস্থান থেকে। আকাশে তখন মেঘ কেটে গেছে। পশ্চিম দিগন্তের এক প্রান্তে সামান্য দীপ্তির একটি আভাস ফুটে উঠেছে—তিথিতে আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। এ আভাস কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদের। মাত্র দু দণ্ড রাত্রি আছে আর। তিনি পথ ধরেছিলেন সেই বনের দিকে যে বনটায় কাল ডিউই শিকার করতে গিয়েছিল।

ওই বনের মধ্যে দিয়েই পূর্বমুখে পথ ধরবেন; যেতে যেতে নিশ্চয় মিলবে গঙ্গার তীর। পাড়ের উপর থেকে 'নাও মা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

সারা দেহে তাঁর পশুর পাশব অত্যাচারের অবর্ণনীয় জ্বালা! মধ্যে মধ্যে আপনার অজ্ঞাতসারে চিৎকার করে ওঠার মত চিৎকার করে উঠেছেন—আঃ—মাঃ—আঃ! মা মা! আঃ—

গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরা কিন্তু তাঁর হয় নি। যেতে যেতে আবার নিবিড় বনের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। মাথার যন্ত্রণায় মানসিক দাহে অনিয়মে অনাহারে একটা গাছের তলায় শুয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

জ্ঞান যখন হল তখন দেখলেন তাঁর পাশে একটি সাঁওতাল মেয়ে, একটি পুরুষ।

লাল মাঝি আর রুকনী।

লাল মাঝি মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য—কিন্তু মাঝি তখনও

পড়ে রয়েছে অজ্ঞান হয়ে। লালের মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল। কিন্তু তাতে তার গ্রাহ্য ছিল না। মনের মধ্যে ঝড় বইছে—বুকে জ্বলছে আগুন! মানকী রুকনী টুকনী।

ওই পুড়মান জেটেরা জোর করে নিয়ে গেল তাদের। তাদের উপর—। হে মরংবোঙ্গা—হে বাবা ঈশা—হে মা মেরী—তার মানকী রুকনী টুকনীকে ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে! ওই দত্যির মতুন সাদা মানুষগুলা তাদের উপর বাঘের মতুন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদিকে খেয়ে ফেলছে। পাহাড়ী চিতির মত দুই হাতে জাপটে ধরে পিষে—। আ হা হা! হে বোঙ্গা!

ভাবতে ভাবতে সে ক্ষেপে উঠেছিল। বাঘের বাঘিনীকে তীর বিঁধে মারলে যেমন বাঘ ক্ষেপে ওঠে তেমনি ক্ষেপে উঠেছিল। বাঘের মতই সন্তর্পণে সে বেরিয়ে পড়ে সাহেবদের বাংলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। কোথায় কান্নার শব্দ উঠছে! কোথায় আর্ত চিৎকার উঠছে! কোথায়!

অবিরাম অশ্রান্তভাবে সে শুধু বাংলোগুলোর চারিপাশে পাক দিয়ে ফিরছিল।

হঠাৎ একটা বাংলো থেকে, তখন প্রায় শেষ রাত্রি, একটা মূর্তি দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল ঝড়ের মত।

লাল কাঁড় জুড়েছিল ধনুকে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সে চিনতে পেরেছিল—লম্বা একটি কালো মেয়ে।

কে? কে? লাল মাঝি চাপা গলায় ডেকেছিল—মানকী!

থমকে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ ভঙ্গি শুনে সে বুঝতে পেরেছিল, যে ডাকছে সে তার স্বজাত। পরমুহূর্তেই ঠাওর করে নিয়েছিল সে কে। মানকীর নাম ধরে ডাকছে যে, সে নিশ্চয়ই লাল। হাঁ, লাল মাঝি—তার দাদাই বটে।

আবার লাল ডেকেছিল—মানকী!

—আমি রুকনী।

রুকনী তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।—দাদা!

—রুকনী!

—হাঁ। আমি সায়েবটাকে খুন করে পালায়ে এঁইছি। দত্যিটো আমার—। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

—চুপ কর। উরা কুথা?

—মানকী টুকনীকে নিয়ে গেইছে সেই সায়েব দুটো, যারা রাজমহলের কাছ থেকে আইছিল তারা। তু আমার পথ ছাড় দাদা, সায়েবটা মদ খেয়ে ঘুমাইছিল—আমি তার কিরিচটো নিয়ে বুকে ভ্যাঁক করে বিন্ধা দিলম—আবার বিন্ধলম—আবার দিলম—এই হাত লহুতে আমার সব ভিজে গেইছে। এই দেখ কিরিচটো। কেউ জাগবে আর দেখবেক তো—।

বলতে হয় নি, সেই মুহূর্তে উঠেছিল কুকুরের ডাক।

কুকুরটা টের পেয়েছে। ঘেউ ঘেউ শব্দ করছে। বেরিয়ে আসবে এখুনি—ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের উপর।

তারা দুজনে ছুটেছিল। কিন্তু কুকুরের ডাক এগিয়ে আসছে। লাল বলেছিল—বস্ রুকনী, এই গাছটোর আড়ে বস্। আসুক শালা, কাঁড়ে বিঁধব।

লাল বসেছিল ধনুকে কাঁড় জুড়ে, আর রুকনী তার পিছনে কিরিচটা ধরে।

প্রতিহিংসায় অর্জর সাঁওতাল জোয়ান—তার হাত কাঁপে নি, বুক কাঁপে নি। কুকুরটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বিঁধে দিয়েছিল। আর্ত চিৎকার ক'রে কুকুরটা ছটফট করছিল। অত্যাচারিতা সাঁওতাল মেয়ে সদ্য একটা খুন করে এসেছে—তার মাথায় খুন ঘুরছে—বুকে তার আগুন জ্বলছে—সে লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে তার কিরিচ দিয়ে বার বার আঘাত করে বলেছিল—এই লে! এই লে! এই লে। কিন্তু বাংলোটা তখনও নিস্তব্ধ।

আমি মনশ্চক্ষে দেখছিলাম, কলোনীর নেশায় প্রমত্ত দিগ্বিজয়ী ইংরেজটা তখন মরেছে। নারীদেহ উপভোগের আনন্দ সুখস্বপ্নের আচ্ছন্নতার মধ্যেই মরেছে। কোন ক্ষতি নেই, কোন আক্ষেপ হয় নি তার মৃত্যুতে। এরপর ঝড় উঠবে—অন্য ইংরেজরা তুফান তুলবে। গুলির শব্দ, বারুদের ধোঁয়ার গন্ধ। রক্তপাত হবে, মাটি ভিজবে, এম্পায়ারের ভিত শক্ত হবে।

নয়ন পাল বলছিল—

লাল রুকনীকে নিয়ে ছুটেছিল। পালিয়ে চল পালিয়ে চল। কোথায়? সে তাদের মনে হয় নি। ছুটেছিল তারা বন লক্ষ্য করে। নিবিড় বন। বনে বাঘ আছে, ভালুক আছে, সাপ আছে, কিন্তু তাদের তারা ভয় করে না। তারা বাঘকে পারে, তারা ভালুককে পারে, তারা সাপকে পারে। পারে না তারা এই মানুষদের। পুড়মান জেটদের, দিকুদের, তুরুকদের। যারা ভাল পোশাক পরে, যারা ভাল ঘর বানায়, মোকাম বানায়, বড় বড় শহর তৈরী করে, তাদের।

প্রায় ভোর তখন, তখন পেয়েছিল বনের আশ্রয় প্রান্তভাগ। আলো তখন ফুটছে। শিউরে উঠেছিল লাল।

—রুকনী।

—হাঁ—

—তুর কাপড়টো যি লাল হয়ে গৈছে। ই বাবা। তুর মুখে চুলে গায়ে যি সব রক্ত লেগে রইছে! ই বাবা।

—উকে বারে বারে বিঁধলম যি। এই লে। এই লে। এই লে। বিঁধলম আর তুললম—আবার বিঁধলম, আবার তুললম। ভলভলায়ে রক্ত বেরায়লো। ছুটে এসে লাগল।

—তা হলে বাঁয়ে ঢোক। ডাইনে ই পথ ছাড়। কখুন কার সঙ্গে দেখা হবেক। চল বনের ভিতরে। ঝরনাতে সব ধেচে ফেলাবি। মাটি মাখায়ে কাচবি কাপড়। তখুন বুঝতে লারবেক। চল।

গভীর থেকে গভীরতর বনের ভিতর তারা চলেছিল সারা সকালটা। কত গভীরে তা

তাদের নিজেদেরও ঠাওর ছিল না। চোখ ছিল তাদের শুধু নিবিড়তর বনসন্নিবেশের দিকে। যেখানে উপর থেকে রোদের ঝলক সুরুযবোঙ্গার রূপোর বল্লমের মত এসে বিঁধে মাটিতে গেঁথে দাঁড়িয়ে নেই।

অন্ধকার, যেন কালো মেঘে সুরুযবোঙ্গাকে ঢেকে দিয়েছে এই নিবিড় জঙ্গল। আর চাই ঝরনা। জল খেতে হবে। চান করতে হবে রুকনীকে। কাপড়টা কাচতে হবে, মাটি মাখাতে হবে।

ক্রমশঃ উঁচুতে পাহাড়ের পাথরে পাথরে উঠে নিবিড় অন্ধকার পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল তারা। কান পেতে শুনছিল ঝরনার ঝরঝর বা মৃদু কুলকুল শব্দ। এখন বৈশাখ মাস—ঝরনার বেগ এখন প্রখর নয়, কিন্তু কাল বর্ষা গেছে—আজ জল পড়বে ঝরঝর শব্দে। বর্ষার ঝরনা ঝরার শব্দের মত।

শুনতে পেয়েছিল। ওই দিকে উঠছে। ওই দিকে।

সেই দিকেই চলেছিল দুজনে। কালকের ঝড়ে ছোট বড় ডাল ভেঙে পড়ে আছে কিছু মাটিতে কিছু বনের অন্য গাছের ডালে আটকে ঝুলছে—ঝেপে আছে।

তাই অতিক্রম করে ঝরনার ধারে এসে তারা পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়েছিল!

ঝরনার ধারে পাথরের উপর অজ্ঞান বা মরা একটি মেয়ে পড়ে আছে। তার পরনে গেরুয়া কাপড়।

—ই মা! রুকনী সভয়ে বলে উঠেছিল। সে চিনতে পেরেছিল তাকে। লালও চিনেছিল। এ যে সেই কালীতলার ভৈরবী মা! এ যে সেই রামচন্দ্রপুরের বাবাঠাকুরের বিটী। তার বাবা বিশুর সঙ্গে তারা দুই বোন কতবার গিয়েছে সেই বাবাঠাকুরের বাড়ি। বিশু বাবাঠাকুরকে বলত, উ বাঁবড়ে বাবাঠাকুর, দিকুদের বোঙ্গা বটেক। উ কালীর সঙ্গে বাত বুলে। সব জানতে পারে। আমার জানটো যেতো সিদিন—তা উ নিজে তুলে নিয়ে এল বাড়িতে—উর বিটীকে বললে বাওর দিতে। নিজে হাতে জল দিলেক, মাথায় জল ঢাললেক। সেই কৃতজ্ঞতায় কতবার বিশু পাকা পেঁপে ভঁইসা ঘি নিয়ে যেত বাবাঠাকুরকে দিতে। লালও মাঝে মাঝে যেত। কতদিন কিন্তু যেতে পারত না ক্ষেতের কামের জন্য—পাঠিয়ে দিত লাল রুকনী আর টুকনীকে। নইলে পাকা পেঁপে খারাপ হয়ে যাবে। বাবাঠাকুরের বাড়ি গেলে বাবাঠাকুর বলত—খেয়ে যাবি! রাঁধত এই বাবাঠাকুরের বেটী, খেতে দিত সেই। তারা তাকে দিদিঠেকরেন বলত।

তারপর এখানে এসে সেই দিদিঠেকরেনকে কালীমন্দিরে দেখে তারা অবাক হয়েছিল। খুশীও হয়েছিল। আবার ভয়ও পেয়েছিল দিদিঠেকরেনকে কালীবোঙ্গার পুজো করতে দেখে। গেরুয়া কাপড়, রুখু এই একরাশ চুল, কপালে একটা সিঁদুরের টোপা। এখানেও তাদের চিনে আদর করেছে। ক্রীশ্চান হয়েছে শুনে দুখ করত দিদিঠেকরেন। কিন্তু ওরা ঈশাকে মানত, বোঙ্গাকে মানত, কালীঠেকরেনকেও মানত।

সেই ঠেকরেন এখানে এমনিভাবে পড়ে।

শিউরে উঠেছিল রুকনী—ই মা

লালও শিউরে উঠেছিল—ই বাবা!

—মরে গেইছে?

—না। মরে নাই, নিশেস পড়ছে।

—তবে?

—তু চান কর। আমি মুখে জল দি। দেখি।

সেই অবধি, সে আজ প্রায় এক মাস হতে চলল তারা তিনজনে এইখানেই এই পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় করেছে। গুহাটার ভিতরটায় থাকে। রাস্তাবন্দির লোকজন যাতায়াতের জন্ত বন কেটে যে পথ করেছে, খুঁটাবন্দি করেছে, সে দিক থেকে অনেকটা পশ্চিমে, অন্ততঃ ক্রোশ তিনেক পশ্চিমে স্থানটা। পাহাড়ে জায়গা আর নিবিড় বন, দূরে দূরে গ্রাম আছে। কাছে নেই। রুকনী বের হতে দেয় না, লাল বনের ভিতর ঘোরে, ভৈরবী মাঝে বনের ধার পর্যন্ত এগিয়ে দেয়—তাও পশ্চিম দিকে; ভৈরবী গ্রামের ভিতর গিয়ে ভিক্ষে মেগে চাল নিয়ে আসেন, পয়সাও মেলে, তা থেকে নুন হলুদ দেশলাই তেল নিয়ে আসেন। লাল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে বনের মুখে, তাঁকে পেলেই নিয়ে আস্তানায় ফেরে।

পাকুড় পার হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে কোটালপুকুরে ঠিকাদারদের ছোটখাটো আস্তানা আছে। সেখানে থাকে সাঁওতাল হিন্দুস্থানী ডোম চামার মজুরের দল। পাঠান সর্দার থাকে—শিখ থাকে। ভৈরবী শুনে এসেছেন একটা সাহেব খুন হয়েছে। তা নিয়ে গোলমাল চলছে। তিনটে সাঁওতাল মেয়ে সায়েবরা জবরদস্তি নিয়ে গেছে বলে তিনপাহাড়ীর দিকে সাঁওতালরা গুজগুজ করছে। তারা মারহাট্টা ভঁয়সার মত রাঙা চোখ করে শিঙ বাঁকিয়ে মধ্যে মধ্যে বলছে—আমাদের বিটীগুলা ফিরে দে। কিছু সাঁওতাল কাজ ছেড়ে চলেও গেছে।

একটা হুকুম এসেছে—সাঁওতালদের ঠাণ্ডা করো। তাদের এখন ভাল কথা বলছে ঠিকাদারেরা, কিন্তু মেয়েগুলির খোঁজ হয় নি।

ভৈরবী মধ্যে মধ্যে কেমন হয়ে যেতেন। সে সময় চুপ করে বসে ভাবতেন। কাঁদতেন আর মা মা বলে ডাকতেন বুক ফাটিয়ে। গুহার মধ্যে সে শব্দ ভয়ংকর হয়ে বেজে উঠত—মা মা মা মা মা! তার যেন শেষ নেই। মনে হত মা ধরতির বুক ফেঁড়ে সে আওয়াজ বের হচ্ছে। কিন্তু বাইরে থেকে শোনা যেত না। তারপর শুরু করেছেন এই নিত্য রাত্রে আগুন জেলে পাতার ঠোঙায় ঘি ঢেলে এই পূজা। বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করেন আর পাতার ঠোঙায় ঘি ঢালেন। আগুনের শিখা লিকলিক করে এঁকে বেঁকে যেন তাঁর হাত ছুঁতে চায়।

রুকনী স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওই আগুনের দিকে।

লাল পাহারা দেয়। পূর্ব দিকে—যে দিকটায় রাস্তাবন্দির জন্তে গাড়ি মানুষ চলবার পথ সেই দিকে দাঁড়িয়ে থাকে—দেখে কোথাও কেউ আসছে কি না।

পূজার শেষে মা ভৈরবী এমনি করে ডাকেন—রুকনী!

রুকনী ডাকে—দাদা হো!

উত্তর আসে—হুঁ।

তারপর লাল আসে। মা ভৈরবী এর পর আগুনের শিখায় ঝকঝক করে সেই ছোরাটা নিয়ে নিজের বুকের কাপড় সরিয়ে খানিকটা চিরে ফেলেন, রক্ত বেরিয়ে আসে, টপটপ করে ঝরে, মা পাতার ঠোঙায় সেই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ধরে আগুনে ঢেলে দেন। তারপর সেই ছুরি দেন রুকনীকে—রুকনীও তেমনি করে পাতার ছোট ঠোঙায় রক্ত ধরে তারপর সে ছুরিটা দেয় লালকে। লালও তাই করে। মা ভৈরবী খানিকটা রক্ত—হয়তো কয়েক ফোঁটা রক্ত ঢেলে দিয়ে বলেন—যা, দিয়ে আয় ওই গাছের গোড়ায়। তোদের মরংবোঙাকে দে। আর বল—আমার লহু লাও—আমার দুশমনের লহু দাও।

নয়ন পাল ছড়া বলে যাচ্ছিল। আমি মনে মনে আমার তুলিতে কল্পনায় ছবি এঁকে যাচ্ছিলাম, যার সঙ্গে নয়ন পালের ছবি ঠিক মেলে না। কিন্তু এইখানে নয়ন পালের ছড়া শুনে আমার তুলি যেন অক্ষম হয়ে গেল। নয়ন পাল বলছিল—

"ব্রাহ্মণের কন্যা সতী হোম জ্বালি মধ্যরীতি
বক্ষ চিরে নিতিনিতি রক্ত দিয়ে পূজেন চণ্ডীরে।
শত্রুপাতে দাও শক্তি শত্রুরক্তে পূর্ণাহুত্যি
দিয়ে পূজা করি স্বস্তি ঝাঁপ দিব পুণ্য গঙ্গানীরে।
চণ্ডী হাসে স্বর্গধামে অরণ্যে তৃতীয় যামে
শিবা রব হয় বামে—সতী শোনে হবে পূর্ণ হবে।"

ভৈরবী আঙুল বাড়িয়ে বলেন, শুনছিস—

—শিয়ার?

—না। শিবা বলছে—হবে হবে।

আমার কল্পনার তুলিতে এই আশাবাদটুকু ফোটে না। আমার তো সে বিশ্বাস নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চান্ন সাল, এক বালবিধবা সন্ন্যাসিনী চরম অত্যাচারে দুর্গতিতে সতীত্ব হারিয়ে বুকের দাহে অন্তরের গভীরতম বিশ্বাসে এ বার্তা শুনেছিলেন। নিশ্চয় শুনেছিলেন।

নিজের চুল কেটে চামর বেঁধে বাতাস দিয়ে, বুক চিরে রক্ত দিয়ে শক্তি আরাধনার কথা আমার শোনা কথা নয়। আমার দেখা জানা কথা। এ দেশের মেয়েদের বুকে বুক চিরে রক্ত দেওয়ার ক্ষতচিহ্ন আমরা বাল্যকালে দেখেছি।

আমি জানি।

আর ওই অরণ্যের সরল, সবল, শান্ত, ভয়হীন মানুষদেরও জানি।

রুকনী লাল এ বিশ্বাস করেছিল। বুক চিরে রক্ত তারা দিয়েছিল ভৈরবীর কালীকে,

তাদের বোঙ্গাকে।

মা যশোরেশ্বরী দেখা দিয়েছিলেন জ্যোতিঃরূপা হয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে।

ভবানীর বরপুত্র মহারাজ শিবজী দেখেছিলেন তাঁর মা ভবানীকে।

'মম্ ভুখা হুঁ।' 'মম্ ভুখা হুঁ।' চিতোরেশ্বরী রক্ত চেয়েছিলেন, দ্বাদশ রাজপুত্রের রক্ত, দ্বাদশ রাজপুত্রের বলি।

সেদিন উনবিংশ শতাব্দীতে গভীর অরণ্যে অত্যাচারজর্জরিতা হিন্দু বিধবা শুনেছিলেন, রক্ত দে, বুক চিরে রক্ত দে।

আমি বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে কল্পনার তুলিতে ছবি আঁকতে গিয়ে এ ছবি আঁকতে আমার হাত কাঁপছিল।

নয়ন পাল গেয়েই চলেছিল—

"রাত্রি কৃষ্ণা চতুর্দশী, তিনজনে ভাবে বসি—
হঠাৎ উঠিল ফুঁসি সিধু বীর অজগর যেন গরজায়—
চল্ হে তিনপাহাড়— বসে ফল কিবা আর—
ত্রিভুবন খুঁজে বাহার করিবই সাঁওতাল কন্যায়।
মধ্যযামে ডাকে শিবা ডাকুক তাহাতে কিবা—
কর্মশেষে ঘুম দিবা—তার আগে ঘুমাইতে লাজ।
হঠাৎ অরণ্য মাঝে বজ্রধ্বনি সম বাজে
মা ডাক, তাহার মাঝে হুয়া হুয়া শিবা কলরব!"

সেদিন ভৈরবী আবেগে উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠেছিলেন—মা! সেই ধ্বনি রাত্রির অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল শতগুণ হয়ে। সে শব্দে থমকে দাঁড়িয়েছিল তিনজনে।

মা! মা বলে কে ডাকে! আর আশ্চর্য এ ডাক! আশ্চর্য মোহ এ ডাকের মধ্যে!

সিধু বলেছিল—দাঁড়া হে। বলে সে একটা গাছের উপর চড়ে গিয়েছিল। এবং অনেকটা উঁচুতে উঠে বলেছিল—হুই। আগুন জ্বলছে—তিনটা মানুষের পারা লাগছেক।

নেমে এসে বলেছিল—চল্।

বিশু বলেছিল—যদি বোঙ্গার থেল হয়? কানু—

কানু বলে উঠেছিল—হয় তো হবে। বোঙ্গা তো ডাকছেক আমাদিগে।

সিধু বলেছিল—বোঙ্গা দেখা দিবেক। বোঙ্গাকে বুলব তুর টাঙ্গিটো দে বাবা হে। আমি লিব উটি।

বিশু বলেছিল—দিবে কেনে?

কানু বললে—বুলব কাটব দিকুগুলাকে। পুড়মান জেট আমাদের ধরম লিছে, আমাদের মেয়া লিছে, আমাদের ধান লিছে গরু লিছে কাঁড়া লিছে, জনম লিছে, চাকর করে রাখছে—আমরা কাটব।

সিধু বললে—ই আমাদের দেশ বটে। এ দেশটো আমাদের। ই আমাদের দেশ,

আমরা লিব।

—আমাদের দেশ ইটো।

সিধুর সঙ্গে সঙ্গে কানু একসঙ্গে বলে উঠল—হঁ, ইটো আমাদের দেশ বটে। আমাদের দেশ।

চমকে উঠল বিশু। শুধু বিশু কেন, সিধু কানু—নিজেরা বলেও নিজেরাই এ-কথায় চমকে উঠল—আমাদের দেশ। বুল বাবা বোঙ্গা, বুল!

সেই রাত্রির অন্ধকারে নিজেদেরই এই আশ্চর্য কথা দুটি তাদের সারা অন্তরে চকিত একটি বিদ্যুৎরেখা টেনে দিয়ে মেঘের ডাকের মত বেজে উঠল—ই আমাদের দেশ।

এসে দাঁড়াল তারা অগ্নিকুণ্ডের অদূরে। পূর্ণাহুতির আগুন তখনও জ্বলছে। অবাক হয়ে তারা দাঁড়িয়ে গেল।

তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আগুনের শিখার ছটায় প্রদীপ্ত এক গৈরিকবসনা আশ্চর্য নারীমূর্তি। আর তাদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে একজন সাঁওতাল আর একজন সাঁওতাল মেয়ে।

ভৈরবী আবার গভীর স্বরে ডেকে উঠলেন—মা—

অর্থাৎ কাল অমাবস্যা, কাল পূর্ণাহুতি।

মা, আমার আর এই আমার মত হতভাগিনীর ব্রত কি পূর্ণ হবে না? মা—

সঙ্গে সঙ্গে রুকনীও ডেকে উঠেছিল—মা!

সঙ্গে সঙ্গে লাল—মা!

সঙ্গে সঙ্গে সিধু কানু বিশু—মা!

ছয়জনের মিলিত কণ্ঠের সে মা শব্দ যেন অরণ্যলোককে কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে ছড়িয়ে পড়ল দিগ্‌দিগন্তরে। আকাশ স্পর্শ করল। ঝিল্লী-মুখরতার মধ্যেও বিচিত্র আরণ্য স্তব্ধতা যেন মানুষের সেই 'মা' ডাকে বজ্রাহতের মত খানখান হয়ে গেল।

চমকে উঠল তিনজনে। ভৈরবী তাকিয়ে দেখলেন তিনজন সাঁওতাল। দুজন যেন আবিষ্ট—চোখে বিচিত্র দৃষ্টি। অন্যজন বিশু—তাকে চেনেন তিনি।

রুকনী চীৎকার করে উঠল—তুরা! তারপর সে হা হা করে কেঁদে উঠল। বাবাকে দেখে সে কাঁদে নি। কেঁদেছে সে সিধুকে দেখে। তার জীবন যৌবন যাকে দেবার কামনায় এতদিন বাবার হাজার কথাতেও বিয়ে করে নি, সে তার সামনে—সে তাকে কি দেবে?

লাল স্তব্ধ গম্ভীর।

সিধু বললে—মানকী কুথা?

লাল বললে—সায়েব তাকে—

কানু বললে—টুকনী?

—তাকেও পাই নাই। সায়েবরা তাদের দুজনাকে রাজমহলের দিকে নিয়ে গৈছে। রুকনাকে যে সায়েবটা নিয়েছিল রুকনী তাকে খুন করে পালায়ে আইছে।

রুকনী এবার এগিয়ে এসে বললে—সিধু!

সিধু বললে—তু ছুঁস না আমাকে।

হা হা শব্দে হেসে উঠলেন ভৈরবী! সে হাসিতে একটা কিছু ছিল যাতে সিধু এতটুকু হয়ে গেল।

—হাসছিস কেনে ঠেকরেন?

—হাসব না? মাকে ফেলে দিবি বোনকে ফেলে দিবি বউকে ফেলে দিবি? জোর করে পরে তাদের ধরে নিয়ে যাবে—তাদের রুখতে পারবি না—শোধ নিতে পারবি না—ফেলে দিবি?

আবার হেসে উঠলেন তিনি।

সিধু বলে উঠল—দিব—শোধ দিব। তার লেগেই আইছি।

—দিবি শোধ? দিবি? আমি তুদের পথ দেখাবো। আমি যাব।

ভৈরবী এগিয়ে এসে বললেন—তোরা আমার বেটা। তোদের জন্যে আমি আমি বসে আছি। এই যজ্ঞ করছি। পারবি—আমাকে একটা মুণ্ডু এনে দিতে পারবি? একটা সাদা মানুষ জানোয়ার! পারবি না? এই চক্র তোদের দিব আমি। তোদের কেউ রুখতে পারবে না। তোদের দেশ তোদের হবে। তোরা দু ভাই হবি রাজা শুভোবাবু।

লোহার ত্রিশূলটা দিয়ে তিনি আগুন সরিয়ে বের করলেন রক্তরাঙা তন্ত্রচক্র—গোল, গাড়ির চাকার মত। মাঝখানে একটা ছিদ্র।

—এই চক্র দেব। কাল যজ্ঞ শেষ আমার—তার মুণ্ডুটা আমাকে এনে দিবি। সে আমার—

বলতে পারলেন না ভৈরবী—হা হা আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন তিনি।

সিধু তবু বললে—দিব। দিব।

কানুও বললে—দিব। দিব। মানকীকে টুকনীকে ছিনায়ে আনব আর সিটোর মুণ্ডুটো আনব।

রুকনী ভৈরবীর মাথাটা তুলে নিয়ে ডাকলে—মা—মাঠে করেন!

ইতিহাস মনে পড়ছে। ৫৩০৮ সংখ্যক 'সংবাদ প্রভাকরে' আছে ক্যাপ্টেন মিডিলটন লিখেছেন—"কানু সিধুর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া আমি সাঁওতালদের ঠাকুর পাইয়াছি। ঐ ঠাকুর একখানা মৃত্তিকানির্মিত চাকার মত—তাহার দুই স্থানে ছিদ্র আছে। তাহাতে দুগ্ধ প্রদান করিলে ফুলিয়া উঠে।"

আরও আছে। "সিধু কানুর সম্মুখে দেবতা আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথমে মেষরূপে, তাহার পর অগ্নিরূপে, তাহার পর মানুষ-দেবীরূপে তাহাদের দেখা দিয়াছেন।" ওখানকার একজন প্রাচীন ডেপুটি কমিশনার লিখেছেন—"এক অপরূপ সুন্দরী দেবীমূর্তি সিধু কানুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল।"

নয়ন পালের পটে ছড়ায় তার বিবরণ পেলাম। তিনি ত্রিভুবন ভট্টাজের সন্ন্যাসিনী বিধবা কন্যা ভৈরবী মা।

নয়ন পাল তখন দ্বিতীয় পটের শেষ কটা ছবি দেখাচ্ছে।

নিশীথ রাত্রে সাঁওতালেরা পরদিন হাতে মশাল নিয়ে সাহেবদের বাংলো আক্রমণ করেছে। সেই ছবি।

অন্ধকারের মধ্যে আলো হাতে রুকনী সিধু কানু আর লাল।

সংবাদ প্রভাকরের ৫৩০০ সংখ্যায় সংবাদ মনে পড়ছে—১২৬২ সাল ১২ই শ্রাবণ: "অতি অল্প দিবস হইল রাস্তাবন্দি সাহেবরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্য জাতিদিগের তিনজন স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক অপহরণ করাতে তাহারা কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া উক্ত সাহেবদিগের প্রতি আক্রমণ করতঃ তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে উদ্ধার করে।"

নয়ন পালের পটে দেখলাম, জ্যৈষ্ঠের শেষ অমাবস্যা তিথিতে অন্ধকার রাত্রি মশালের আলোয় ভয়াল করে তুলে সাঁওতালেরা আক্রমণ করেছে সাহেবদের বাংলো। তাদের সর্বাগ্রে মশালধারিণী রুকনী। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছে তারা।

সিধু কানু লাল তার পাশে। কি ভয়ংকর দেখাচ্ছে সিধু কানুকে। কপালে তাদের সিঁদুরের লেপন, মাথায় পাগড়ি। পুরাণের বীরদের মত ধনুর্বাণ নিয়ে শর নিক্ষেপ করছে।

ওদিকে সাহেবরা তাদের বন্দুক ছুঁড়ছে। কিন্তু তাদের মুখে ভয়ের চিহ্ন। হবেই। মানুষের জগতে একটি আশ্চর্য নিয়ম আছে। অন্যায় বা পাপ যারা করে তারা বিচারের সম্মুখীন হলেই ভীত হয়। দুর্বল হয়।

নয়ন পালও ছড়ায় তাই বললে—

"দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত রাবণ সে বার মত্ত
খরখর কাঁপে ত্রস্ত—দুই হস্ত
নর বানরের বাহিনী সম্মুখে।
চণ্ডিকার বরাভয় দুর্বলে করিল অজয়
সাঁওতালের তীর জয় করিলেক বারুদ বন্দুকে।"

পাঁচশো সাঁওতাল জমেছিল সে রাত্রে। মা ভৈরবী বেরিয়েছিলেন ত্রিশূল হাতে এবং সঙ্গে গিয়েছিল বিশু আর লাল। তাদের হাতে শালগাছের পাতাসুদ্ধ ডাল। আশপাশের পাহাড়ে পাহাড়িয়া সাঁওতালদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। আজ সন্ধ্যায় মরংবোঙ্গার আর মা কালীর পূজা। মরংবোঙ্গা সাঁওতালদের দুঃখে দেখা দিয়েছেন সিধু কানুকে। শুভোবাবু করেছেন তাদের। মা কালী আশীর্বাদ দিয়েছেন। তোমরা এস—আজ সন্ধ্যায় কাঁড় ধনুক টাঙি নিয়ে এস।

তারা এসেছিল। এবং সেই রাত্রেই বেরিয়েছিল মানকী এবং টুকনীকে উদ্ধার করতে।

সিধু বলেছিল কটি কথা—আমাদের মেয়্যাগুলা কেড়ে লিবেক?

কানু বলেছিল—আমাদের বহিন বেটে।

বিশু বলেছিল—আমাদের বিটী বেটে।

রুকনী সামনে এসে বলেছিল—এই আমাকে দেখ্। দেখ্ রে তুরা দেখ্। আমি সি সায়েবটার বুকে কিরিচ বিঁধায়ে মেরে পালায়ে আইছি—দেখ, আমার দশা দেখ্।

ভৈরবী অগ্নিকুণ্ড জেলে সামনে বসেছিলেন—তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—আমি মা! ওরে আমি তোদের মা, আমার ওপর অত্যাচার করেছে, শোধ লিবি না তোরা?

মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছরের প্রখর উত্তপ্ত শোষণে পীড়নে এই সরল মানুষগুলির হৃদয়—যা কাজলকালো জলে ভরা সরোবরের মত—তা নিঃশেষে শুকিয়ে কঠিন শুষ্ক পঙ্কস্তরে পরিণত হয়েছিল—সেই পঙ্কস্তর ফেটে গিয়ে একটা আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয় হল।

অগ্ন্যুদ্গার হয়ে গিয়েছিল সেই রাত্রেই।

সংবাদ প্রভাকরের ওই সংখ্যায় ওই পত্রের সঙ্গেই আরও দুটি লাইনের সংবাদ আছে। "অন্য অন্য সাহেবরা ইহাতে ভীত হইয়া স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন।"

নয়ন পাল পটখানার শেষ ছবি খুললে।

ভরা গঙ্গার তটভূমির উপর একটা গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে মা ভৈরবী।

তাঁর হাতে একটা মুণ্ড। শ্বেতাঙ্গ ডিউইর মুণ্ড।

গঙ্গার উঁচু পাড়ের উপর তিনি যেন এক ঊর্ধ্বলোকে দাঁড়িয়ে আছেন। গঙ্গার বুকের বাতাসে তাঁর রুখু চুলের রাশ উড়ছে। আকাশের দিকে তাঁর দৃষ্টি। মুখে আশ্চর্য হাসি।

নয়ন পাল বললে—

"অন্তর্হিতা হইল মাতা
হাতে অত্যাচারীর মাথা
গঙ্গাবক্ষে বিসর্জিতা হইলেন
পূজাশেষে প্রতিমা সমান।"

"ভয় নাই ভয় নাই সিধু কানু দুই ভাই
রাজা হল, তাহারাই করিবেক ত্রাণ।"
মা ভাই বলে গিয়েছিলেন বাবু। বলতে বলতে তৃতীয় পট খুললে সে।
"ওদিকেতে অত্যাচার হইল পাহাড় ভার
শৃঙ্গে আর ঠাঁই নাই তিল ধারণের।
তবু নাই কোন গ্রাহ্য হারায়েছে জ্ঞান বাহ্য
পাপ কার্য ভাল ভাল ইচ্ছা চাপানের।"

এই দেখুন বাবু, গোটা চাকলা জুড়ে গাঁয়ে গাঁয়ে হিঁদু মহাজনেরা বাঁধন শক্তপোক্ত করছে। জব্দ কর বেটাদের। তাড়াতে হয় তাড়াও দেশ থেকে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে

থানা পুলিসের, কোর্ট কাছারীর বাবু, হাকিম দারোগা এমন কি রাজারাজড়া পর্যন্ত। দাও, সময় থাকতে চাপ দাও—পিষে মার। কি বলে বেটারা? কাঁড়ার হালে আট আনা আর দামড়ার হালে চার আনা ছাড়া খাজনা দেবে না? বেটারা আমাদের কাছে ধান খাবে না? আমাদের বশে থাকবে না?

ওদিকে সাহেবরা খেপেছে। এত বড় বড়! তিনটে মেয়ের জন্যে তিনজন সাহেবকে কেটেছে? তিনজন নয় চারজন? এক মাস আগে একজনকে খুন করে কালো একটা মেয়ে পালিয়েছে!

ভাগলপুরের নতুন কমিশনার মিস্টার অলিভার বিলম্ব করেন নি, তিনি ফৌজ আনিয়েছিলেন। গোরা নয়, তারা পাহাড়িয়া সিপাহীর দল—তার মধ্যে সাঁওতালও ছিল। ভাগলপুরের কালেক্টর উইলিয়াম আলেন, পুলিস সাহেব চার্লস ইজারটন, জজ সাহেব জোসেফ বার্টন, কর্নেল জেমস এবং ডাক্তার সাহেব এডমণ্ড রোপার সকলে থানা পার্টিতে মিলে পোটেণ্ট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে বসে এই সর্বরিক্ত সরল জাতির জীবনের দুঃখের সকল কিছুকেই অগ্রাহ্য করে নিষ্ঠুর হাতে দমন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।—

Wipe them out if necessary! Wipe them out!

জঙ্গিপুরের এস.ডি.ও. একখানা চিঠি লিখেছিলেন, তাতে লিখেছিলেন, "উপরের কর্মচারীদের অবহেলার জন্য অন্য কর্মচারীরা (নেটিভরা) হাতের বাইরে গিয়েছে। এরা মহাজনদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সাঁওতালদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করছে। রেলওয়ে কণ্ট্রাকটারদের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে ওয়াইল্ড নেচারের যারা…"

কমিশনার চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—রাবিশ!

ডিসিসন হল, অঙ্কুরেই এর বিনাশ কর। গিভ এ শো টু দেম। কর্নেল, তোমার পল্টন নিয়ে একবার মার্চ করিয়ে দাও। বলে দাও, এই সব বন্দুক যা কাঁধে রয়েছে সিপাইদের এ সবই তাদের দিকে ঘুরে মৃত্যু বর্ষণ করবে। অ্যাণ্ড ইউ সি, আমরা ওই কালপ্রিটদের চাই, যারা রেলরাস্তায় তিনটি মেয়ের জন্যে চারজন ইংরেজের রক্তে এদেশের মাটি ভিজিয়েছে, উই ওয়াণ্ট দেম। আমি শুনেছি দেয়ার ইজ ওয়ান গার্ল। এ টল গার্ল, দি টর্চ-বেয়ারার। সেই—সেই—সী ইজ দ্য ফার্স্ট মার্ডারার। টু-মরো গিভ দেম ফার্স্ট শো।

পরের দিন দরবার ছিল। সমস্ত পরগনাইত সর্দার মাঝি এবং ছোট পরগনাইতরা এসেছিল, তার সঙ্গে দলে দলে সাঁওতালেরা।

হাজারখানেক সাঁওতাল। সব দাঁড়িয়েছিল। সায়েব তাদের বসতে হুকুম দেন নি। হুকুম খাড়া হয়ে দাঁড়াবার। তারা তাই ছিল। নিজের নিজের লাঠির মাথা দু হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে।

তাদের চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল পাহাড়িয়া সিপাহী পল্টন। তাদের লাল কুর্তা লাল প্যাণ্ট পায়ে জুতো মাথায় লাল পাগড়ি কাঁধে বন্দুক। লেফট রাইট লেফট রাইট করে তারা প্যারেড দেখিয়ে চলে গেল।

উপরে সায়েবরা বসেছিলেন চেয়ারের উপর, তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল পুলিস কর্মচারীরা, তাদের মাঝখানে ছিল মহেশ দারোগা।

সাঁওতালেরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব দেখলে। সে নিঃশব্দতা বিচিত্র। ভীত স্তব্ধতা নয় সে নিঃশব্দতা। দৃষ্টি তাদের নিঃশঙ্ক। তারা স্থির—শুধু ছিল একটা জিজ্ঞাসা! কেন? এসব কেন?

সিপাহীরা প্যারেড করে আবার লাইন করে গিয়ে দাঁড়াল একপাশে। অলিভার সাহেব উঠে বললেন—শুনো সর্দারলোক! হামার বাত ইয়ে হ্যায় কি তুমলোক হুলাউলা মৎ করো। হাম শুনা হ্যায় কি ইসকে শল্লা চলতা হ্যায়। তুমলোক কোর্ট নেহি মাননে চাহাতা, পুলিসকে ভি মাননে নেহি চাহাতা। হাঁ, তুমহারা সাঁওতাললোকসে এক গ্যাং আদমী চার সাহেবলোগোঁকে জান লিয়া। কৌন হ্যায় উ লোগ? বাতাও—নাম বাতাও। এক ছোকরী ভি হ্যায়। কৌন হ্যায় উ? বাতাও।

শুধু নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তাদের দৃষ্টিতে পলক পড়ল না। একটা বিপুল শক্তি যেন নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে দেখছে।

—বাতাও! সাহেব বারান্দার মেঝের উপর বুটসুদ্ধ পাখানা ঠুকলেন। তবু সব স্তব্ধ।

—বাতাও!

একটি কণ্ঠ এবার সোচ্চার হল—পীপড়ার হাড়মা মুর্মু। পীপড়ার হাড়মা মুর্মু প্রবীণ মানী লোক। সে ছিল সামনে শ্যাম পরগনাইতের পাশে। তার অনেক অভিযোগ—তার নামে কেনারাম ভকত মিথ্যা নালিশ করেছে—শুনেছে ডিক্রীও করেছে। সে আশা করেছিল প্রতিকার কিন্তু তার বদলে তিরস্কার পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সে বললে—উ শুনলাম আমরা। কিন্তুক জানি না কে খুন করলেক। সি তো রাস্তাবন্দির ধারে। আমরা জানি না।

—আলবৎ জানতা হ্যায়—

—না সাহেব, জানি না। আমরা ঝুট বুলি না।

—হুল করোগে? রিভোল্ট?

—দিকুরা আমাদের সব লিলে মিছা মিছা নালিশ করে। তুদের কোর্ট মিছা কথা শুনছে। তুদের দারোগা তাদের কথা শুনছে। আমরা কি করব? আমরা মরব?

মহেশ দারোগা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল মনে মনে। সে সাহেবকে সেলাম করে বললে—সবসে বড়া বদমাশ স্যর। সবসে বড় বদমাশ। এ লায়ার।

—টীচ হিম লেসন্‌স্ দারোগা। বাট নট নাউ।

এরপর কর্নেলকে বললেন—কর্নেল, অ্যানাদার শো প্লিজ।

কর্নেল অর্ডার দিলেন—অ্যাটেন্—শন্! সিপাহীদের বুটে বুটে ঠুকে শব্দ হল—খট্। অনেকগুলি শব্দের একটি সমবেত সুউচ্চ এবং সুকঠিন আদেশদৃপ্ত সাবধানবাণী।

সাঁওতালদের দৃষ্টি বারেকের জন্যও তাদের দিকে ফিরল না। মহিষের মত মাথা একটু

নীচু করে তারা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাহেবদের দিকে।

বেলা বাড়ছিল, গরমের দিন, আষাঢ় মাস, ঘরের মধ্যে বয় বেয়ারারা সাহেবলোকদের জন্ত জিন আর মিঠাপানি মিশিয়ে ঠাণ্ডাই তৈরী করছিল। অলিভার সাহেব বললেন—যাও, সব ঘর যাও। আপনা আপনা ক্ষেতিকে কাম করো। যো লোগ মহাজনলোগোঁকে জমিনমে কাম করতে কো রুপেয়া লিয়া, কাম বাজাও। যাও।

সাঁওতালরা মৃদুস্বরে বললে—দেলাঃ! চল্ হে! চল্।

অলিভার বললেন—ব্যস ঠিক হো গেয়া। মহেশ দারোগা, বহুৎ কড়া হাঁতমে কাম করো।

কর্নেল শুধু বললেন—স্ট্রেঞ্জ পিউপল্। দে ওয়ের সো সাইলেণ্ট!

অলিভার বললেন—দে আর জঙ্গলীজ। অ্যাফ্রেড। দে হ্যাভ নট সীন এনিথিং লাইক দিস প্যারেড।

কর্নেল বললেন—নো মিস্টার কমিশনর, আই ডোণ্ট থিংক সো। দিস সাইলেন্স ইজ ডেঞ্জারাস।

ভাগলপুর থেকে সাহেবগঞ্জ হয়ে দক্ষিণমুখে বিভিন্ন মাঝির দল বিভিন্ন রাস্তায় ফিরছিল গ্রামের দিকে। নীরবে পথ চলেছে সব। মাঝে মাঝে টুকরা টুকরা কথা —দেখলি হে সব—,

—হঁ দেখলম।

—কি কুরবি?

—কি কুরব?

—বোঙ্গাকে ডাক হে। সি বুলে দিবে কি কুরব।

—বোঙ্গা যদি বুলে ইয়াদের কথা মান্।

—বোঙ্গা তা বুলে না। বোঙ্গা বলবেক—তুর জান আছে তুর মান আছে, তুর মা আছে, বহিন আছে, বিটী আছে, ইজ্জত আছে। তু হড় (মানুষ) বেটিস। তু তা রাখ। না রাখলে তু হড় নোস।

—তা হলে?

—বোঙ্গা কি বুলে দেখ।

—কবে বুলবেক?

—বুলবে। ঠিক বুলবে। জলদি বুলবে। বাগনাডির চুনার মুর্মুর বেটারা বুললে ইশেরা গেছে, তারা কুথা জানিস?

—উঁহু, জেনে না।

একজন বললে, তারা নাকি মানকী রুকনী টুকনীর খোঁজে গেইছে।

—তেবে?

থমকে দাঁড়াল হাড়মা মাঝি—তেবে? চোখ দুটো তার বড় বড় হয়ে উঠল। শ্যাম

পরগনাইত বললে—তেবে কি ? কি বুলছিস ? হাড়মা বললে—উয়ারাই। ই—উয়ারাই। ভাম প্রশ্ন করলে—কি ? বুল ? হাড়মা বললে—সায়েব বললেক কারা চার সায়েবকে মেরে তিনটা মেয়্যারে কেড়ে নিয়ে গ্যেল। বুলছি না ?

—হঁ। বুললেক।

—উয়ারাই। উয়ারাই। তেবে তারা পেলে।

—কি ?

—ইশেরা। হঁ—না পেলে তো বন্দুকের সাথে লড়ে—হঁ।

—তু বুঝছিস—উয়ারাই ?

—হঁ। চুপ কর্। ইশেরা পেঁয়ে থাকলে হাঁকিড়ে উঠবেক। চুপ।

কিছুদূর এসে একটা সাঁওতাল গ্রামে তারা থমকে দাঁড়াল। রাস্তার মোড়ে একটা ঝাণ্ডা গাড়া রয়েছে। সাদা একটুকরা ন্যাকড়ায় একটা গোল সিঁদুরের ছাপ। রাস্তাটা তকতক করছে। ঝাঁট দিয়ে সদ্য পরিষ্কার করে গেছে। খানিকটা দূরে গ্রামের মধ্যে যেন কলকল করছে মেয়েছেলেরা। যেন একটা উৎসব শুরু হয়ে গেছে।

—এ কি। পরগনাইত ?

—তাইথো—এ কি সর্দার ?

—খোঁজ কর্ হে। চল।

গ্রামের ভিতরে গেল দুজনে। অন্য সঙ্গীদের বললে—চল্ তোরা হে। ধীরে কদমে চল্। আমরা এখনি এলম।

বেশীদূর যেতে হল না, দেখা হয়ে গেল কটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে। হাড়মা জিজ্ঞাসা করলে—হাঁ, সাঁওতাল বিটীরা ই কি বেটে ? কি পরব আজ ?

তরুণী মেয়ে কটি সবিস্ময়ে বললে, ই বাবা। তু জানিস না ?

—না। আমরা ভগলপুর গেইছলম।

—মরংবোঙ্গার হুকুম আসছে গ। বোঙ্গা আসছেক।

—বোঙ্গা আসছেক ? কে বুললে ?

—টাটু ঘোড়ায় চড়্যা একটা ছেল্যা এল। পরনে এই পাগ, এই কুর্তা। এই মালকোচা মারা কাপড়। কি সোন্দর ছেল্যা। সি আনলে শালের ডাল পাতা, পাতাতে সুহুম (তেল) মাখানো। মাঝখানে সিঁদুরের এত বড়ো টোপা।

একটি প্রিয়দর্শন সাঁওতাল কিশোর টাটু ঘোড়ায় চড়ে এই দুপুরে,গ্রামে গ্রামে বিলি করে গেছে শালপাতার নিমন্ত্রণ-পত্র। বলে গেছে—"সাঁওতালদের মরংবোঙ্গার ঘুম ভেঙেছে। সাঁওতালদের দুঃখ দেখে বোঙ্গা (রাজা) শুভোবাবু পাঠিয়েছেন—তারা আসছে। তারা আসছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছেন বোঙ্গা নিজে। গ্রামে গ্রামে তিনি আসবেন। তার জন্যে তোমরা পথঘাট পরিষ্কার করো। পথের ধারে পুঁতে রাখ এই ঝাণ্ডা। বোঙ্গা শুভো-বাবুদের দেখা দিয়ে বলেছেন "এ দেশ তোদের দেশ।"

শেষ কথা কটি তিনটি তরুণীই একসঙ্গে বলে উঠল—"ই দেশটো আমাদের। আমাদের দেশ।"

—হুকুম আসছেক।

হাড়মা মাঝি শ্যাম পরগনাইতকে বললে—চল হে জলদি চল্। হুকুম আসছেক।

সূর্য তখন অস্তোন্মুখ। রাস্তার দুপাশে শালবনের মাথায় বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূলিকণায় সে আলো ধরা পড়েছে, তার রাঙা আভা যেন স্থির হয়ে ভেসে রয়েছে পত্রপল্লবের মাথায় মাথায়।

সাঁওতালরা ভাগলপুর থেকে ফিরছে। পথের ধারে ধারে সাঁওতাল পল্লীতে ঢুকবার রাস্তার মুখে পতাকা পোঁতা। ক্লান্ত শ্রান্ত অত্যাচারিত জীবন, যে জীবন একবেলা একমুঠো অন্ন এবং বনজ ফল কন্দ ও শিকার করা পশু পাখির মাংসে বেঁচে, ছিন্ন মলিন বস্ত্রে আর নিজেদের সঞ্চয় করা কাঠকুটো ও আবর্জনার মধ্যে কোনরকমে কাটিয়ে এসেছে, সে জীবন আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘুমপাওয়া জীবন একটি আহ্বানে সতেজ জাগরণে জেগে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

বোঙ্গা আসছে! খবর দিয়ে গেছে এক সুন্দর কিশোর সাঁওতাল ছেলে। কুর্তা পরে চাদর বুকে পেঁচিয়ে বেঁধে মাথায় পাগড়ি বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল। শালপাতার নিমন্ত্রণ দিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ওই সে ঘোড়া ছুটছে। ছোট টাটু ঘোড়া। তার উপরে হিলহিলে লম্বা সওয়ার ছেলে ঘোড়ার গতির সঙ্গে দুলছে। ওই চলছে। ঘোড়ার ক্ষুরে ওঠা ধুলো তার পিছনটা ঢেকে দিচ্ছে।

১৮৫৫ সালের বৈশাখের সেই দুরন্ত বাজপড়া কালবৈশাখীর দিন ছাড়া আর বৃষ্টি হয় নি। পুড়ে গেল দেশ ঘাট। ঘাস শুকিয়েছে, গরু বাছুর কাঁড়াগুলো খেতে পায় না। মানুষের ঘরে ধান নেই। আকাশে মেঘ নেই। মহাজনের ঘরে ধান। মহাজন বজ্রমুষ্টিতে ধরেছে, জমি লিখে দাও। গরু দাও কাঁড়া দাও। নয়তো ধান নিয়ে তার দামে জীবন লিখে দাও, তাহলে পাবে নইলে পাবে না।

এ অঞ্চলের বজ্রকঠিন লাল মাটি রোদে পুড়ে পুড়ে গুঁড়ো ছাইয়ের মত লাল ধুলো হয়ে সব যেন লালচে করে দিয়েছে। সেই লাল ধুলো উড়িয়ে চলছে ওই আশ্চর্য কিশোর সওয়ার।

গান গাইছে সে; সে এক নতুন গান, সাঁওতালরা শোনে নি কখনও।—

শুকনা ধুলা উড়ছে, মাটি পুড়ে ধুলা হয়ে গেইছে—
আকাশ ঢেকে গেলো রে।
জল হল নাই! ও জল হল নাই রে,
জৈঠ আষাঢ় যায় রে—
মাটি ফেটে যায় রে—জল হল না—ই।

দিকুরা সব লুঠলো, সাদা মানুষ জুটলো
কালো মেয়্যা লুটলো—হড়ে ধরম চাড়লো—
মরংবোঙ্গা ক্ষেপলো—
জল হল নাই। তাথেই জল হল না—ই
মরংবোঙ্গা রাগলো—শুভোবাবু জাগলো—
টাঙি নিয়ে ছুটলো—
সায়েবদিগে কাটলো—কালো মেয়্যা কাড়লো ;
চোখের পানি মুছলো—
আবার তারা হাসলো—ইবার জল হবে রে—
ওরে ডর না—ই।
শুভোবাবু আসছে—শুভোবাবু আসছে—
শুভোবাবু আসছে—
ঘোড়ায় চড়ি আসছে টগবগিয়ে আসছে,
ওরে ডর নাই রে আর ডর না—ই।
এক হাতে তার টাঙিয়া আর হাতে তার বলুয়া—
পিঠে ধেনুক কাঁড় নিয়া মাথায় পাগ বাঁধিয়া
লাল পাগ বাঁধিয়া চাঁচর চুলে বাঁধিয়া শুভোবাবু আসিছে—
টগবগায়ে আসিছে! আর ডর নাই রে।
আর ডর না—ই।
চোখে আগুন ঝলিছে বোঙ্গার হুকুম বলিছে—
আর ডর না—ই।
আমি তাকে দেখিলাম—তার পরসাদ মাগিলাম—
পাইলাম রে পাইলাম—হুকুম নিয়া ছুটিলাম—
হুকুম হুকুম হুকুম রে—আর ডর নাই রে!
আর ডর না—ই!

সাঁওতাল পল্লীর নরনারীরা স্তব্ধ হয়ে শুনেছে সে গান।

"হুকুম হুকুম হুকুম রে, আর ডর নাই রে
আর ডর না—ই!"

নয়ন পাল বললে—শুনুন বাবু—

"শুন বাবু মহাশয় এ ছেলে তো ছেলে নয়,'
আসলে যুবতী হয় পুরুষের বেশে।
কুর্তা পরি তারপরে, চাদরের সাত ফেরে
যৌবন গোপন করে কাটিয়াছে কেশে।
চড়িয়া ঘোড়ার পিঠে, উল্কাসম চলে ছুটে,

হাসিতে খুশি ফাটে—বলে বোল হুকুম হুকুম।
এ মেয়ে রুকনী হয়
এ তো কভু ছেলে নয়।"

এ রুকনী। বাবু মহাশয়, তা হলে কিঞ্চিৎ গোপন বৃত্তান্ত শোনেন। এ জানতেন ত্রিভুবন ভট্‌চাজ মশায়। তিনি বলেছিলেন আমার ঠাকুরদাদাকে তাঁর শিষ্যকে।

সিধু সব বলেছিল ভট্‌চাজ মশায়কে দুর্গাপূজার সময়।

সেই রাত্রে মেয়েদের উদ্ধার করে ডিউইর মুণ্ডু নিয়ে তারা ভৈরবী মার কাছে এসেছিল।

মা ভৈরবী যজ্ঞ শেষ করে মুণ্ডুটা নিয়েই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গঙ্গার ধারে। সিধু কানুকে বলেছিলেন—আমি মরব রে, এবার আমার কাজ শেষ হয়েছে। তোরা ফিরে যা। ওরে, তোদের দুই ভাইয়ের উপর তোদের মরংবোঙ্গা দয়া করেছেন। বুঝতে পারছিস।

—হঁ বুঝছি। বুকে কি ফুঁ সাইছে। মাথায় কি শিসাইছে। বলেছিল কানু।

সিধু বলেছিল—হঁ। মন বুলছে তিনটা সাহেব কেট্যা কি হল? তিনটা মেয়্যাকে কেড়ে আনলম—তাথেই বা কি হল? ই দেশটা—আমাদের দেশটো কেড়ে লিতে হবেক। সাঁওতালেরা মরছেক—মরবেক। ধান যেছে পান যেছে জমি লিছে দিকুরা, স—ব লিছে।

—হ্যাঁ রে। সেই জন্তে বোঙ্গা তোদের পাঠিয়েছেন। মা কালী আমাকে বুলেছেন রে। শোন—বোঙ্গাকে ভক্তি করবি। গরীবকে মারবি নে। দুঃখীকে রক্ষা করবি। আর এই নে মা কালীর এই ছুরি। এ ছুরি আমার মা কালীর হাতে ছিল। এ তোদের বোঙ্গার ছুরি। আর কি বলেছিস রুকনীকে? রুকনী!

রুকনী এসে দাঁড়িয়েছিল নতমুখে। চোখ দুটি ফোলা ফোলা—সে কেঁদেছে।

সিধু বলেছিল—উদিগে চলে যেতে বললম। বললম—ইবার বোঙ্গার হুকুম হল—বোঙ্গা দেখা দিলেক। কাল তু যখন তুর কালী মায়ের পুজো করছিস তখুন মহুলাগাছের তলাতে দাদা আর আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। ম্যাঘের টোপর পরে তখুন বোঙ্গা দাঁড়ালেক। বুললে—আমি মরংবোঙ্গা! আর চক্ক ওই ভৈরবী দিলে—ইবার ছুরি দিবে। তুরা ইবার যা—মেয়্যাগুলোকে কেড়ে লে। সায়েবগুলার জান লে। তারপরে এই ছাশ তুদের ছাশ—তুরা কেড়ে লে। তুরা শুভোবাবু হলি। রাজা হলি। তুরা টাঙ্গি ধর কাঁড় লে ধনুক লে বলুয়া লে। দিকুরা পাপী—উরা সাঁওতালদিগে জানে মেলে, মানে মেলে, চাকর করলে। ধান লিলে পান লিলে কাঁড়া লিলে গরু লিলে জমীন লিলে। ই পাপ। সাঁওতালদিগে বাঁচাতে হবেক। বাঁচা—তুরা সাঁওতালদিগে বাঁচা। উরা কাঁদছে—উরা ভুখে মরছে। আমাকে ডাকছে। আমি তুদিগে দুই ভাইকে শুভোবাবু করলম। আমার হুকুম তুরা 'হুল' (বিদ্রোহ) কর। হাঙ্গামা কর। দিকুদিগে পুড়মান জেটদিগে কেটে তাড়ায়ে দে। ই ছাশে সাঁওতাল থাকবেক। তুদের ছাশ। আমি এলম—গাঁয়ে গাঁয়ে জহর সর্ণার আসব পুজা লিব। আমার হুকুম। রাতের আঁধারে বাঘের চোখের মত বোঙ্গার চোখ দুটো জ্বলছিল। আমরা বললম—বন্দুকের সাতে পারব আমরা? বুললে—পারবি পারবি। গুলি

জল হয়ে যাবেক। তাপরেতে বুললেক, না হয় তো আমার হুকুমে মরতে লারবি? বুকটা লাফায়ে উঠল—বুক বুললে—হাঁ পারব। বোঙ্গা হাসল।

থেমেছিল সিধু। কানু বলেছিল—আমরা মরদ ভৈরবী মা—আমরা শুভোবাবু হলম। আমাদের সাতে উরা কি করবেক? তা ছাড়া উরা কিরিস্তান। সাঁওতাল লয়। ধরম ছাড়লে। উরা কুথা যাবেক?

ভৈরবী বলেছিলেন—আমি যদি তুদের সঙ্গে থাকি লিবি না?

—হেই বাবা! লিব না? তাই হয়?

—তবে? ওদের কেনে নিবি না?

—উরা কিরিস্তান।

—না। ওরা সাঁওতাল। রুকনী আমার সঙ্গে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করেছে।

রুকনী এবার এগিয়ে এসে অসংকোচ নিজের বুকের আবরণ সরিয়ে দিয়ে বললে—এই দেখ এই দেখ। ছুরি দিয়ে চিরে মা কালীকে দিলম, বোঙ্গাকে দিলম। দেখ। লালের বুক দেখ। তবু কিরিস্তান বুলবি? দে, মা কি ছুরিটো দিলেক সিটো দে। এখুনি আবার চিরে ফেলায়ে তুরা শুভোবাবু তুদের পায়ে রক্ত দিব আমি। দে।

রুকনীর বুকের সারি সারি ক্ষতচিহ্নের দিকে তারা দুজনে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পর সিধু বললে—ফুল, টুশকি কাঁদবেক। তু ফিরে যা—

কথায় বাধা দিয়ে রুকনী বললে—না, কাঁদবেক না। কাঁদতে দিব না। আমি তুর চাকরানী হব। ফুলকে বুলব তু রাজার রানী, আমি চাকরানী। আমি সেবা করব। তুর হুকুম খাটব। লয়তো তুর সিপাহী হব।

—সিপাহী হবি! হাসলে কানু।

—হঁ তো কি! হব। বেটাছেলা সাজব; কাঁড় ধেনুক লিব। তুরা হুকুম করবি, আমি সি হুকুম মানব।

ভৈরবী প্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। তাঁর যাত্রাক্ষণ আসন্ন হয়ে উঠেছে। সূর্যের উদয়লগ্নের প্রতীক্ষা করছেন। তিনি হেসে বলেছিলেন—সিধু কানু নে ওদের নে। ওরা তোদের শক্তি। নে—আমি বলছি।

সিধু কানু পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে বোধ করি অনুমোদন চেয়েছিল—তারপর একসঙ্গেই বলেছিল—নিলম। মানলম তুর হুকুম।

ভৈরবী আর বিলম্ব করেন নি তাঁর যাত্রাপথে। সূর্য তখন উঠছে। উদয়দিগন্তে রক্তাভ সূর্য দেখা দিয়েছেন স্বর্ণকঙ্কণের একাংশের মত।

এ উপমা আমার নয়, এ উপমা নয়ন পালের। পাল বলেছিল—

"সূর্য মধ্যে মা চণ্ডিকা আপন কঙ্কণ রেখা

দেখাইয়ে সাধিকারে ইশারায় ডাকে।"

সে ইশারায় ডাক পেয়েই ভৈরবী 'মা' বলে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

আমি চোখ বুজে সেই ছবিটি দেখছিলাম মনের পটে। ব্যাখ্যা খুঁজছিলাম। কিন্তু নয়ন পাল এবার নতুন করে ছন্দে আরম্ভ করলে তার ছড়া। মনের সুর কাটল। নয়ন পাল এবার পয়ারে শুরু করলে—

"আলোর ছটায় ভাঙ্গে মন মধ্যে ঘোর—চল্ চল্, হাঁকে
শুভো হইয়াছে ভোর।
বলে চল, বলে চল, চল রে সাঁওতাল;
দেখিলে দিকুরা হবে বড় গোলমাল।
সাহেবান সিপাহীর বন্দুক তৈয়ার
দেখিলেই দম দম করিবে ফায়ার।
বন মধ্যে হবে চল পরামর্শ শলা
নিযুক্ত করিতে হবে আমলা ফয়লা।
সেনা চাই সেনাপতি ছঁশিয়ার দূত
নিয়া যাবে হুকুমনামা করিব প্রস্তুত।
এখন সকলি হবে গোপনে গোপনে
মাদল বাজায়ে পর মাতিব হে রণে।"

গভীর বনের মধ্যে সেদিনের রাত্রের গোটা দলটি গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সে প্রায় দুশো সাঁওতাল। না নিয়ে উপায় ছিল না। সে রাত্রে সায়েব তিনজনের মৃত্যুতে হৈ হৈ হবে। তারা অপরাধীদের খুঁজে বেড়াবে এ আশঙ্কা তাদের স্বাভাবিক। তারা গভীর বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে কয়েক দিন স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করলে। ওদিকে রাস্তাবন্দির সাঁওতালরা—যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না এসবের সঙ্গে—তারা বিপদ আশঙ্কা করে পালাতে লাগল। পালানোর পিছনে যেমন ছিল ভয় তেমনি ছিল তাদের রাগ। তিন তিনটে সাঁওতাল মেয়ে জবরদস্তি কেড়ে নেওয়ার জন্যে তাদের বুকে চাপা রাগ আগুনের মত ধোঁয়াচ্ছিল। সে রাত্রের এই ঘটনার পর তাদের বুকের আগুন জ্বলল। তারা পালিয়ে গিয়ে এখানে ওখানে রাজমহল অঞ্চলের সাঁওতাল এলাকায় দল বাঁধতে শুরু করলে। জঙ্গিপুরে সরকারের পাহাড়িয়া ফৌজ তৈরী হল বন্দুক নিয়ে।

কানু সিধু তার লোকজনদের নিয়ে পরামর্শ করে বললে, ইদের কাছে বোঙ্গার হুকুম পাঠাতে হবেক। ইয়া ইবার হুলের লেগে সাজুক।

কানু তৈরী করলে শালপাতায় সিঁদুরের টোপা দিয়ে হুলের হুকুমনামা।

সিধু দেখে খুশী হয়ে বললে—হঁ, ঠিক হইছেক। ঠিক এই চক্কের মতুন। কিন্তু নিয়ে যাবে কে? কারা?

লাল আর বিশু। হাঁ, তারাই যাবে। রাস্তাবন্দির সাঁওতালেরা চিনবে। ওরা যখন বলবে যে, তারা দেখেছে বোঙ্গার 'চক্র', বোঙ্গার 'ছুরি'—যখন বলবে বোঙ্গার দেখা দেওয়ার কথা—তখন তারা অবিশ্বাস করতে পারবে না। বলবে, বোঙ্গা কানু সিধু দুই ভাইকে শুভোবাবু (রাজাবাবু) করেছে।

—না। রুকনী টুকনী মানকী এবং আরও কিছু মেয়েরা যারা নতুন জমায়েতের সঙ্গে বনে এসেছে তারা সাঁওতালদের জন্তে রান্না করছিল। তাদের মধ্যে থেকে রুকনী এসে বললে—না। তা এখন বুলবি না।

বিরক্ত হয়ে কানু বললে—বুলবে না? কেনে? বোঙ্গা আমাদিকে শুভোবাবু করলেক, —বুলবে না?

—তুমি শুভোবাবু—আমি তুমাদের চাকরানী, আমি ই কথা বুলছি কেনে তা শুভোবাবু শুন। ই খবরটো জানাজানি হলে উরা সিপাহী নিয়ে বাগনাডি ছুটবেক। সিখানে জুলুম করবেক।

সাঁওতালেরা সকলেই বলেছিল—হঁ হঁ হঁ। ঠিক বুলেছ। শুভোবাবু এ মেয়া ঠিক বুলেছে।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রুকনী এসে বলেছিল—শুভোবাবু।

—হঁ।

—আমি একটা সিরিং (গান) করলম—তুমাদিগে শুনাব।

—সিরিং!

—হঁ সিরিং। এই হুলার সিরিং।

—হুলার সিরিং।

—হঁ—শুন।

সন্ধ্যায় কাঠের আগুন জেলে রুকনী টুকনী মানকী এবং আরও কটি তরুণী সেই গান গেয়ে নেচেছিল।

"শুকনা ধুল উড়ছে, মাটি পুড়ে গেইছে, ছাইর মতুন উড়ছে—আকাশ ঢেকে গ্যেল রে। জল হল নাই রে—জল হল না—ই!

মরংবোঙ্গা রাগলো, শুভোবাবু জাগলো, টাঙি নিয়ে ছুটলো, সাদা সায়েব কাটলো, কালো মেয়া কাড়লো, চোখের পানি মুছলো—আবার তারা হাসলো, ইবার জল হবে রে—আর ডর না—ই!

শুভোবাবু আসছে, শুভোবাবু আসছে, শুভোবাবু ওই ওই আসছে, ঘোড়ায় চড়ি আসছে, টগবগিয়ে আসছে—ওরে ডর নাই রে, আর ডর না—ই!"

সিধু উৎসাহভরে বলেছিল—বাঁশী—বাঁশীটো দে।

কানু বলেছিল—না। সে সিধুর হাত চেপে ধরেছিল। তু শুভোবাবু উ চাকরানী! না।

গানটা সেই দিন শিখে নিয়েছিল লাল আর বিশু। তাদের সঙ্গে আর কজন। তারা সকলেই ছড়িয়ে পড়বে এই অঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে।

নয়ন পাল বললে—

"রাজমহল জঙ্গিপুরে উঠে হুলহুলা
সিধু বলে দাদা কানু—এইবারে দেলা।
দেলায়া বাগনাডিহি হয়েছে লগন—"

রুকনী টুকনী মানকী দাঁড়িয়েছিল—তারা পরিচর্য করছিল শুভোবাবুদের। মানকী দুই ভাইয়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল, রুকনী টুকনী দুজনে শুভোবাবুদের কুর্তা চাদর ঠিক করছিল। এর মধ্যেই চারিদিকের বাজার-হাট লুট করে তারা কাপড় কুর্তা ফিতা চাবকী চাল ডাল টাকা পয়সা যোগাড় করেছে। লোক ক্রমে ক্রমে বেড়ে বেড়ে শ চারেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘোড়াও পেয়েছে তারা গোটা কয়েক। দেশী টাট্টু ঘোড়া।

নয়ন বললে—ও অঞ্চলে আজও ঘোড়ার চলত আছে বাবু। হিরণপুরের হাটে অনেক ঘোড়া আজও বিক্রি হয়। সে সময় ঘোড়ার চলত ছিল আরও অনেক বেশী।

মানকী রুকনী টুকনীও বলে উঠেছিল—হঁ। লগন হইছে শুভোবাবু।

কানু খানিকটা চোখ বুজে ভেবে বলেছিল—হঁ লগন হইছে। ইবার উঠ্।

—তার আগে শুভোবাবু।

—হঁ।

—খত পাঠাও, হুকুম পাঠাও, ইপাশে রাজমহল জঙ্গিপুরে বারা গেইছে লাল গেইছে যেমুন তেমুনি পুচ্ছিম দিকে শালপাতার খত নিয়া হুকুম পাঠাও। তুমরা যাবেক, তুমাদের সাতে মরংবোঙ্গা যাবেক—লোকেরা জানুক, তৈয়ের হোক—

—হঁ। ঠিক কথা বুলেছে। ঠিক ঠিক।

সাঁওতালরাও বলেছিল—এ কথা ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে শালপাতার খত বোঙ্গার আদেশ শুভোবাবুর হুকুমনামা তৈরী হয়ে গিয়েছিল; হুকুমনামা যাবে আগে তারপর যাবে শুভো-বাবুরা। কিন্তু বাগনাডিহি পৌঁছানোর আগে খুব হুলা করা হবে না। এ অঞ্চলে সবাই দিকু। দু চার জন নীলকুঠির সাহেব আছে—রেশমকুঠি আছে। মহেশ দারোগার মত দত্যি আছে। এখন যাবে তারা রাত্রে রাত্রে। এবং ছোট ছোট দলে। তবে তার আগে যাবে হুকুমনামা।

ঝাণ্ডা পোঁতো, রাস্তাঘাট সাফ করো, তীর শানাও। মরংবোঙ্গার হুকুমে আসছে শুভোবাবু।

সেদিন গভীর রাতে সিধু বসে ছিল। একলা বসে ছিল—ভাবছিল সে। তার সামনে গোটা অঞ্চলটার ছবি ভাসছে। তার সঙ্গে তার মন কল্পনা করে চলেছে কয়েক দিনের মধ্যে যা হবে তার ছবি।

মনে জাগছে ভীম মাঝির ছেলের মুখ। ভীম মাঝি, সেই ভীম মাঝি বড় ভাল লোক। সাহসী মানুষ; সত্যিকথার মানুষ। সেই লোককে জেলে পুরেছে। মনে পড়ছে হাড়মা মাঝিকে। হাড়মা মাঝি বলেছিল—আমাদের জান গেল মান গেল ধান গেল জমীন গেল, সারেব, জীবন

গেল—সাঁওতালেরা জীবনভোরের নফর হয়ে গেল। মনে পড়ছে মহিন্দর ভকতের সেই অপমান। মনে পড়ছে মহিন্দর ভকতের টাকায় বাঁধাপড়া মাঝিদের। মনে পড়ছে বিশু মাঝির বুক চাপড়ানো। মানকী রুকনী টুকনীকে কেড়ে নিয়েছে সাহেবরা। মনে পড়ছে বাপ চুনার মাঝির মৃত্যুর কথা। মানকীর দুঃখ আর বংশের অপমানের দুঃখ তার বুকে ওই মরংবোঙ্গার গাছটার মাথায় বাজ পড়ার মত পড়ে তাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। সে সইতে পারলে না, মরে গেল। বুকে তাদের দু ভাইয়েরও লেগেছিল তার চেয়েও বেশী। হাঁ, তার চেয়েও বেশী। শুধু মানকী নয়, তাদের মুর্মুবংশের অপমান নয়, সেই আঘাতে বাপের মৃত্যু নয়—আরও ছিল। ওই রুকনীর টুকনীর জন্তে দুঃখ জ্বালা তাদের হয়েছিল। তাদের বাপ যখন তাদের দুই বোনকে নিয়ে পালিয়ে যায় তখন থেকে তারা এই মেয়ে দুটোকে মনে মনে ঘেন্না করত। মধ্যে মধ্যে মনে হত, মরে যাক ওরা মরে যাক। ফুলকে বিয়ে করেছে, ফুল ভাল মেয়ে, বড় ভাল মেয়ে, নরম মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে, ভাতের মত মিষ্টি মেয়ে, পেট ভরে, মন জুড়োয়। কিন্তু রুকনী মহুয়ার ফুল, যেমন মিঠা তেমনি মাদকে। নেশা ধরায়। সিধুর মাদলে ফুল নাচে—নাচতে নাচতে মেতে ওঠে কিন্তু রুকনী তার মাদলের সঙ্গে নাচত, নিজের নাচের সঙ্গে সিধুকে নাচাতো। সেদিন তাই তার জন্তেও তার বুকে জ্বালা ধরেছিল। কানু দাদার বুকও জ্বলেছিল। টুকনীকেও সে এমনি ভালবাসত। তার শোধ হয়েছে। সাহেবদের মেরে তাদের কেড়ে এনেছে ওরা। তার মন খুঁতখুঁত করে—রুকনীকে উদ্ধার করতে হয় নি। সে নিজে সায়েব মেরে বেরিয়ে এসেছে। ভৈরবী মায়ের দয়া সে-ই আগে পেয়েছে। তবু এখনও বুক জ্বলছে। মা ভৈরবী বলে গেছে মরংবোঙ্গার কথা সে শুনেছে—সাঁওতালদের বড় দুখ। বড় দুখ। বড় দুখে তাদের পরান'গুলি কাঁদছে কাঁদছে কাঁদছে।

সে কান্না থামাতে হবে। মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে তার—এ কি করে হল? এমন কেন হয়? সঙ্গে সঙ্গেই মন বলে—বোঙ্গা বলেছে সাঁওতালদের দুখ দূর করতে তোকে এমন করলম। ই কাম তোকে করতে হবে। ই তোদের দেশ বটে। তোদের দেশ।

হাঁ, তাদের সে দেশ—পূর্বে এই গঙ্গা নদী—দক্ষিণে হুই বর্ধমানের এলাকায় দিকুদের এলাকা—এর মধ্যে এই পাহাড় জঙ্গল বনবাদাড়, নদীনালা, মাঠঘাট, ক্ষেতখামার, গাছপালা জন্তুজানোয়ার পাখি ফড়িং—সব তাদের। সব তাদের। হাঁ, তাদের।

ই সব কেড়ে নেবার জন্তে শুভোবাবু হল তারা।

মরংবোঙ্গা হুকুম দিলে। মা ভৈরবী 'চক্ক' দিলে, মা কালীর ছুরি দিলে।

সাঁওতালদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তারা ছুটবে। পিছনে পিছনে হাজারে হাজারে সাঁওতাল। টাঙি বল্লম কাঁড় ধনুক নিয়ে ছুটবে। হাতে মশাল জ্বলবে। মাদল বাজবে—ধিতাং ধিতাং ধিত্যাং তাং। ধিতাং ধিতাং—

শুভোবাবু আসছে—শুভোবাবু আসছে—শুভোবাবু আসছে, ঘোড়ায় চড়ে আসছে, টগবগিয়ে আসছে—আর ভয় নাই রে—আর ভয় না—ই।

আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল। ইচ্ছে হল বাঁশীটা নিয়ে গানটা বাজায়। বাঁশীটা টেনে নিলে সে। না। রাখলে বাঁশীটা। বাঁশী নয়। কানু দাদা মানা করেছে।

কাল হুকুমনামা নিয়ে লোক ছুটবে। লোক ছুটবে সকালে। তারা রওনা হবে বিকেলে। বাঁশী নয়।

হঠাৎ কে ডাকলে—শুভোবাবু!

সিধু ফিরে দেখলে কিন্তু তাকে চিনতে পারলে না। সে এক পনের ষোল বছরের সাঁওতাল ছেলে কিন্তু সাধারণ সাঁওতাল ছেলের মত নয়; খোলা গা, পরনে খাটো কাপড়—সাঁওতাল ছেলে নয়—এর গায়ে কুর্তা, পরনে মালকোঁচা মেরে পরা কাপড়, গায়ে কুর্তার উপর মোটা চাদর, বামুনের পৈতের মত করে টেনে বাঁধা, মাথায় পাগড়ি—তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—

—কে তু? কে?

—আমি তুর চাকর। হাসলে সে খিলখিল করে।

ভ্রম ভাঙল সিধুর। সে বলল—রুকনী?

—হঁ। ইটো রুকনী! তুমার চাকরানী—চাকর সেজেছে। তুমার কাম করবার লেগে। শুভোবাবু আমি যাব? আমাকে তুমি পাঠাও গ।

—কুথা? কুথা পাঠাব?

—হুকুম নিয়া যাব আমি। পথে পথে গাঁয়ে গাঁয়ে খত দিয়া হুকুম দিয়া চলে যাব বাগনাডিহি। সিখানে রানীকে বলব গা—উঠ রানী উঠ, আমি তুমার চাকরানী। তুমি উঠ।, রাজা আসছেক।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সিধু তার মুখের দিকে। রুকনী নাকের গয়না খুলেছে, কানের গয়না খুলেছে, চুলগুলো কেটে খাটো করে ফেলেছে। বেটাছেলের মত চাঁচর চুল করেছে। কিন্তু অপরূপ লাগছে তাকে।

—তু গয়না খুললি, চুল কাটলি?

—তুমার কাম করব বলে শুভোবাবু! তুর খত লিয়ে যাব। আমাকে একটো ঘোড়া দে। আমি চড়তে জানি শুভোবাবু। লাল কাম করবার লেগে একটো ঘোড়া পেয়েছিল। চিঠি নিয়ে যেতো সাহেবদের। আমি চড়তম। আমাকে ঘোড়া দে; আমি বেটাছেলে সাজলম—ইবারে ঘোড়া ছুটায়ে যাব আর বলব—আসছে শুভোবাবু আসছে! আর ডর নাই। ঝাণ্ডা টাঙা তুরা ঝাণ্ডা টাঙা—সব সাফাসুফা কর। আসছে শুভোবাবু আসছে।

—রুকনী, তুকে আমি সাগাই করব—তু রানী হবি!

—না। ফুল কাঁদবেক। আমি তুমার চাকরানী শুভোবাবু! ফুলের চাকরানী। শুধু আমাকে তুমার চাকর কর শুভোবাবু, সিপাই কর। তুমি লড়াই করবে, আমি তুমার সাতে থাকব। টাঙি লিব, ধেনুক কাঁড় লিব—লড়ব আমি তুমার পাশে দাঁড়ায়ে।

—রুকনী!

"হেনকালে কানু এসে কহিল গম্ভীর—
কয় দিনে কানু যেন হল মহাবীর।

চণ্ডিকার দয়া হৈলে এইরূপ হয়;
খঞ্জতে পর্বত লঙ্ঘে বোবা কথা কয়।
রক্তরাঙা চোখ তার কপালে ভ্রুকুটি;
হাঁড়ি হাঁড়ি মদ খায় ঘন ঘন চুটি।
টুকনী পাশেতে থাকি সদা করে সেবা;
টুকনী রুকনী নহে নারী মনলোভা।
আঁচলে বাতাস করে যোগায় হাঁড়িয়া;
খরগোশ মাংস দেয় বলুং গুঁড়িয়া।
কানু এসে ডাকি কয় শুন সিধু ভাই;
রাজা হয়ে ফাঁকা ঠেকে পাশে রানী নাই!
টুকনীরে করিনু রানী কপালে তাহার
সিঁদুর ঘষিয়া দিনু—মরি কি বাহার!
আমি বলি তুমি কর রুকনীরে বিয়া;
সমারোহে ফিরিব হে পাশে রানী নিয়া।"

সিধুর আগে রুকনী কথা বলেছিল।

"শুভোবাবু দাদা শুন, কহিল রুকিনী—
আমি রব চাকরানী সঙ্গের সঙ্গিনী।
পুরুষের বেশ ধরি রব সাথে সাথে—
যুদ্ধ শেষে সাদী হবে আনন্দ তাহাতে।
যুদ্ধ শেষে রণক্ষেত্রে পাতিব বাসর—
গড়িব মনের সুখে অতঃপর ঘর।"

সিধু উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল—হাঁ সেই ভাল, সেই ভাল, খুব ভাল।

কানু বলেছিল—হাঁ সি খুব ভাল হবে। টুকনী আমার মিঠা মিঠা বহু। উ রাঁধে ভাল, যতন করে ভাল। উ সাতে থাক আমার। তবে তুরা আমোদ কর। আমি চললম।

রুকনী বলেছিল—আমাকে কাল যেতে হুকুম দিছ?

—হাঁ দিলম। সিধুর তাই মন। তু যা বারহেট বাজার হঁয়ে বাগনাডিহি। আর ডোমন যাবেক বেনাগড়ের দিকে। জামুরো গাঁয়ের মণি পরগনায়েত আর বারমাসিয়া গাঁয়ের রাম পরগনায়েতের কাছ হঁয়ে ওই পথে চলে আসবেক বাগনাডিহি। রাম আর মণি পরগনায়েত তেজী লোক। তাদিগে আমরা ফরমন দিব—তারা উদিকে ছুটু শুভোবাবু হবেক। আমরা বড় শুভোবাবু—তারা ছুটু শুভোবাবু। নারাণপুরের সাহেব নীলকুঠি আছে; নারাণপুরের দিকু জমিদার আছে। হুল আরম্ভ হলেই কাটবেক। নারাণপুর লুটবেক। আর ভোলা মাঝি যাবেক মাঝখান দিয়ে হিরণপুরের হাট হয়ে লিটিপাড়ার পথে। "হুকুম হইছে।

শুভোবাবু আইছে। ঝাণ্ডা পোঁতো। সাফা করো সব।" আর একজনা যাবেক পাকুর হঁয়ে।

টুকনী ওদিকে এসে কখন দাঁড়িয়েছিল। সে মনোরমার মত সেজেছে। চুলে ফুল পরেছে, কানে ফুল পরেছে, হাতে ফুল পরেছে, কপালে সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। হাঁড়িয়ার নেশায় যেন বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে নাচছে।

সে বলেছিল—এস আমার শুভোবাবু হে!

কানুর হাত ধরে সে চলে গেল। সিধু বললে—হাঁড়িয়া আন রুকনী। আমার রুকনী হে! রানী হে।

—না। আমি শুভোবাবু সিপাহী হে! বলে সে এনেছিল দেশী মদের বোতল।—এই খাও হে!

সিধু তার কোমর জড়িয়ে ধরে তার মুখপানে তাকিয়ে বলেছিল—বড় সোন্দর সিপাহী হে! সিপাহী তু নাচ জানিস—

—হঁ।

—নাচ্ হে!

—শুভোবাবু আমার বাঁশী বাজাক হে! ছাড় হে!

—না হে! না হে! একটু পর বলেছিল—তু যাস না সিপাহী।

—না শুভোবাবু আমার বড় সাধ হে! আমি ঘোড়া ছুটায়ে যাব গাঁয়ে গাঁয়ে, হুকুম বুলব, খত দিব। আর সিরিং করব—

শুভোবাবু আসছে শুভোবাবু আসছে
ঘোড়ায় চড়ে আসছে
টগবগিয়ে আসছে, আর ডর নাই রে—
আর ডর—না—ই।

১৮৫৫ সালে আষাঢ় মাসে নিদারুণ অনাবৃষ্টিতে সূর্যের প্রখরতম উত্তাপে সাঁওতাল পরগনার ধুলো হয়ে যাওয়া লালমাটি ঘোড়ার ক্ষুরে উড়ছে। আমার মনশ্চক্ষে আমি দেখছিলাম। ঘোড়সওয়ার বাগনাডিহির ধারে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যে গ্রামের পথ সেই পথ ভেঙে ঢুকে গেল।

ওদিকে রামপুরহাট অঞ্চলে নারাণপুর হয়ে ছুটছে ডোমন। সে ঘোড়ায় যায় নি। সে চলেছে কুর্তা পরে, পাগড়ি বেঁধে, টাঙি বলুয়া কাঁড় ধনুক নিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে। মণি পরগনাত হো—রাম পরগনাত হো।

মাঝখানের অঞ্চল দিয়ে চলেছে ভোলা মাঝি। বাঁশলই নদীর কিনারা ধরে পশ্চিমমুখে।

নয়ন পাল বলছিল—

"হুকুম হুকুম রব দেশে ছড়াইল।

গাঁয়ে গাঁয়ে ধ্বজা সব উচ্চে উড়াইল ॥
চুলবুল করে সব যতেক সাঁওতাল।
শুভোবাবু আসিবেক আজ নয় কাল ॥
এদিকে হিন্দুরা সব জমিদার গেরস্ত।
যম সব মহাজন করিল মনস্থ ॥

আর নয় আর নয় বাড়ে বড় বাড়।
সময়ে বর্বর জাতে কর ছারখার ॥
জদ্দিপুর হতে আসে হাকিমের লোক।
সঙ্গে লয়ে পরওয়ানা—সব করে ক্রোক ॥
বাটি ঘটি কাঁড় গরু গোলা ভেঙে ধান।
সঙ্গেতে দারোগা আছে যমের সমান ॥
কেহ যদি কহে কথা তারে ধরে বাঁধে।
টেনে নিয়ে যায় থানা ঘরগুষ্টি কাঁদে ॥

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় সমান সবাই।
বামুন কায়েত বদ্যি ভকত কসাই ॥
গরীবের ক্রন্দনেতে আকাশ মলিন।
বোঙ্গা বলে ভয় নাই আসিতেছে দিন ॥

পয়ার প্রসঙ্গে কয় বিপ্র ত্রিভুবন।
আকাশে চণ্ডিকা মাতা করয়ে গর্জন ॥
তাঁর কাছে নাই বাপা রাজা প্রজা ভেদ।
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কভু নাহিক প্রভেদ ॥

যে পাপ করিবে তারে দণ্ড দেন তিনি।
তারই লাগি নিরাকারা সাকারা জননী ॥
মা চণ্ডী তাথৈ নাচে তাথৈ নাচে রে।
ক্ষ্যাপা শিব শিব হয়ে চরণ যাচে রে।
মা চণ্ডী তাথৈ তাথৈ তাথৈ নাচে রে ॥"

ইতিহাস কল্পনা সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ত্রিভুবন ভট্টাচার্জের পয়ার প্রবন্ধ যেন ছবি হয়ে ফুটছিল মনের মধ্যে।

"হু হু করে বাড়ে পাপ উনত্রিশ দিন।
ত্রিশ দিনে পড়ে মাথে বজ্র সুকঠিন ॥

চণ্ডীর বিচারে পাপ ফলে রে ফলে রে।
বাঁধিয়া সাঁওতাল লয়ে মহেশ চলে রে।"

মহেশ দারোগা। সাঁওতাল অভ্যুদয়ে মা চণ্ডীর কাছে প্রথম বলি। অন্ততঃ ত্রিভুবন ভট্চাজ তাই বলে গেছেন তাঁর পয়ারে। তিনি মহেশ দারোগাকে মহিষাসুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চেহারায় চরিত্রে বেশ একটা মিল তিনি দেখিয়েছেন। ত্রিভুবন ভট্চাজের তুলনা বা উপমা তাঁর নিজস্ব। তিনি সিধু কানুকে কালকেতু বিরূপাক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন—বলেছেন জন্মান্তর নিয়ে চণ্ডীর আদেশে মর্তে তারা এসেছিল সাঁওতালদের ত্রাণ করতে। নিজের কন্যাকে বলেছেন—সে ছিল চণ্ডিকার সহচরী বা কিঙ্করী। রুকনী টুকনীকে ইঙ্গিতে বলেছেন সিধু কানুর শক্তি। একজন মনোরঞ্জিনী, একজন উৎসাহদায়িনী। দীর্ঘ পয়ারে বীরভূমের ছোট শুভোবাবু মণি পরগনাত এবং রাম পরগনাত এদেরও এক একটা পূর্বজন্ম আবিষ্কার করেছেন। ১৮৫৫ সালের বৃদ্ধ ত্রিভুবন ভট্চাজের বিশ্বাসের ভিত্তিতে তা কল্পনায় সত্য এবং স্বাভাবিক হলেও আমার কাছে তা নয়। আমি ইতিহাসের ধারায় এর মধ্যে দেখছিলাম সেই পুরাতনের পুনরাবর্তন। নিপীড়িত মানুষ বা গোষ্ঠী বা জাতি ক্রমশঃ সর্বরিক্ত হয়ে পেটের জ্বালায় বুকের দহনে একদিন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে তার ভিতরের আগুন নিঃশেষিত করে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়। ধর্ম বিশ্বাস ঈশ্বর ইজ্জত—এই কয়েকটার সমষ্টি একটা কিন্তু উদরের জ্বালার সঙ্গে এক হলেই বিস্ফোরণ ঘটে। এটাকে বাদ দিয়ে শুধু একটাতে হয় না। একটা জাত বা একটা দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে প্রচুর আহার্য আর সুখসম্পদের আফিং দিয়েও তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। আবার শুধু স্বাধীনতা দিয়ে নিরন্তর দুর্ভিক্ষ এবং অনন্ত দুঃখদুর্দশার মধ্যেও স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তাকে শান্ত রাখা যায় না। তারা তাতেও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, চিৎকার করে। দুটোর রিক্ততার সমষ্টি একসঙ্গে হলে তো কথাই নেই।

আমি ভাবছিলাম ওই কটা মানুষের কথা। যারা এগিয়ে এল—বললে—এ আমাদের দেশ। আমরা রাজা। যারা ইংরেজের বন্দুক—ভদ্র হিন্দু জোতদার জমিদার মহাজনদের কুটিল চক্রান্তের উপর খড়্গাঘাত করে আলেকজাণ্ডারের মত গর্ডিয়ান গিঁঠ কাটতে চেয়েছিল। শেকল কাটতে চেয়েছিল। আর তার সঙ্গে ওই কটি বিচিত্র মেয়ে। রুকনী আর টুকনী আর মানকী। মানকী লালের সঙ্গে মেতেছিল মুরশিদাবাদ অঞ্চলে। রুকনী টুকনী সিধু আর কানুর সঙ্গে। তারা কোথায় পেলে এই আশ্চর্য আগ্রহ আর উৎসাহ! নারীর হৃদয় বিচিত্র—তার প্রকাশ বিচিত্র। মহেশ দারোগা—মহেশ্বর লাল—লালা কায়স্থ—মহেশপুর থানার জবরদস্ত দারোগা—তার সাহস তার দুর্দান্তপনা এবং ওই ভকত ও জমিদার জোতদারদের মিলিত শক্তি তখন দেশে আতঙ্ক।

আমড়াপাড়ায় কেনারাম ভকতের বাড়ি। সেখানে সেদিন মহেশ দারোগা এসে গর্তু সাঁওতালকে বেঁধেছিল পিছমোড়া করে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যে একটা খুনের চার্জ। গর্তু কেনারামের দাসত্ব স্বীকার করতে চায় না। সে বলে—সারা জীবন খেটেছি। তাতেও যদি দশ টাকা দেনা শোধ না হয়ে থাকে তো হল না। ও দেনা নাই। আমি খাটব না।

বার বার বলেছে—না না না।

আর বেঁধেছে পীপড়ার 'কালান হাড়মা' মুর্মুকে। হাড়মা মুর্মু মানী লোক। তার জমি আছে, কাঁড়া গরুর পাল আছে, ঘরে ধান আছে। কেনারামের দাবি তার জমির উপর। সে তা কিছুতেই বেচবে না। ধান সে তার কাছে ধার নেবে না। কিন্তু বিচিত্রভাবে জঙ্গিপুরের কোর্ট থেকে তার সমস্ত কিছুর উপর ক্রোক পরওয়ানা এসেছিল, যেমন এসেছিল লিটিপাড়ার ভীম মাঝির উপর। এবং যেমন ভাবে ভীম মাঝি কিছু ক্রোক করতে দেয় নি সেই ভাবে। সে আদালতের পেয়াদা এবং কেনারামের পালোয়ান চাপরাসীদের ভাগিয়ে দেওয়ার জন্ত মহেশ্বর দারোগা থানার সিপাই নিয়ে এসেছে সমস্ত ক্রোক করবার জন্ত এবং সরকারী লোককে কাজে বাধা দেওয়ার জন্ত তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। তাকেও পিছমোড়া করে বেঁধে মহেশ দারোগা দুপুরবেলা তার দলবল নিয়ে রওনা হল। সে যাচ্ছে ঘোড়ায়—তার সঙ্গে কেনারামও তার নিজের ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে রওনা হল। সিপাহী এবং কেনারামের পালোয়ানের দল তাদের দড়ি বেঁধে নিয়ে চলল। গর্ভুর ফাঁসি হবে—হাড়মা মাঝির জেল।

রওনা হবার মুখে এসে দাঁড়াল একটা চৌকিদার।

—হুজুর!

মহেশ দারোগা আধখানা পাঁঠা এবং একটা পুরো বোতল মদ খেয়ে—, উপমা খুঁজে পাচ্ছি না বলেই ত্রিভুবন ভট্টাচার্জের 'মহিষাসুর' উপমা নিচ্ছি, মহিষাসুরের মত সদম্ভে রক্ত-চক্ষু হয়ে ঘোড়ায় চড়েছে। কেনারামের উপমা পাচ্ছি না, কারণ পুরাণে অসুরদের মধ্যে কেউ মহাজন ছিল না।

চৌকিদারটা জোড়হাতে মূর্তিমান পিছন-ডাকার-বাধার মত বললে—হুজুর! তাও পিছন থেকে নয়, সামনে থেকে।

গর্জন করে উঠল মহেশ দারোগা—এ্যাও শালা!

চমকে উঠল চৌকিদারটা। দারোগা বললে—কি? কি? কি?

—হুজুর! সবাই বলছে শুভোবাবু এসেছে!

—'শুভোবাবু?' শুভোবাবুর অর্থ বিপ্লবী নেতা—রাজা; তাই সবিস্ময়ে দারোগা এবং প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই কেনারাম বললে—শুভোবাবু?

—হেঁ হুজুর তাই বলছে লোক। বলছে রাতের আঁধারে মশাল জেলে ঘোড়ায় চড়ে শুভোবাবুরা এসেছে। দুটো শুভোবাবু।

—কোথায়?

—জানি না হুজুর, বলছে রাতে এসে জঙ্গলে ঢুকে গেল। ওই বাগনাডিহির ধারে। আর—। থেমে গেল সে।

—আর কি? জলদি বল শালা! হাতের চাবুকটা দারোগা আস্ফালন করলেন।

—আর সকালবেলাতে যখন কোরক হচ্ছিল তখন একটা সাঁওতাল ছেলে—সি কুর্তা পরা ছেলে—টাটু ঘোড়াতে চড়ে গেল ইদিক থেকে। সি চেঁচাইছিল—হুকুম এল হুল হুল।

দারোগা একমুহূর্তের জন্য ভুরু কুঁচকে ভেবে নিয়ে বললে—চলো! কুছ ডর নেহি। আমি কোম্পানীর থানার দারোগা। শির নিয়ে নেব শালাদের। চলো।

সত্যই আগের দিন রাত্রে মশালের আলো জেলে একদল মানুষ এসে ঢুকেছে বাগনাডিহির উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে। সেই জহর সর্দার থানে। ঘোড়ার উপর ছিল দুজন। শুভোবাবু? সেখানে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিশোর সাঁওতাল ছেলের বেশে 'রুকনী'।

সে বাগনাডিহি এসে ফুলের কাছে বলেছে সে সিধু শুভোবাবুর চাকর।

—চাকর! তু—?

হেসে ছেলেটা বলেছে—চাকর সিপাই। তুমারও চাকর, তুমারও সিপাই।

পিছন থেকে টুশকি এসে তাকে জাপটে ধরে বলেছিল—তু শালা চাকর? বলে তার মাথার পাগড়িটা টেনে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে ধরতে পারে নি, কারণ চুল রুকনী পুরুষের মতই কেটে ছোট করেছিল, বিন্যাস করেছিল। টুশকি তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা ঝাঁটা তুলে পিটতে পিটতে বলেছিল—বুল তু কে। রুকনী না টুকনী বুল বুল।

রুকনী কাঁদে নি, খিলখিল করে হাসতে হাসতেই বলেছিল—আমি ফুলরানীর চাকরানী, সিধু শুভোবাবুর চাকর। বাবা রে, বাবা আর কতো মারবি গ?

—ফুল টুশকির হাত ধরে বলেছিল—মারিস না।

—মারব না!

—না।

হেসে ফুল বলেছিল—তার যদি মন হইছে তো তু মেরে কি করবি?

রুকনী বলেছিল—হেই টুশকি রানী তু হুলাস না। তা হলে তাদের বিপদ হবেক। থানা আসবেক, সিপাই আসবেক, ধরে নিয়ে যাবেক তাগিদে। চুপচাপ থাক। তারা আসুক আগে।

এবং সারারাত্রি পুরুষের বেশেই বাইরের খাটিয়ায় শুয়ে ছিল। ঘরের মধ্যে শুয়েছিল ছেলেদের নিয়ে ফুল আর টুশকি। রুকনী সারারাত ধরে তিন পাহাড়ীর ঘটনা বর্ণনা করে বলেছিল—উরা দু ভাই, মরংবোঙ্গার দেখা পেলেক, মা ভৈরবী বুললে কালীমায়ের কথা। তারা দু ভাই ই দেশের রাজা হবেক। সায়েবদিগে দিকুদিগে কাটবেক, তাড়ায়ে দিবেক।

অবাক হয়ে গিয়েছিল ফুল আর টুশকি। টুশকি একবার বলেছিল···মিছা কথা।

—ন গ রানী, আমি সিখানে ছিলম। আমি দেখলম সব বসে বসে।

ফুল টুশকি দুজনেই নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ফুল জিজ্ঞাসা করেছিল—তু বুললি তু একটো সায়েবকে কিরিচ বিঁধে বিঁধে মারলি—

—হঁ। সি কিরিচ আমার কাছে রইছে।

—তু বুক চিরে চিরে রক্ত দিলি?

—হঁ। সি দাগ আমার বুকে রইছে। দেখ তুরা হাত বুলায়ে দেখ!

—তু ল কাটলি, বেটাছেলে সাজলি?

—হঁ—সিধুবাবুর সিপাই হলম—তুমার চাকরানী হলম।

—হুঁ। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল ফুল।

—ফুলরানী!

—কি হল গ?

—কিছু না। তু ঘুমো।

কিন্তু রুকনী বুঝতে পেরে বলেছিল—না রানী, আমি চাকরানী থাকব গ, রানী হব না।

উত্তর দেয় নি ফুল। পরের দিন ভোরে আবার বেরিয়ে গিয়েছিল রুকনী। ফিরেছিল সন্ধ্যাবেলা। সেদিন তাকে একলা পেয়ে ফুল জিজ্ঞাসা করেছিল—রুকনী!

—বুল রানী।

—তু চাকর সিপাই হলি ক্যানে? কিসের লেগে?

—হ—ল—ম। একটু চুপ করে থেকে সে বলেছিল—রানী, সি রাজা হল—মরংবোঙ্গা সাঁওতালদের দুখ ঘুচাতে বললেক। দেখলম সিধু সত্যি রাজা হয়ে গেল। বললে—মরি মরব। দুখ ঘুচাব। শোধ লিব। সায়েবদের সঙ্গে লড়াই করলেক—বন্দুকের সাতে। আমি মশাল ধরে পাশে ছিলম! দেখলম সি তার কি চেহারা গ! তারপরে সি শুভোবাবু হল। আমার সাধ হল শুভোবাবুর আমি সেবা করি, সাতে সাতে থাকি। মেয়া হয়ে কি করে থাকব। তাথেই বেটাছেলে সাজলম। সিপাই হলম্। শুন—শুভোবাবুর গান আমি করলম—শুন।

সে গানটা গেয়ে তাকে শুনিয়েছিল। "শুভোবাবু আসছে, ঘোড়ার চেপে আসছে—টগবগিয়ে ঘোড়ায় চেপে আসছে—আর ডর নাই গ—আর ডর না—ই—"

ফুলের চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়েছিল হঠাৎ। রুকনী বলেছিল—রানী, তুমি কাঁদছ! ফুল বলেছিল—আমি লারব তা রুকনী, আমার গিদরা দুটো নিয়ে—আবার পেটে একটো—সি তো লারব রুকনী, তুর মতুন সাতে সাতে থাকতে। তুকে আমি দিলম। তু থাকিস, সাতে সাতে থাকিস। আমাকে তার ভাল লাগে নাই। ইসব আমি লারি তো। তু পারিস। উকে দিলম তুকে। তু ইয়ার লেগেই বেটাছেলে সেজেছিস, সিপাই হলছিস। আমার কাছ থেকা কেড়ে লিতে! আমি জানি হে। তা আমিই তুকে দিলম।

রুকনী মাথা হেঁট করে চুপ করে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর বলেছিল—না রানী, আমি চাকরানী। কাল সি আসবেক, দেখিস আমি তুকে রানী করব।

পরের দিন রাত্রে এল শুভোবাবুরা। সঙ্গে তাদের দুশো সাঁওতাল। তারা সিপাহী। এক হাতে মশাল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল রুকনী। অন্য হাতে সে ধরেছিল ফুলের হাত।

এগিয়ে এসে হেসে বলেছিল—শুভোবাবু এই লাও তুমার রানী।

সকালবেলা সেই জহর সর্দার ধারে বসেছিল সিধু কানুর প্রথম কাছারী। ইতিহাসে আছে এবং ত্রিভুবন ভট্‌চাজের পটের পাঁচালীতেও আছে—সিধু কানু স্নান করে নতুন কাপড় পরে

মাথায় পাগড়ি বেঁধে তাতে একগোছা ময়ূরের পালক গুঁজে পুঁতির এবং রূপোর (রূপদস্তার) নয়) বালা এবং বুকে মোটা চাদর পৈতের চঙে বেড় দিয়ে বেঁধে এসে বসেছিল সেই পাথরের উপর।

ছিল সবাই—ছিল না শুধু রুকনী। সিধু জিজ্ঞাসা করেছিল—সি কুথা ?

সকলে চুপ থেকেছিল। টুশকি বলেছিল—সি ফুলকে রানী হয়ে বসতে দেখতে লারবেক না, তাথেই পালালছে।

ফুল বলেছিল—না। তারপর মৃদুস্বরে বলেছিল—সি খুব ভোরবেলাতে সেই ঝুঁপকি থাকতে উঠেছিল। আইছিল ইখানে সব সাফ করবার লেগে। সে দেখেছে কি ওই পেট-মোটা রাক্ষস দারোগা সি তার দলবল নিয়ে কুথাকে গেল। দখিন মুখে গেইছে তারা। রুকনী ছুটে এসে বললেক—কুথা যেছে উরা আমি খোবর লিয়ে আসি।

কানু বলেছিল—দেরি কর নাই হে! বোঙ্গার পূজা সার হে সব।

সাঁওতালী অনুষ্ঠান বিচিত্র। নাই কি—অর্থাৎ পুরোহিত তাদের নিজের, সে ঘট পেতে পুজো করেছিল। মোরগা এনে বলি দিলে। এবার মেয়েরা গান গাইবে। কিন্তু কোন্ গান গাইবে ? বিভিন্ন পর্বে ওদের বিভিন্ন গান—এমনি সকল সময় গাইবার গান—লাগ্‌ডে সিরিং। বিয়ের গান—বাপ্‌লা সিরিং। বীজ ছড়াবার বা ধান ভানবার গান—রহয় সিরিং। ঋতুর গানও আছে। আজ কোন্ গান গাইবে ?

সিধু কানু পরস্পরের মুখে তাকিয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করেছিল—তাই তো কোন্ গান ? পুরোহিতও ঠিক করতে পারে নি। ফুল বলেছিল—রুকনী বলে গেইছে সহরায় সিরিং অর্থাৎ কালীপুজোর সময়ের যে গান সেই গান হবেক আজ।

হাঁ হাঁ হাঁ। ঠিক ঠিক। মনে পড়েছিল ভৈরবী মাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল—হাঁ ঠিক। গলায় কাটামুণ্ড, হাতে কাটামুণ্ড, ওই রাত্রির মত কালো দেবতা-ঠাকরুনটির মতই তারা এমনি করেই দিকুদের মুণ্ড কেটে নাচবে।

—হাঁ হাঁ হাঁ। ওই গান। সঙ্গে সঙ্গে মাদল বেজেছিল বাঁশী বেজেছিল—তার সঙ্গে শিঙা বেজে উঠেছিল বিউগ্‌লের মত।

নয়ন পালের ছড়ায় আছে মা চণ্ডী তা-থৈ-থৈ নেচেছিলেন আর শিব বাজিয়েছিলেন ডমরু আর শিঙা।

আমার মন তাকিয়েছিল নিজের ভিতরের দিকে। আমি দেখছিলাম ইতিহাসের পাতা ওলটাচ্ছিল—একখানা সাদা পাতায় একটা হাত যেন লাল কালি দিয়ে লিখে যাচ্ছে। ১২৬২ সাল, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে আসছে।

নয়ন পাল বললে—

"চৈতের বাওড় সম ছুটে টাটু ঘোড়া
বালক সওয়ার তায় পিঠে মারে কৌড়া।
ছুট ছুট আরও ছুট ছুট আরও জোরে

কাছে এসে খুদে সিপাই লাফ দিয়া পড়ে।"

—রুকনী!

—হাঁ। শুভোবাবু খবর আনছি। মহেশ দারোগা কেনারাম লোকজন নিয়ে গর্বুকে বেঁধেছে—মিছা খুনের দায়ে তাকে ফাঁসি দিবেক। আর বুড়া হাড়মা মাঝিকে বেঁধেছে। জমি লিখে দেয় নাই বলে। তারা আসছেক। রাতটো তারা আজ থাকবেক বারহেটে মহিন্দর ভকতের উখানে। কাল সোকালে যাবেক এই পথে ভগলপুর।

—খুন করেছেক গর্বু মাঝি! কাখে?

—কাখুই না। মিছা কথা! গর্বু কেনা ভকতকে মানছে নাই তাথেই।

—হাড়মা মাঝি—

—সব মিছা কথা। সব মিছা কথা শুভোবাবু। আমি সব জেনে আইছি। সে কাঁদন দেখে আইছি।

স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

কানু তাকালে সিধুর দিকে, সিধু তাকালে দাদার দিকে। সমস্ত জনতা চেয়ে রইল তাদের দিকে।

কানু সিধু একসঙ্গে বললে—হুল তবে তো হুল হুল্লা! হুল!

শুধু ফুল কেঁপে উঠল। ক্ষুদে সিপাই গিয়ে তার হাত ধরলে—একটু হাসলে। বললে—তুমি হাসো রানী।

সাঁওতালেরা জমেছিল হাজারখানেকের উপর—তারা চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল—হুল হু—ল হুল। আমরা ক্ষেপলম।

নয়ন পাল বললে—

"হুল হুল তুলরাম আমরা সব ক্ষেপিলাম—
ক্ষুদে সিপাহী বলে থাম—আজ নয় হুল হবে কাল।"

—কাল?

—হুঁ কাল। লগন আসুক।

লগন অর্থাৎ লগ্ন এল পরের দিন সকালে। মা ভৈরবী আর মরংবোঙ্গা নাকি বলেছিলেন নেওতা আসবে। সে নিমন্ত্রণ সাদা খাতার। একখানা সাদা খাতা নিয়ে লোক আসবে।

আমার মন বিমুখ হল। ইতিহাসের কণ্ঠস্বর শুনলাম—হ্যাঁ, তাই হয়েছিল। ইতিহাসে অনেক কিছু ঘটেছে যার অর্থ ইতিহাসে জানে না—তবে ঘটেছে। হাণ্টারের বিবরণে তাই আছে। একখানা সাদা খাতা এসেছিল। এনেছিল চাঁদ রায় বলে এক তরুণ মাঝি। ভোরবেলা স্নান করে সাজছে শুভোবাবুরা। আজ হুল হবে। কাল রাতে বারহেটে মহিন্দর ভকতের বাড়িতে মহেশ দারোগা মদ মাংস খেয়ে আমোদ করেছে। একটা গুদামে গর্বুকে হাতে পায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে রেখেছে। হাড়মাকেও তাই করে ফেলে রেখেছে। আজ সকালে তারা বারহেট থেকে বের হয়ে উত্তরমুখে যাবে—বাগনাডিহি পার হয়ে সোজা উত্তর-

মুখে—ভাগলপুর। সাঁওতালেরা এসে জমেছে। থমথম করছে তাদের মুখ। বুকের ভিতরটা গুরগুর করছে। মহাজন তার পালোয়ান সব—তার সঙ্গে সরকারী সিপাহী—তার উপর মহেশ দারোগা।

ঠিক এই সময় এল এই মাঝি। হাতে তার একখানা সাদা কাগজের গোছার খাতা। চাঁদ রায় (সিধু কানুর দাদা নয়) পাহারা ছিল মহিন্দর ভকতের গুদামঘরে, সিপাহীদের সঙ্গে। সারারাত সে শুনেছে গর্বু মাঝির গর্জন আর হাড়মা মাঝির কান্না। ভোরবেলা সে ছুটি পেয়ে বেরিয়ে আসবার সময় ভকতের গদির বারান্দায় কুড়িয়ে পেয়েছে খাতাটা। সেটা সে হাতে করে তুলে নিয়েই চলে এসেছে। সে শুনেছে সিধু আর কানু মুর্মু শুভোবাবু হয়েছে। বোঙ্গা তাদিগে সাঁওতালদের দুঃখ ঘোচাতে বলেছেন। সারারাত সে গর্বু আর হাড়মা মাঝির দুঃখ দেখে ছুটে এসেছে শুভোবাবুর কাছে।—বাঁচাও শুভোবাবু—বাঁচাও।

সাদা খাতাখানা তার থেকে নিয়ে ক্ষুদে সিপাই বলেছিল—ইটো কি? পাতাগুলো উলটে দেখে বলেছিল—ই বাবা! সাদা খাতা গ! শুভোবাবু! সাদা খাতা আইছে!

কানু সিধু চিৎকার করে উঠেছিল—হুল! হুল লতান আইছে!

মুহূর্তে আগুন ধরেছিল, বারুদে আগুন ধরে বিস্ফোরণে যেমন বিকট শব্দ হয় তেমনি প্রচণ্ড উচ্চ শব্দ হয়েছিল।—হু—ল! ডঙ্কা দে—

ক্ষুদে সিপাই বলেছিল—না। উয়ারা সতর্ক (সতর্ক) হবেক। না।

বাগনাডিহি বারহেটের মাইল তিনেক উত্তরে। তারও খানিকটা উত্তরে দুটো ছোট নদী মিশেছে। ঘোরেল আর গুমানি। সঙ্গমস্থলে রাখশী থান। হিন্দুরা কালীপূজা করে। মা কালী আছে ওখানে। সাঁওতালরা বোঙ্গার পূজা দেয়। একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছতলা। সেই নদীর ঘাটে বাঁশের সাঁকো আটকে হাজার সাঁওতাল ওপারে সামনে এবং এপারে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইল শ কয়েক। কানু সিধু যেন সত্যই রাজা। তাদের সঙ্গে ঘুরছে ক্ষুদে সিপাই।

সূর্য উঠল। কানু সিধু কজন সাঁওতাল সর্দারকে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল ওই রাখশী-তলায়। ক্ষুদে সিপাই বললে—এই ঠিক ঠাঁই সিধুবাবু। এইখানে দাঁড়াও তোমরা।

ক্ষুদে সিপাই একটু এগিয়ে দাঁড়াল। দক্ষিণ দিকে তার দৃষ্টি। নিস্তব্ধ স্থির হয়ে আছে দেড় হাজার লোক। হঠাৎ কথা ভেসে এল—আসছেক।

মহেশ দারোগা তার পঁচিশ তিরিশ জনের দল নিয়ে এসে দাঁড়াল। পুলের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে উঠল একটা মাদলের ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে হাজার লোক উঠে দাঁড়াল।

বিবর্ণ হয়ে গেল কেনারাম ভকত। চমকে গেল মহেশ দারোগা! এ যে স্বপ্নেও তারা কল্পনা করতে পারে না। মাটির মত জীবন—লাঙলের ফালের কর্ষণে আর্তনাদ করে না, বোবা মাটির ঢেলা, তারা মাথা ঠেলে উঠে দাঁড়াল। তবু দারোগা মহেশলাল ধমকে উঠল—কারা তোরা, পথ ছাড়।

ক্ষুদে সিপাহী অশ্বত্থগাছতলা থেকে বলে উঠল—কুত্তা তু। কাকে তুখাইছিস। সেলাম

দে, ছামুতে তোর শুভোবাবু রাজাবাবু।

—রাজাবাবু? কে? কোথাকার রাজা?

সিধু বলে উঠল—এই ভাশটোর রাজা আমরা। এই ভাশটো আমাদের।

সঙ্গে সঙ্গে কানু, সঙ্গে সঙ্গে হাজার সাঁওতাল কণ্ঠ বলে উঠল—ই ভাশ আমাদের।

চমকে উঠল দারোগা। 'দেশ আমাদের'—এ কথা সে কখনও শোনে নি।

নয়ন পাল বলছিল—

"সিধু কানু হুকুম করে খোল বাঁধন খোল—
এই দেশ আমাদের আর বার বোল।"

আমি এসব জানি। ইতিহাসে লেখা আছে। বাঁধন খুলে গর্বু এবং হাড়মাকে মুক্ত করেছিল তারা। বেঁধেছিল কেনারামকে আর দারোগাকে। গর্বুই সর্বাগ্রে একজনের হাত থেকে টাঙি কেড়ে নিয়ে আঘাত করেছিল কেনারামকে। প্রথম আঘাতের পর ছুটে গিয়েছিল সাঁওতালের দল টাঙি নিয়ে। আঘাতের পর আঘাত পড়েছিল। দারোগাকেও আঘাত করেছিল একজনে। কিন্তু কে বলেছিল—না। উকে এমন করে মেরো নাই। উকে রাখশীতলায় বলিদান দাও।

আহত দারোগাকে বেঁধে এনে রাখশীতলায় বলি দিয়েছিল বলির পশুর মত। তারই রক্তের টিকা পরেছিল শুভোবাবুরা।

নয়ন পাল বললে—সে ওই ক্ষুদে সিপাই। ওই রুকনী। সেই বলেছিল বলি দিতে। সেই দিয়েছিল রক্তের তিলক। বলেছিল—এই হল রাজটিকে।

তারপর বলেছিল—ওই রক্ত লাও রাজাবাবু ঠোঁডা করে। রানীদিকে টিকা দিবে। তুমরা রাজা হলে তারা রানী হবেক।

সিধু রক্তে একটা আঙুল ডুবিয়ে বলেছিল—তু পর।

—না রাজাবাবু। আমি সিপাহী। তুমার সঙ্গে থাকব।

—রুকনী!

—না রাজাবাবু। লড়াই শেষ হোক। আমি লিব—নিজে চেয়ে লিব গ—বুলব—রাজা, আজ আমাকে রানী কর। তুমি ফুলকে পরাও।

নয়ন পাল বলছিল—

"রুকনী সামান্যা নয় ত্রিভুবন বলে।
সাধকের শক্তি সে যে সঙ্গে সঙ্গে চলে।
কায়া সাথে ছায়া হেন সদাই রঙ্গিনী।
যুদ্ধ করে নৃত্য করে সঙ্গীতে রঙ্গিনী।
হাস্য পরিহাস করে কভু করে রোষ।
তুলে দিয়ে নরনারী বীরে করে তোষ।

ভালবাসে প্রাণসম নাই অভিলাষ।
বীরে জয়ী করিবারে সদাই প্রয়াস।
পাপ নাই পুণ্য নাই করে সর্ব কর্ম।
সাধকের শক্তি যে তার বোঝা শক্ত মর্ম।"

বাবু, সত্যিই আশ্চর্য মেয়ে এই রুকনী। দুই ভাই রাজাবাবু পালকি চেপে চলত গাঁয়ের পর গাঁ লুট করে, জয় করে, কেটে মেরে, সে অত্যাচার বড় অত্যাচার বাবু। ভট্চাজ ছড়াতে বলেছেন—

"শক্তি যবে উন্মাদিনী উলঙ্গিনী হয়।
কে বা পাপী কে পুণ্যাত্মা সে বিচার নয়।
কি বা কর্ম কি অকর্ম ধর্ম কি অধর্ম।
প্রলয়ে বিচার নাই এই গুহ্য মর্ম।"

সিধু কানু বেপরোয়া হুকুম দিয়ে কেটেছিল। ছেলেও কেটেছে বাবু। তবে মেয়ে কাটা শুনি নাই। তা না কাটুক তবু সে চরম ব্যাপার! এখানকার পট দেখাতে ছড়া বলতে আমারও জিভে আটকায়। শুনেছি পথের দুধারে সাঁওতাল মেয়েরা এসে দাঁড়াত ভিড় করে। যুবতী কালো সুঠাম সাঁওতাল মেয়ে দেখলেই তাকে ডেকে তার কপালে তেল সিঁদুর ঘষে দিয়ে তাকে পালকিতে তুলে নিত। আবার নতুন কাউকে মনে ধরলে পুরনোকে নামিয়ে নতুনকে তুলত। ভট্চাজ বলেছেন—এ কাজ করত রুকনী। রাজাবাবুদের চোখের চাউনি দেখে খুদে সিপাই বুঝতে পারত মনের কথা। আবার মেয়েরা যারা রাজাবাবুকে দেখে মনে মনে বরণ করত কামনা করত তাদের মুখ দেখেও বুঝতে পারত। সে তাদের হাতে ধরে বলত—"লাও রাজাবাবু, একে লাও তুমি! দাও কপালে সিঁদুর।"

এ কথা ইতিহাসেও আছে। বেনাগড়ের এক মাঝির স্টেটমেণ্ট আছে—তাতে সে বলেছে—"If they fell in love with any girl at the sight of any girl then they would place their napkins of them (Sidhu and Kanu) on the head of the girl. The girl was then brought to them in the palanquin; if again in the course of the march they fell in love with another girl she was also brought to them." কিন্তু ত্রিভুবন বলেছেন—রুকনী এনে হাত ধরে তুলে দিত তাদের। টুশকি কাঁদত। রুকনী হাসত।

নয়ন পাল বললে—ত্রিভুবন ভট্চাজকে দুর্গাপূজার সময় রুকনী বলেছিল আশ্চর্য কথা। ভট্চাজ তাকে বলেছিলেন—ওরে, তুই এবার সিঁদুর পর। সিঁদুর হাতে সে হেসে বলেছিল—।

অর্ধপথে থেমে নয়ন বলেছিল—সে দুর্গাপুজোর কথায় সময় বলব বাবু। এখন যেখান থেকে ছেড়েছি সেখান থেকে বলি।

হুল আরম্ভ হয়ে গেল পাঁচকোঠিয়ার অশথগাছের তলায় রাখশী মায়ের থানের সামনে। তারপর রব উঠল—হুল হুল হুল।

ধিতাং তাং ধিতাং ধিতাং মাদল বাজিয়ে বারহেটের বাজার লুঠ করতে চলল। ঘোড়ায় চড়ে সিধু আর কানু শুভোবাবু আর টাট্টুতে চড়ে ক্ষুদে সিপাই। সিধুর মনে আগুন জ্বলছে। কাটবে মহেন্দর ভকতকে। লুঠের হুকুম দেবে গোটা বাজারে; কাটবে মহাজনদের। মুক্ত করে দেবে দশ টাকায় আজীবন কেনা সাঁওতালদের। ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা দেবে—রাজা হল শুভোবাবু হল সিধু মুর্মু আর কানু মুর্মু—কোন সাঁওতাল খাজনা দেবে না কোন জমিদারকে। কোন হুকুম মানবে না 'কম্পনি'র (কোম্পানির)। লুঠ কর বাজার। কাট দিকুদের। জ্বালিয়ে দাও বাড়িঘর। বরবাদ করে দাও সরকারী থানা—লুঠ কর নীলকুঠি রেশমকুঠি। কিন্তু বারহেটে এসে সিধুবাবুর মন খারাপ হল। মহেন্দর ভকত ঘরে গলায় দড়ি দিয়েছে ভয়ে। আর মহাজনেরা পালিয়েছে। লুঠ হল বাজার। অনেক মহাজন এসে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বললে—মাফ কর রাজাবাবু—আমরা তোমার প্রজা। যা বলবে তাই মানব। ছেড়ে দিলাম সব সাঁওতালদের। তারা খালাস, তারা খালাস, তারা খালাস। শুধু তাই নয়, তারা এনে সামনে রাখলে টাকার থলি। রাখলে রঙিন কাপড়ের থান। নানান জিনিস। গয়নাগাঁটি। রূপাদস্তার নয় বাবু, সোনা-রূপার।

বাবু, সিধু সোনার হার নিয়ে দিয়েছিল রুকনীর হাতে—পর।

রুকনী নিয়ে চাদরে বেঁধে বলেছিল—আমার ফুলরানীর দাও আগে রাজাবাবু, আমি তাকে দিব! ই হারটোও দিব। সিপাহী কি হার পরে গ। আমি কি মেয়া বটি।

আর বলেছিল—রাজা, তুমরা পোশাক কর। এই কাপড় দিয়া ওইসব দিকুদের যারা কুর্তা করে তাদের দিয়া পোশাক তোয়ের করাও, লইলে মানাবে কেনে গ।

ওস্তাগর ডেকে তখনই লাল গেরুয়ার পোশাক তৈরী করতে দিয়েছিল। পোশাক কেমন হবে তাও সে বলেছিল। বলেছিল পাদরীরা যেমন সাদা পরে, তুমরা তেমনি লা—ল পর। তুমরা রাজা।

তারপর বাবু বারহেট থেকে লীলাতেড়, সেখান থেকে ডাকেতা—তারপর লাহেড়িয়া—হাগামা—

"লীলাতেড়ে ভিলিগণ ধনী মহাজন
সুদের কারবারী করে ধান টাকা দাদন।"

আমি বললাম—পাল মশায়, ওসব কথা আমি পড়েছি। লীলাতেড়ের ভিলি মহাজনকে ধরে নিয়ে এসেছিল শুভোবাবুদের লোক। কিন্তু সে হাত জোড় করে বলেছিল—হুজুর, খাতক যা বুলবে তাই হবে। পুছ করুন আপনি খাতককে। তার মুখ দেখে আর বাড়ির মেয়েছেলেদের কান্না শুনে খাতক সাঁওতালেরা বলেছিল—আমাদের উপর এ মহাজন কিছু করে নাই শুভোবাবু। আমরা যা দিলম তাই নিলে।

তাদের খালাস দিয়েছিল সিধু কানু।

ওসব ইতিহাসে আছে: দেশজোড়া সাঁওতাল অভ্যুদয়। শুধু বিদ্রোহ বিপ্লব নয়। গোড্ডার কাছে পাঁজারারার বাজারে সিপাহীদের সঙ্গে লড়াই করে সিধু কানু বিজয়ী হয়েছিল—রাজা যারা গিয়েছিল।

ইতিহাস মনের মধ্যে বলে যাচ্ছে—এরপর উত্তরে ভাগলপুর রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূমে ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত—পূর্বে মুরশিদাবাদ জঙ্গিপুর কাঁদী থেকে রামপুরহাট নারাণপুর হয়ে গনপুর তিলকুড়ি বিষ্ণুপুর আন্দারপুর কাপিষ্ঠা বাজনগর আমজোড়া ঘাট থেকে পশ্চিমে দেওঘরের ধার পর্যন্ত ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সাঁওতাল সুদীর্ঘ দিনের শোষণের অত্যাচারে ঘৃণার জন্ম পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ক্ষোভে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগারের মত আকাশে উঠে ছড়িয়ে পড়েছিল গলিত লাভার মত।

মানব প্রকৃতির আদিম রুদ্র প্রকাশ। এখানে ন্যায় অন্যায়ের বিচার অচল। সমাজ এখানে শবের মত প্রাণহীন—নিদারুণ আক্রোশে তার বুকের উপর অত্যাচারিতের আশ্চর্য অভ্যুদয় তাণ্ডব নৃত্য করে। না! সমাজ এখানে শব নয়—অত্যাচারিতের অভ্যুদিত শক্তি—সেও লজ্জাহতা কালী কল্যাণী নয়।

আদিম ক্ষুব্ধ প্রকৃতি রুদ্ধ আক্রোশে কোন বিধান মানে না। মহাজনদের তারা কেটেছে। কেনারামের মত খণ্ড খণ্ড করে কেটেছে অনেক মহাজনকে। মহাজনদের একটি একটি করে আঙুল কেটে বলত—এই আঙুলে তোরা টাকা বাজাস। লে—টাকা বাজা। চন্দ্রপুরের রামধন মণ্ডল সদগোপ মহাজন ধানের কারবারী। সাঁওতালরা রামধন মণ্ডল আর তার ছেলেকে ধর্মরাজের হাড়িকাঠে বেঁধে বলি দিয়েছিল। রথের দিন কুমড়াবাদে জোতদারদের মুণ্ডু কেটে রথের চারি ধারে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

কুমড়াবাদের জমিদার প্রাণের ভয়ে জলে নেমে পানা এবং ঘাসের মধ্যে মাথা লুকিয়ে গলা ডুবিয়ে বসেছিল—তাকে চারিদিক থেকে তীর মেরে বিঁধে মেরেছিল তারা। নারাণপুরের জমিদারকে নৃশংস আক্রোশে কেটেছিল। প্রথমে হাঁটু পর্যন্ত পা দুটো কেটে বলেছিল—এ লে, চার আনা। তারপর কোমরে কেটে বলেছিল—লে, এবার আট আনা লে। তারপর হাত দুটো কেটে শোধ করেছিল বারো আনা। সবশেষে মুণ্ডু কেটে চিৎকার করে বলেছিল—ফারখৎ! জামতাড়ার রাজা পালিয়েছিল। পাঁড়বার রাজা লুকিয়েছিল।

স্বার্থপর সুদখোর বামুনদের বলত—সুরুযঠাকুরের বলির পাঁঠা। সুরুঠাকুরকে দেখিয়ে তাদের কেটেছে।

মানুষের মধ্যে প্রকৃতির আদিমতম রূপের রুদ্র প্রকাশ। ইতিহাস সম্ভ্রমে তাকে ধরে রেখেছে। বিচার করে নি। বলেছে—এ একটা বিচারের রায়।

নীলকুঠি লুঠ করেছে প্রতিহিংসায়। লারকিন্স সাহেব ও তার ছেলে মরেছে। মেরেছে তারা। লারকিন্সের স্ত্রী এবং শ্যালিকাকে কেটেছে।

লড়াইও করেছে। শুধু লুঠ শুধু হত্যা করে নি। শুধু হাঙ্গামা করে নি। ইংরেজের সিপাইদের সঙ্গে লড়াইও করেছে। করেছে এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। বন্দুকের সঙ্গে সঙিন তলোয়ারের সঙ্গে তীর আর টাঙির লড়াই। অধিকাংশ জায়গাতেই হেরেছে কিন্তু হার মানে নি সহজে। একজন ইংরেজ আর্মি অফিসার লিখে গেছেন—"It was not war, it was execution. They did not understand yielding. As long as their national drums beat, the whole party allowed themselves to be shot

down. Their arrow often killed our men and so we had to fire on them. When their drums ceased, they would move off for about quarter a mile ; then their drums began again and they calmly stood till we came back and poured a few volleys into them."

এ হিংসা এ বীর্য এ বীরত্ব সবই সেই এক প্রকৃতির চিরন্তন প্রকাশ।

নয়ন পাল আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেছিল। সে ডাকছিল আমাকে—বাবু! বাবু! কবার ডেকেছিল তা আমার মনে নেই। শেষ যখন হাঁটুতে হাত দিয়ে ডাকলে তখন আমার সচেতনতা ফিরে এল।

পাল বললে—আর শুনবেন বাবু?

—শুনব। একটু ভাবছিলাম পাল মশায়। কিছু মনে করবেন না। তবে ও সব আর নয়। বেলা গেছে। আমার খাতার পাতা ফুরিয়েছে। একটা জিনিস শুনব।

পাল বললে—দুর্গোৎসবের কথা বলি। ঠাকুর মশায়কে আর আমার পিতামহ ঠাকুর-বাবাকে নিয়ে গিয়েছিল তারা একদিন রাতে এসে পালকি চাপিয়ে। দুর্গোৎসব করতে বলেছিল ওই রুকনী। ঠাকুর মশায়কে জানত। ভৈরবী মার কাছে শুনেছিল। সেই বলেছিল ওই পালকে এনে ঠাকুর গড়িয়ে পুজো করাও রাজাবাবু। পিয়ালপুরের লড়াইয়ে জিতে খুব ধুম করে পুজো করেছিল—বাজভাণ্ড—

বাধা দিয়ে আমি বলেছিলাম—না। থাক পাল মশায়। ও থাক। ও কথাও জানি। মনে মনে গড়েও নিতে পারি। কিন্তু—

—তবে কি বলব বলুন?

—বলুন আমাকে ক্ষুদে সিপাই, ভট্‌চাজ মশায় যাকে বলেছেন সিধুর শক্তি বা নায়িকা তার কথা, রুকনীর কথা বলুন।

রুকনী—

নয়ন পাল বললে—সে তো মায়ের যোগিনী ছিল বাবা—

শুনে আমি হাসলাম। পাল বললে—হাসছেন বাবা? নিজে ভট্‌চাজ মশায় বলে গিয়েছেন।

কুণ্ঠিতভাবেই বললাম—পাল মশায়, সেকালে ভট্‌চাজের কথা সত্যি ছিল। মানে এইসব কথা। একালে আমরা ঠিক মানতে তো পারি নে।

পাল হেসে বললে—তা ঠিক। ই কাল অন্যরকম হয়েছে। তাহলে তাই বলি। তখন যুদ্ধ তো চারিদিকে। সায়েবরা পল্টন নিয়ে যায়—এরা লড়াই দেয়, তারপর মরে যায়। মরে এরাই বেশী—কিন্তু হারে না। তবে জিতও হয়েছে। পিয়ালপুর বলে গেরাম আছে, পাহাড়ে জায়গা সাহেবগঞ্জের উদিকে—সেখানে খুব বড় জিত জিতেছিল সাঁওতালরা।

সেই ঠিক বর্ষা নামব নামব করছে—নামছে—সেই সময় কানু সিধুর দল—সে দল কম নয়—কেউ বলে বিশ হাজার, কেউ বলে ত্রিশ হাজার নিয়ে পিয়ালপুরে পাহাড়ের উপর আড্ডা

গাড়লে। এদিকে তাদের সাহেবগঞ্জ থেকে বীরভূমে ময়ূরাক্ষীর ধার পর্যন্ত একরকম দখল হয়ে গিয়েছে। সাঁওতাল ছাড়া মানুষজন ভদ্রলোক বামুন কায়েত বদ্যি সদগোপ এরা দেশছাড়া হয়েছে। ছোট জাত যাদের বলি আমরা—বাউড়ী বাগ্দী ডোম ধোপা এদের ওরা কিছু বলে নি। আর বলে নি কামারদের। তাদের তীরের ফলা যোগাতে হত। আষাঢ়ে হাঙ্গামা শুরু—শাওনের শেষ হতে হতে এ মুলুক জয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক রাজ্যে শৃঙ্খলা হয় নি। এক এক দিকে এক এক জন পরগনাতে শুভোবাবু হয়ে বসল। অবিশ্যি সিধু কানুকে বড় বলে মানত। এই সময়ে পিয়ালপুরে লড়াই হল।

পিয়ালপুরের পাহাড়ে যেখানে লড়াই হল সেখানে পাহাড়টা মজার, গেলে দেখতে পাবেন দুদিকে পাহাড় আর মাঝখানে খাল। বালি আর পাথর। বর্ষার সময় নদী—তাও বর্ষা নামলে—বর্ষা যতক্ষণ বর্ষায় ততক্ষণ। তারপরে এই আধদিন, তাও বড়জোর। আধদিন গেলেই জল নেমে চলে যায়—তখন শুকনো। ঘোর বর্ষার সময় ছিলছিল করে জল বেয়ে চলে—তাতে পায়ের গোড়ালি ডোবে না। দু চারটে জায়গায় পাথরের বাঁধে আটকে এক-হাঁটু এককোমর জল চলে। আবার পাহাড়ে উঠবার ওই পথ।

সাঁওতালরা দুই দিকের পাহাড়ের মাথা আগলে বসে। সাহেবরা সেপাই নিয়ে পাহাড়ের অন্য দিক থেকে উঠতে পারলে না। এই পথের মুখে এসে দাঁড়াল। তখন পশ্চিম আকাশে মেঘ জমেছে—চমকাচ্ছে। আর দূরে ডাক দিচ্ছে।

আমি বললাম—জানি পাল মশায়। ইংরেজরা এদেশের বর্ষার ধরন নদীর ঢল নামা বুঝত না। সাঁওতালরা বুঝতে পেরেছিল পশ্চিমে বনের ওপারে বর্ষা নেমেছে। ঢল নামবে। সে ঢল হাতী ভাসানো ঢল। বুঝতে পেরে ঢুকতে দিয়েছিল। সেই ঢলে ইংরেজ ফৌজ একরকম ভেসে গিয়েছিল। ওদের একজন মেজরও মরেছিল। আপনি রুকনীর কথা বলুন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ভট্চাজ মশায় ছড়াতে লিখেছেন রুকনী তখন মধ্যে মধ্যে ক্ষুদে সেপাইদের পোশাক ছেড়ে মেয়ে সেজে নীচে নেমে ঘুরে বেড়াত। বেনাগড়েতে থেকে আর রাস্তাবন্দির সময় সাহেবদের বাংলোতে কাজ করতে করতে ভাল হিন্দী শিখেছিল। বাংলাও শিখেছিল। কালো রংয়ের মোহিনী মেয়ে—ও দেশী কাহার কুমীর মেয়ে সেজে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে যেত, খবর নিয়ে আসত। সাজ করত দেয়াশিনীর। একটা কাঠের পিঁড়িতে কাঠি দিয়ে ছত্রি তৈরী করে তার মধ্যে সিঁদুরমাখানো পাথর বসিয়ে ঘুরে বেড়াত গাঁয়ে গাঁয়ে—পূজা দে। পূজা দে। মা আয়িছে। পূজা দে।

লোকে জিজ্ঞাসা করত, কোন দেবী ছে? রুকনী বলত—কালকা দেবী—কালকা মায়ী ছে। সেই বনের মধ্যে ভৈরবীর কাছে এক মাস ছিল—তার মধ্যে ভৈরবীর কাজকর্ম সে দেখেছিল। অবিকল তাই করত। কপালে সিঁদুরের টিপ পরত, পরনের কাপড় গেরুয়ায় ছুপিয়ে নিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে ভর দেখাতো।

পিয়ালপুরের কাছে সংগ্রামপুর। ওখানে ছিল নীলকুঠি, কুঠির সাহেবের ওখানে থাকত ইংরেজ পল্টনের দল। তারা সব দেশী পাহাড়ী সেপাই। আর সাহেবের কুঠিতে থাকত সাহেব কাপ্তেনরা।

পিয়ালপুরের সিপাহীদের কাছ থেকে সেই খবরটা এনেছিল। সঠিক খবর, ওরা সাঁওতালদের আক্রমণ করতে যাবে কাল নয় পরশু। সাহেব তৈরী হতে হুকুম দিয়েছেন। সিপাহীরা কজন এই তরুণী ভৈরবীকে হাত দেখিয়েছিল। বলেছিল, দেখ তো মরেগা কী জীয়েগা?

ভৈরবী খড়ি পেতে ভয় করে বলেছিল—হিঁয়া তো মরণ নেহি। কোই আগা যাবি? যাবি তো তরফ বোল। কোন তরফ—উত্তর? পচ্ছিম? দখমিন? পুব? কোন্ তরফ? বোল। নেহি তো ক্যাইসে বলবে?

সিপাহীরা বলেছিল—উত্তর।

—হঁ। পাহাড় পর? উঁচা আগা?

—হঁ। হঁ।

—তবে তো!—বার কয়েক ঘাড় নেড়ে বলেছিল—তিন আদমী তু লোক। দু আদমীকে মরণ ছে। এক আদমী বাঁচেগা। ওঃ, দমাদম সনাসন আওয়াজ মিলছে হো। কাঁহা যায়েগা রে?

সিপাহীরা সবই প্রায় বলেছিল।

সেই খবর এনেছিল রুকনী। সাঁওতালদের দু পাহাড়ে গাছের আড়ালে আড়ালে সাজিয়েছিল সিধু কানু—আর সেই চাঁদ রায় তার সঙ্গে গর্বু। আর যুদ্ধের দিন সে ভৈরবী মার মত একটা গাছতলায় ঠিক তার মত আগুন জ্বেলে বিনা মন্ত্রে বিনা তন্ত্রে শুধু ঘি পুড়িয়েছিল আর মনে মনে বলেছিল—"জিতায়ে দে মা। জিতায়ে দে!" ওদিকে পুরুত করেছিল বোঙ্গার পুজো, মোরগ বলি দিয়েছিল; বিড়বিড় করে ওদের মন্তর পড়েছিল। তার পুজো শেষ হয়েছিল কিন্তু রুকনীর পুজো শেষ হয় নি। সে কোন ইশারা পায় নি।

হঠাৎ ইশারা মিলল। আকাশে তখন মেঘ বনের মাথায় এগিয়ে এসেছে। একটা বিদ্যুৎ চমকে মেঘ গুরগুর গুরগুর শব্দ করে ডাক দিলে একটা সনসন শব্দ এল তার কানে। সে বললে—মিলল, ইশেরা মিলল।

বলে সে ছুরি দিয়ে বুক চিরে পাতার দুটো ঠোঙায় রক্ত ধরে ভৈরবী মার মতই একটা হোমের আগুনের সামনে রেখে আর একটা বোঙ্গার স্থানে নামিয়ে দিয়ে বোঙ্গাকে বললে—দোয়া কর। হে বাবা বোঙ্গা!

সঙ্গে আর একটা মেঘের ডাক। সনসন শব্দ বাড়ল। মাথার উপরে বনের মাথায় দোলা লাগল। কানু রুকনীর এসবে খুশী হত না, সে তখন দাঁড়িয়েছে যুদ্ধের সাজ সেজে—তার পাশে চাঁদ রায় গর্বু। মাদলে ঘা দিতে বললে। সিপাইরা ওই নালার মুখে ঢুকেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হোক। সিধু অস্বস্তি বোধ করছিল তার ক্ষুদে সিপাহীর জন্যে—সে পাশে না থাকলে তার নেশা লাগে না লড়াইয়ে। সে ছুটে এল রুকনীর কাছে। হল তুর? আমার ক্ষুদে সিপাহী। উঠ, জলদি।

রুকনী উঠে দাঁড়িয়ে বাকী ঘিটা আগুনে ঢেলে দিলে—আগুনের শিখা হু হু করে জ্বলে উঠল বুকভর উঁচু হয়ে। রুকনী চিৎকার করে উঠল—শুভোবাবুর জিৎ—শুভোবাবুর জিৎ।

লাও শুভোবাবু, আগুনের পরশ লাও।

সিধু তার হাত ধরে বলেছিল—চল চল—লড়াই লাগছে।

রুকনী বলেছিল—হুঁ। আকাশ দেখো। দেখো মেঘ। সনসন শব্দ শুনো। থোড়া সবুর কর শুভোবাবু। উরা জোড়ের ভিতর ভিতর আঁগারে আসুক—

তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ অহর মেঘগর্জন হচ্ছে পিছনে পাহাড়ের মাথায়। রুকনী বলেছিল —ই মায়ের ইশেরা।

নয়ন পাল ছড়ায় বললে—

"মেঘের ললপে, হলপে হলপে, ছলনায় ডাকে চণ্ডী।
যেন ইশারায়, সাহেবে ভুলায়, আনয়ে বিপদ গণ্ডী।
গুরুগুরু ডাক, হুঁশিয়ার হাঁকে, সাঁওতাল তনয়ে তাঁর।
বুঝিয়া মোহিনী মানবী রুকনী বুঝায়ে অর্থ তার।"

ভট্টচাজ মশায় এখানে ত্রিপদী ছন্দের দ্রুত লয়ে বলেছেন রুকনীর কথাতেই তারা বুঝতে পেরেছিল সবুর করলে ফল হবে। ওদিকে তখন কানুও হুঁশিয়ার হয়েছে। সেও ভাবছে। যুদ্ধে তারা নিরস্ত্র থেকেছিল তখন। তখন সরকারী ফৌজ অনেকটা ভিতরে ঢুকছে। ঝড় বৃষ্টি এল—ওদিকে ঢল নামল হুড়মুড় করে। তখন তারা শুরু করলে শরবৃষ্টি। কোম্পানির সিপাই অনেক মরেছিল—তার সঙ্গে একজন মেজর।

সেদিন রাত্রে নাচগান হাঁড়িয়া হরিণের মাংসের মহোৎসব হয়েছিল। আর সারা রাত্রি সিধু রুকনীকে বুকে নিয়ে পড়ে ছিল কিন্তু সিঁদুর পরে নি। বলেছিল—সে হবে শুভোবাবু, হবে। এখন আমি তুমার চাকরানী ক্ষুদে সিপাহী থাকব। আমার ভাল লাগছে।

ত্রিভুবন ভট্‌চাজ বলেছেন—

"সাধকের শক্তি যারা তারা নয় বধূ।
তারা হয় জীবনের মনোরমা শুধু।

অন্যায় বলেন নি। এ চরিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আছে। তারা সত্যই নায়িকা। এরা যেমন নিন্দিতা তেমনি বন্দিতা।

এই পিয়ালপুরের যুদ্ধের পর বর্ষা নামল ঘনঘটায়। কোম্পানির মিলিটারী সাহেবরা বিপদ বুঝে ভাদ্র আশ্বিন দু মাস যুদ্ধ স্থগিত রাখলে। সাঁওতালদের দেশে সাঁওতাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দু মাসের জন্যে।

রুকনীই বলেছিল—শুভোবাবু হুজুররা একটি কথা বুলক। বুলবি—আমাদের দেশের পরব (বিজয়া দশমী) আছে। দুর্গাপূজা করে দিকুরা। আমাদের উ পূজা নাই। আমি শুনছি—ভৈরবী মা বুলেছিল দুগ্‌গা পূজা করে রামরাজা রাবণকে মেরেছিল। তুমরা উ পূজা কর। চার দিন পূজা হবে পরব হবে। নাম বাড়বেক। আর জিত হবেক। উরা মরবেক। বর্ষা গেলে উরা আবার লড়াই দিবে। পূজা করলে ঠিক জিতবে রাজাবাবুরা।

রাজাবাবুদের খুব মনে লেগেছিল কথাটা। "হাঁ হাঁ কথাটো ঠিক।" সব ছোট

শুভোবাবুকে নিমন্ত্রণ হবে। তারা আসবে। পূজার সময় বড় শুভোবাবুদের ঐশ্বর্য দেখবে। তখন তাদের ঐশ্বর্য অনেক। লুঠ করা ধান প্রচুর—টাকা অনেক, বাজার লুঠ করা কাপড়-চোপড় অনেক। গয়না অনেক। পুঁতির মালা, রূপাদস্তার গহনা, রূপার গহনা। রানী আর রাজাদের সোনার বালা, সোনার মাকড়ি, সোনার মিনি নাকে। রঙচঙে কাপড়। অনেক ধনুক, রাশি রাশি আঁটিবন্দী ঝকঝকে ফলা কাঁড়। বড় বড় টাঙি। তার সঙ্গে তলোয়ার। বাজার থেকে লুঠ করেছে। কোম্পানি সিপাইদের মেরে কেড়ে নিয়েছে। বন্দুক নেয় নি। ওরা তার ব্যবহার জানে না। কার্টিজ বারুদ নেয় নি—নিয়ে কি করবে। অন্য ছোট শুভোবাবুরা দেখবে এই সব ঐশ্বর্য। দেখবে তাদের সিপাই কত এবং কেমন তাদের বিক্রম। তারা সকলে পরামর্শ করে বলেছিল—হাঁ ঠিক। ঠিক কথা। তাছাড়া ১৮৫৫ সালে দেবতার দয়া প্রসাদ এর প্রতি ছিল গভীর বিশ্বাস। কিন্তু বাঁবড়ে ঠাকুর কোথায় পাবে। বামুনেরা সব ভয়ে দেশ ছেড়েছে। আর বাঙালী বাঁবড়ে ঠাকুর চাই।

সিধু কানুর মনে পড়েছিল ত্রিভুবন ঠাকুরের কথা। হাঁ, ওই বাবাঠাকুরকে আন। বড়া দেবতার মত লোক। উয়াকে আন।

একদিন রাত্রে পালকি করে তাঁকে নিয়ে এসেছিল বাগনাডিহি। তার সঙ্গে নয়ন পালের পিতামহ। সে গড়বে ঠাকুর, ভট্টাজ করবেন পূজা।

নয়ন পাল বললে—

"গুরু শিষ্য দুইজন যেথা মেলে সঙ্গে।
শিষ্য গড়ে দেবীমূর্তি গুরু পূজে রঙ্গে॥
সেথায় সাক্ষাৎ হতে হইবে দেবীকে।
এই বর দিয়াছিলা একদা অম্বিকে॥
ত্রিভুবন ভট্টাচার্য আসি বাগনাডিহি।
বলেছিল—এক কথা তোমাদের কহি॥
দেবীপুজো সুনিশ্চিত হয়ে সুপূজন।
অতঃপর অত্যাচার কর নিবারণ॥
একথা শুনিয়া দুই ভাই করে শলা।
ঠিক ঠিক এইবার স্থাপহ শৃঙ্খলা॥
ঠাকুর বলিল—শুন এই পূজা ফলে।
তোমাদের গত পাপ বিসর্জিব জলে॥
তাহা ছাড়া মন্বন্তরে এইরূপ হয়।
যা হয়েছে তা হয়েছে ধরিবার নয়॥
সে গেল কালীর নৃত্য এইবার মাতা।
দশভুজা হইবেন—শুন তার কথা॥
পুণ্যবানে রক্ষিবেন অত্যাচারী নাশি।
পুণ্যবান হবি তোরা মাতারে প্রকাশি॥"

নয়ন পাল থেমে গেল। একটু ভাবলে, তারপর বললে—পুজো খুব ভাল হয়েছিল বাবু। ভট্‌চাজ মশায় মায়ের চোখে পলক পড়তে দেখেছেন, হাসতে দেখেছেন। তার সঙ্গে দেখেছিল রুকনী। সে দেখতে দেখতে চীৎকার করে বলে উঠেছিল—"মা হাসছেক, মা, হাসছে গ। চোখের পাতা পড়ছে গ।" ভট্‌চাজ মশায় সেইদিন তাকে চিনেছিলেন 'নায়িকা' বলে—সাক্ষাৎ নায়িকা। সিধু সেদিন তার কপালে সিঁদুর দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেদিনও রুকনী বলেছিল—"না। আমার কপালে সিঁদুর দিও না। মা বলছে দিও না। আমি তো তুমারই রইছি গ। ইয়ার পরে দিবি। লিব লিব—আমি তুমাকে দিতে বলব।"

প্রশ্ন করলাম—তার পর?

নয়ন পাল বললে—বলছি বাবু মশায়। কিন্তু যা বলছিলাম—বলতে বলতে রুকনীর কথায় চলে এলাম।

অপেক্ষা করে রইলাম—কি বলতে চায় পাল। পাল বললে—বাবু, ভট্‌চাজ মশায় তন্ত্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, ওই যে চক্র সিধু কানুকে দিয়েছিলেন ভৈরবী সে চক্র তিনি সাধন করে সিদ্ধ করেছিলেন। ওর ছিদ্রতে দুধ দিলে উথলে উঠত, উহলে উঠত। তাঁর নাকি মায়ের সঙ্গে কথা হত। তিনি নিজে দুর্গাপুজা করলেন। নিজে খুশী হয়ে বলেছিলেন—তোদের জয় অবধারিত রে বাবা। কিন্তু বিজয়া দশমী সেরে ওরা হৈ হৈ করে ফিরে গেল পিয়ালপুরের পাহাড়ে। এর মধ্যে হুকুম দিয়ে গেল—যা করেছ করেছ। অত্যাচার মারকাট যা হয়েছে তা হয়েছে, আর যেন না হয়। খবরদার! কিন্তু বাবু গিয়েই কদিন পর যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধে সব শেষ। শেষ যুদ্ধ! ভট্‌চাজ আপসোস করে লিখেছেন—

"এ কি হইল নাহি জানি—
কি করিল মা জননী দশভুজা
জয়দায়িনী—পূজাফল হইল বিফল॥
ভাবি আমি মনে তাই কালে কালে
মিছা হায় মন্ত্রতন্ত্র কিছু নাই—
দেবতা হতবল।
মানুষের বুদ্ধি
পাশে যাগযজ্ঞ পুণ্য নাশে
ত্রিভুবন ভট্ট ভাবে কি হবে আমার।
থাকিতে না চাই ভবে আর না থাকিতে চাই—
পার যা মা কর তাই—
এই ভব ভাবনায় হতে কর পার।"

চুপ করলে নয়ন পাল। সেও দুশ্চিন্তায় হতাশায় যেন ভেঙে পড়ছিল এই মুহূর্তে।

আমি বললাম—সত্যিই কলিযুগ পাল মশায়। এ যুগে যাগযজ্ঞে কিছু হয় না। আর আগের কালে হয়তো আমরা মনে করতাম সত্য, কিন্তু সত্য ছিল না।

—ছিল না? তাই কি হয় বাবু?

কি করে পালকে আমি বোঝাব। সংগ্রামপুরের যুদ্ধের পরাজয়—ইংরেজ ফৌজের জয় শুধু বুদ্ধির চাতুর্যে আর বন্দুকের শক্তিতে। সাঁওতালরা হারলে অন্ধবিশ্বাসে আর কৌশলের অভাবে। ওদের বিশ্বাস ছিল দেবতার বর ওরা পেয়েছে, ওরা জিতবে। কানু সিধু বিজয়ার দিন বলেছিল—গুলি ইবার আর আমাদের গায়ে বিঁধবে না। দেবতার হুকুমে গুলি জল হয়ে যাবেক।

সেটা বলেছিল ওদের পুরোহিত নাইকে আর সিধু কানু। এবার আর ইংরেজ কর্নেল ভুল করে নি। তারা বুঝেছিল যে, ওই পাহাড়ের উপর বনের মধ্যে এই অরণ্যের অধিবাসীরা সত্যই অপরাজেয়। এবং তারা সেখানে বন্দুক সত্ত্বেও শক্তিহীন।

তাই কৌশল করে ওদের নামিয়ে এনেছিল সমতলে পিয়ালপুরের দক্ষিণে সংগ্রামপুরে। সংগ্রামপুরের মাঠে যুদ্ধ হল। প্রথম কোম্পানীর কিছু সিপাহী গিয়ে বন্দুকের শব্দ করে আক্রমণ করলে। কিন্তু সে শব্দই। ফাঁকা আওয়াজ। তাতে গুলি ছিল না।

কানু সিধু উৎসাহিত হয়ে বললে—গুলি জল হল—গুলি জল হল। ইবার চল—চল ইবার—পাহাড় থেকে নেমে ঝাঁপায়ে পড়ে কেটে ফেল, কেটে ফেল। দুশমনকে কাটলে পাপ নাই। চল চল চল। বাজা মাদল—।

ধিতাং ধিতাং শব্দে মাদল বেজে উঠল। শিঙা বাজল। বিশ হাজার সাঁওতাল পাহাড়ের বন থেকে বেরিয়ে দাঁড়াল—তখন কোম্পানীর সিপাহীরা হটে যেন পালিয়ে যাচ্ছে পিছনে। সমতল মাঠ সেখানে।

চাঁদ রায়কে কানু হুকুম দিলে—চাঁদ, ছুট তু তুর দল নিয়ে, ঝাঁপায়ে পড়।

চাঁদ রায় কানু সিধুর সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক সেনাপতি। চাঁদ পাহাড় থেকে নদীর ঢলের মত নেমেছিল। তারপর? তারপর যা হবার তাই হয়েছিল। কোম্পানীর সিপাহীদের কাপ্তেনের হুকুম বেজে উঠেছিল তীব্রকণ্ঠে—হ—ল্ট!

তারপর—রাইট টার্ন!

ঘুরল কোম্পানীর ফৌজ। বন্দুক ধরে অপেক্ষা করে রইল। চাঁদ ছুটছিল দুরন্ত বেগে—কোম্পানীর ওই কটা ফৌজকে গ্রাস করে ফেলবে।

তারপর—ফায়ার!

গর্জন করে উঠেছিল বন্দুকগুলো এক সঙ্গে। হাজার বন্দুক। পড়ল হাজার মানুষ। তবু চাঁদ দমল না। থামল না। কি হল দেখলে না। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়লে। আবার ফায়ার। এবার চাঁদ পড়ল।

উপরে দাঁড়িয়ে কানু দেখছিল। এ কি হল? তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে সবুজ মাঠ—সাঁওতালেরা পড়ে কাতরাচ্ছে। অনেকে স্থির হয়ে গেছে। মরে গেল? কানু বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল আর ভাবছিল—এ কি হল?

আমার মনে পড়ছে গুলি খেয়ে সাঁওতালদের দলে দলে মরতে দেখে তাদের অপার বিস্ময়ের কথা বলবার সময় কিছুদিন আগে একজন বলেছিলেন—"বোজারা মরছে, গুলি দেখা যাচ্ছে না, পড়ে হাত-পা খিঁচে মরে যাচ্ছে, দেখে হাঁ হয়ে গেল কানু।" কথাটা বলে

হেসেছিলেন। আমার মনে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গে হিরোশিমার কথা। ঠিক সেদিন আধুনিক বিজ্ঞানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রসর জাপানী জাত এমনি ভাবে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞান। পূজক তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পুরোহিত তার কূটবুদ্ধি। সেখানে আজও ন্যায় নেই, পুণ্য নেই, পাপ নেই, অন্যায় নেই।

একটা স্বীকারোক্তি মনে পড়ছে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে এক ইংরেজ কর্নেল এই ভাবে তীর-ধনুকধারী সাঁওতালদের প্রতারণা করে সমতলে নামিয়ে বন্দুকের গুলিতে হাজারে হাজারে মারবার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"There was not a single sepoy in the war who did not feel ashamed of himself."

কিন্তু এতেও তারা ফেরে নি।

কানু তলোয়ার বের করে মাথার উপরে ঘুরিয়ে চিৎকার করে ডেকেছিল—ভাই হো! তার পাশে তখন ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে টুশকি—সে হাঁপাচ্ছিল। এদিকের পাহাড়ের মাথায় সিধুও স্থির দৃষ্টিতে সব দেখছিল—সেও নীরব কিন্তু স্থির! তার পাশে তার ক্ষুদে সিপাহী। সিধু চিৎকার করে সাড়া দিয়েছিল—দাদা হো!

—চল হো। মার হো কাট হো।

—হাঁ, চল হো।

মাদল থেমে গিয়েছিল; তাদের বিস্ময়েরও অবধি ছিল না। এমন তারা কখনও দেখে নি। কানু তলোয়ার ঘুরিয়ে হেঁকে বলেছিল—বাজা। মাদল বাজা! হো। বাজা।

বাজল মাদল। কানু ছুটবে এমন সময় তার পিছন থেকে টেনেছিল টুশকি। তার মুখরা স্ত্রী।—যাস না।

—যাব না?

—না। মরবি?

—তা বলে ফিরব? ছাড়।

—না মরবি।

সঙ্গে সঙ্গে কানু তার স্ত্রীকে কেটে বলেছিল—তু তবে আগে মর। বলে ছুটে নেমেছিল এ পাহাড় থেকে। ও পাহাড় থেকে সিধু—তার সঙ্গে ক্ষুদে সিপাহী।

এদিক থেকে আর কয়েকবার গুলির ঝাঁক এসেছিল ছুটে।

এরা পড়ছিল। কানু পড়ল কপালে গুলি বিঁধে। ওদিকে সিধু পড়ল।

কানুর গুলি বিঁধেছিল কপালে। সিধুর গুলি বিঁধেছিল হাতে, কাঁধের নীচে। তখন অন্ধকার নামছে। পিছনে পশ্চিমে বন। বনের ছায়ায় অন্ধকার মুহূর্তে মুহূর্তে গাঢ় হচ্ছিল।

সেই অন্ধকারের মধ্যে সাঁওতালরা ভয়ার্ত হয়ে বনে ঢুকছে। ওদিকে সমতলে বাজছে ইংরেজের মিলিটারী ব্যাণ্ড। তারা ভাবলে ওরা এগিয়ে আসছে। তারা বনে গিয়ে ঢুকল। কানু শুধু স্থির হয়ে গেছে এপাশে। দৃষ্টি তার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে বিস্ফারিত। এদিকের পাহাড়ে সিধু কাতরাচ্ছে—অনর্গল রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে। তাকে বুক দিয়ে

চেকে তার ক্ষুদে সিপাহী।

—শুভোবাবু!

—রুকনী!

—উঠ শুভোবাবু। হাত জখম হইছে। দাওয়াই দিলে সারবে। উঠ। আমার কাঁধে ভর কর। শুভোবাবু!

সে তাকে নিজের কাঁধের উপর অক্ষত হাতটা ধরে তুলে সন্তর্পণে নিয়ে এসেছিল বনের ভিতর। বনের ভিতর ছোট ছোট ঝুপড়ি বেঁধেছিল তারা থাকবার জন্যে। সে একটা ঝুপড়ির ভিতর তাকে শুইয়ে দিয়ে তার মুখে জল দিয়ে একটু হুহু করে বলেছিল—শুয়া থাক শুভোবাবু, আমি বন থেকে লতা ছিঁড়ে আনি। বেঁটে বেঁধে দিব। আঁধার হয়ে গেইছে, উরা এখুন পাহাড়ে বনের ভিতর ঢুকবেক নাই।

—এ কি হল রুকনী!

—কি হল গ?

—এমন করে মেরে ফেলালে!

—ফলাক। আবার জিতব আমরা। শুয়ে থাক তুমি। বলে সে বেরিয়ে গিয়েছিল বনের মধ্যে ওষুধের সন্ধানে। এখানকার সব তার চেনা। সব সে চিনে রেখেছে।

ওদিকে তখন সাঁওতালরা বনের ভিতরে ভিতরে আরও পিছনে হটবার মতলবে ছুটোছুটি করছে। পথে দুজন সর্দার যারা সিধুর অনুগত তাদের সঙ্গে দেখা হতেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—সিধু শুভোবাবুর হাতে গুলি লাগল। তাকে হুইদিকের ঝুপড়ির ভিতর শুয়ায়ে দিছি। তুরা দেখ গা। আমি ওষুদ নিয়ে এখুনি এলম। কানু শুভোবাবুর কি হল জানিস?

—তার কপালে গুলি লাগল, মাথার পিছাটা খুলে গেইছে। সি মরল।

—সিধু শুভোবাবু বেঁচে আছে—বাঁচবেক। তুরা বাঁচা। আমি এখনি এলম।

অসম সাহসিনী মেয়েটা চলেছিল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চিতাবাঘিনীর মত। লাফিয়ে লাফিয়ে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল। এ কি হল? পথ ভুল হল? ঝরনার শব্দ কই? ঝরনার পাশে আছে সেই লতা।

ঘুরল সে। ঘুরেছিল মনের ক্ষোভে একটু বেশী জোরে। পায়ের আঙুলে যেন কেউ ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করলে। হোঁচট খেয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারপর সব অন্ধকার।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। জ্ঞান যখন হল তখন বন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সব যেন ঘুমিয়ে এরা। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের ফালি ফালি আলো গাছের পল্লবের ফাঁক দিয়ে বনের ভিতরে এসে একটু একটু সব দেখা যাচ্ছে। সে তারই মধ্যে আবার খুঁজতে বেরিয়েছিল সেই ঝরনা। ঝরনা সে পেয়েছিল। ওষুধও পেয়েছিল। ওষুধ নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে ফিরেছিল আস্তানায়।

কিন্তু সিধুবাবুকে সে পায় নি। সে ঝুপড়ি শূন্য। আশেপাশের ঝুপড়ি শূন্য। কি হল? কোথা গেল তার শুভোবাবু?

সে চিৎকার করে ডেকেছিল—শুভোবাবু—সিধুবাবু হো!—

বনের মধ্যে প্রতিধ্বনি গমগম করে উঠেছিল। উত্তর মেলে নি।

—সিধুবাবু!

ডাকতে ডাকতে সে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছিল গভীর থেকে গভীরে। কিন্তু হাঁটবার খুব ক্ষমতা তার ছিল না! পায়ের কটা আঙুলের নখ উঠে গিয়েছিল। বসতে হয়েছিল তাকে। তখন ভোর হয়ে আসছে। একটা গাছের শিকড়ে বসে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিল সে।

নয়ন পাল বললে—ছ মাস পর তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঠাকুরের। ঠাকুরকে সে বলেছিল তখন।

ভোরের সময় সূর্য উঠছে, তখন তার নজরে পড়েছিল তার ঘাড়ে হাতে বুকে রক্তের চিহ্ন! বুঝতে পেরেছিল সে। এ সিধুর রক্তের কুটি।

এতক্ষণে সে কেঁদে উঠেছিল—শুভোবাবু! আমার কপালে সিঁদুর দাও। রক্তের তিলক দাও কপালে। আমাকে রানী কর শুভোবাবু।

—তারপর?

তারপর সব শেষ বাবু। কানু মরেছিল। সিধু মরে নি, সেদিন তার সর্দাররা গাছের ডাল কেটে একটা ডুলি তৈরী করে তাতেই তুলে তাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। সে তখন অজ্ঞান। রক্ত পড়ে পড়ে একেবারে কাটা ডালের পাতার মত আমলে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে তারা সোজা চলে এসেছিল বাগনাডিহি পার হয়ে পীপড়াতে। তখন দেশে সাঁওতালদের বুক ভেঙে গিয়েছে। কানুবাবু মরেছে। সিধু নিরুদ্দেশ। ছোট ছোট শুভোবাবুরাও মরেছে। কতক ধরা পড়েছে। সিউড়ি জেল, ভাগলপুর জেল ভরতি হয়ে গিয়েছে সাঁওতাল আসামীতে।

এরই মধ্যে ডুলিতে বয়ে নিয়ে এসেছিল সিধুকে পীপড়ায় হাড়মা মুর্মুর বাড়ি আশ্রয়ের জন্যে। সিধুর তখন হাত ফুলেছে। প্রবল জ্বর। তার মধ্যে চেঁচায়—রুকনী! ক্ষুদে সিপাহী হ!

দিন সাতেক পর জ্ঞান হয়ে একটু বল পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল—কোথা রুকনীকে ফেলে এলি তুরা? কোথা?

সর্দারের তখন ধরা পড়বার ভয়ে মেজাজ খারাপ। তারা বলত—জানি না। সে গেল ওষুদ আনতে, আর এল নাই। সি পালালছে। তুর কাছে ফিরে আসবার লেগে সি যায় নাই, কি করব আমরা। কত বসে থাকব? থাকলে ধরা পড়তাম।

চুপ করত সিধু। কাঁদত আপন মনে।

আরও দিন কয়েক পর সে একদিন রাত্রে উঠে সেই দুর্বল শরীর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বনের পথ ধরে।—ক্ষুদে সিপাহী! রুকনী!

ওই পথেই সে ধরা পড়ল। ধরিয়ে দিলে একটা মেয়ে। ইংরেজের গোয়েন্দা সাঁওতাল মেয়ে। খবর ওরা পেয়েছিল সিধু এদিকেই বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সিধু সেদিন হঠাৎ শুনতে পেয়েছিল অবিকল রুকনীর ডাক।

—শুভোবাবু সিধুবাবু! আমার সিধুবা—বু!

—রুকনী! ক্ষুদে সিপাহী!

—শুভোবাবু! শুভোবাবু!

—রুকনী! রুকনী! ইখানে আমি। ইখানে। বলতে বলতেই চারিদিক থেকে কোম্পানীর পুলিশ ফৌজী সিপাহী এসে তাকে ঘিরে ফেলেছিল। সিধু ধরা দিয়েছিল। শুধু বলেছিল—ই কি করলি? রুকনীর নাম নিয়া ডাকলি কেনে? ই কি করলি?

তারপর ফাঁসী হল সিধুর। সিধুকে ফাঁসি দিলে কোম্পানী বাগনাডিহিতে ওদের গ্রামে সকল লোকের সামনে। তখন সব লোককে মোটামুটি কোম্পানী ক্ষমা করেছে। ফুল তখন গ্রামে ফিরেছে। তাদের সামনেই ফাঁসী হল তার গাছের ডালে ঝুলিয়ে। সিধু এতটুকু ভয় করে নি। বলেছিল—হেরেছি। ফাঁসি দিছিস দে। নিলম ফাঁসি। ফুল, কাঁদিস নাই। রুকনীকে পেলে বুলিস—। না, কিছু না। কিছু বুলতে হবে না। দে ফাঁসি দে।

'জয় বোঙ্গা' বলে সে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছিল।

এরও সাত দিন পরে ফিরেছিল রুকনী। তখন কঙ্কালসার তার চেহারা। একটা পা খোঁড়া হয়ে গেছে। কয়েকটা মাস সে পড়ে ছিল এই পায়ের ক্ষত নিয়ে। পা ফুলেছিল, পেকেছিল। কোনরকমে এরই মধ্যে সে ওষুধ ছিঁড়ে দাঁতে চিবিয়ে ক্ষতে লাগিয়েছে। গাছের পাতা খেয়েছে। ফল খেয়েছে। কদিন অজ্ঞান হয়েও ছিল। একটু সুস্থ হয়ে সে কোনরকমে এসে লোকালয়ে পৌঁছে খবর পেয়েছিল সিধুবাবুর ফাঁসি হবে। সে প্রাণপণে খোঁড়া পায়ে এসে পৌঁছেছিল বাগনাডিহি।

গ্রামের লোকে তাকে দেখে খুশী হয় নি। কিন্তু ফুল হয়েছিল। টুকনীর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছিল কানু। টুশকি মরেছে। তবু টুকনীকে সহ্য করে নি লোকে। সে চলে গেছে আবার বেনাগড়ে। ক্রীশ্চান হয়েছে আবার।

ফুল আশ্রয় দিয়েছিল রুকনীকে। বলেছিল—তু থাক ইখানে। তু আমার মন্দ করিস নাই। থাক। মরবার সময় সে বুলেছিল—রুকনীকে বলিস—। বুলে আর বুললে না। বুললে না।

রুকনী হতভম্ব হয়ে বসে থাকত ওই মজলিসের পাথরটায়। যেখানে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল সিধুর, তীর দিয়ে ঘলঘসের ফুল পেড়ে দিয়েছিল; যেখানে সিধুরা রাজা হয়ে প্রথম কাছারী করেছিল; যেখানের বড় মহুলগাছের ডালে সিধুকে ফাঁসি দিয়েছিল—সেইখানে। দিনে আসত গ্রামে, ফুলের কাছে বসে থাকত। দুটো খেত। সন্ধ্যা হলেই চলে যেত ওখানে। সারারাত বসে থাকত। পাগলের মত বকত। বলত—কথা বুল। শুভোবাবু! রাজাবাবু! কথা বুল! আমাকে সিঁদুর দাও। শুভোবাবু!—

কথাটা শুনে বুড়ো ভট্‌চাজ মশায় বলতেন—সিধু তা হলে আসে, দেখা দেয়!

আমি চমকে উঠেছিলাম। সেদিন তাহলে সেখানে দেখেছিলাম কি সিধুকে? সিধু দাঁড়িয়েছিল? কিন্তু রুকনী?

বললাম—রুকনীর কি হল ? কত দিন বেঁচে ছিল ?

পাল বললে—বেশী দিন নয় বাবু। আরও ক'মাস। মাস তিনেক। গরমের সময়, বোশেখ মাস তখন। ফুলের কাছে খেয়ে থেকে একটু সেরেছে—আবার তার চেকনাই ফিরছে। সেই সময় ফুলের কাছে এক সের ঘি চেয়ে নিয়েছিল। রুকনী বলেছিল—ভৈরবী মায়ের মতুন যজ্ঞি করব।

—যজ্ঞি করবি ?

—হঁ।

—কি হবে তাতে ?

—ভৈরবী মা বুলত—ই যজ্ঞি করলে যা মনে করবি তাই হবে। সেই সায়েবটোর মুণ্ডু সি পেয়েছিল।

—তু কি মনে করবি ?

—মনে ? মনে—। মনে করব—সি আবার বাঁচুক।

—বাঁচবেক ? মরা মানুষ বাঁচবেক !

—হেঁ।

ফুল দিয়েছিল তাকে ঘি। শুধু ঘি নয়, অন্য উপকরণও দিয়েছিল। কিন্তু বাবু, অল্পবুদ্ধি সরল জাতের মেয়ে আর মাথাও ঠিক ভাল ছিল না। যজ্ঞি করতে গিয়ে এমন করে ঘি ঢাললে যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠে লাগল চারি পাশের শুকনো ঘাসে। তার উপর বোশেখ মাস। নিজেও ছিল উপোস করে। দেখতে দেখতে বড় বড় শুকনো ঘাসে আগুন লাগল বেড়া আগুনের মত। মেয়েটা নাচতে লেগেছিল আগুনের এমন শিখা দেখে।

ফুল ছিল সেদিন দূরে বসে। সে দেখতে গিয়েছিল। সে ভয়ে নেমে এসেছিল ছুটে। চিৎকার করে ডেকেছিল—পালায়ে আয় রুকনী, পালায়ে আয়। রুকনী তখন নাচছে। বলছে—শুভোবাবু কথা বুল। কথা বুল। দেখ যজ্ঞি হল। কথা বুল।

ফুল চেঁচাচ্ছিল—রুকনী—রুকনী—

আগুন ঘাসে ঘাসে ছড়িয়ে পড়ছিল হু হু শব্দে। সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিল বাতাস। সেই আগুন লেগেছিল রুকনীর কাপড়ে। ওদিকে চটপট শব্দে আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল সারা বনে।

তাতেই সে পুড়ে মরেছিল। আর আগুনটা জ্বলেছিল মাসখানেক ধরে। বোশেখ জষ্টি মাসে বনে আগুন লাগা দেখেছেন ?

দেখেছি। সেই যজ্ঞের আগুনে রুকনী পুড়ে মরে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সিধু আজও মুক্তি পায় নি, ইতিহাস ওকে মুক্তি দেয় নি। আজও সে বুকে হাত দিয়ে ছায়ায় মিশে সেই ফাঁসি-যাওয়া গাছের মহুয়াগাছটায় ঠেস দিয়ে ভাবে।